নব পর্যায় ৫ম খণ্ড ১ম সংখ্যা বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৭

ইতিহাস

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

অমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

অমলেন্দু দে

শোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা তিন টাকা
বার্ষিক আট টাকা
রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে দশ টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কালিমবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ৫ সংখ্যা ১ বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৭

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মৃতিকথা রমেশ চন্দ্র মজুমদার	১
ঐতিহাসিক আমীর খসরু গৌতম ভদ্র	২১
প্রাগৈতিহাসিক প্যালেস্টাইন পরিক্রমণ বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০
সামাজিক তথ্যের টুকিটাকি (২) যতীন্দ্রমোহন দত্ত	৫৬
ইতিহাস কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশন (১৯৭০) সাধারণ সভাপতির ভাষণ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ	৫৮
পুস্তক পরিচয় — ইন্দ্রাণী রায়	৭৪
পত্রপত্রিকায় ইতিহাস অমিত্ত মুখোপাধ্যায়	৭৯

নিবেদন

নব পর্যায় 'ইতিহাস' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ শেষ হইল। গ্রাহকগণকে নূতন বৎসরের চাঁদা পত্রিকার কার্যালয়—কাশিমবাজার হাউস, ৩০২ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা ভি, পি যোগে পাঠান সম্ভব হইবে না।

১৩৭৬ সাল হইতে 'ইতিহাস' পত্রিকা প্রতি বৎসরে তিনবার প্রকাশিত হইতেছে।

নব পর্যায় ৫ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

ইতিহাস

সম্পাদক
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ
অমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক
অরুণকুমার দাশগুপ্ত
অমলেন্দু দে
শোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি
৩৩/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা তিন টাকা
বার্ষিক আট টাকা
রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে দশ টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিমবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ৫ সংখ্যা ২ ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মৃতিকথা	৯১
রমেশ চন্দ্র মজুমদার	
ঐতিহাসিক আমীর খসরু	১০২
গৌতম ভদ্র	
সিরাজদৌল্লার মহিষী	১১৯
সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী	
বিপিন চন্দ্র পাল ও মহম্মদ আলি	১৩১
অমলেন্দু দে	
ঐতিহাসিক জীবন	১৫৯
সুবোধ কুমার মজুমদার	

নব পর্যায় ৫ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা পৌষ-চৈত্র ১৩৭৭

ইতিহাস

সম্পাদক
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক
অরুণকুমার দাশগুপ্ত
অমলেন্দু দে
শোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি
৩৩/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা তিন টাকা
বার্ষিক আট টাকা
রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে দশ টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিমবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মৃতিকথা	১৮৭
রমেশ চন্দ্র মজুমদার	
স্যার যদুনাথের পূর্বপুরুষগণ ও আদিনিবাস	২০৫
বিভা সরকার	
আচার্য যদুনাথের প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ	২১৬
সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়	
ইতিহাস চর্চার প্রণালী	২২৯
যদুনাথ সরকার	
আচার্য যদুনাথ সরকার	২৪১
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়	
বিস্মৃত স্বদেশপ্রেমিক ও সাংবাদিক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২৫২
নিমাই সাধন বসু	
বাংলাদেশে জনশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস	২৫৯
গোপাল মুখোপাধ্যায়	

ইতিহাস

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি ।

১ ।	সংবাদ পত্রের নাম	ইতিহাস
২ ।	যে ভাষায় প্রকাশিত হইবে	বাংলা
৩ ।	প্রকাশের সময় ব্যবধান	ত্রৈমাসিক, বৈশাখ হইতে আরম্ভ ।
৪ ।	খুচরা বিক্রয় মূল্য	প্রতি সংখ্যা ৩·০০
৫ ।	প্রকাশক	শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী (ভারতীয়) । ঠিকানা : ৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা—৯
৬ ।	প্রকাশকের স্থান	৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা—৯
৭ ।	মুদ্রক	শ্রীনলিন রায় (ভারতীয়)
৮ ।	যে প্রেসে ছাপা হইবে তাহার নাম ঠিকানা	অটো-প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস ৪৯ বলদেও পাড়া রোড । কলিকাতা-৬
৯ ।	সম্পাদক	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার (ভারতীয়) ৪ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬ । শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ (ভারতীয়) ৮৫ এ, একডালিয়া রোড কলিকাতা-১৯ । অমলেশ ত্রিপাঠী (ভারতীয়) গভর্নমেণ্ট হাউসিং এস্টেট । গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
১০ ।	সত্বাধিকারী	ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি ঠিকানা : ৩৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য ।

স্বাঃ শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

প্রকাশক, ইতিহাস ত্রৈমাসিক পত্রিকা ।

UNIVERSITY

ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড | বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৭ | ১ম সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

(৩৩)

কনভোকেশন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন সভা সমিতিতে সরোজিনী নাইডু তিন চারটি ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রত্যেক ভাষণে তাঁর বাগ্মিতা, গভীর জ্ঞান এবং দেশবাসীর প্রতি গভীর সহানুভূতির পরিচয় পেয়ে শ্রোতারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন এবং ঢাকার জনসাধারণের নিকট সরোজিনী নাইডুর খ্যাতি খুব বিস্তৃত হয়েছিল।

বাংলাদেশের তখনকার গভর্নর সার জন উডহেড (Sir John Woodhead) যিনি আচার্য হিসাবে সমাবর্তন উৎসবে সভাপতি ছিলেন, তিনিও শ্রীমতী নাইডুর বক্তৃতা শুনে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করার বাসনা আমার কাছে জানালেন। আমি শ্রীমতী নাইডুকে সেকথা বলায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করলেন। কারণ তখন জাতীয় কংগ্রেস এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তার নেতাদের মধ্যে কেউই লাট বেলাট বা অন্যান্য বড় ইংরাজ রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা করবেন না। আমি তো মুশকিলে পড়লাম ; যে কারণে শ্রীমতী নাইডুর অনিচ্ছা সেটা গভর্নরকে জানান সঙ্গত মনে করলাম না। আমি শ্রীমতী নাইডুকে বললাম যে গভর্নর আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনাকে সঙ্গে

নিয়ে তাঁর কাছে যেতে। এখন যদি আপনি না যান, আমাকে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত ও অপদস্থ হতে হবে। এতেও তিনি রাজী হলেন না; তবে একটু নরম হলেন। তখন তাঁকে বললাম যে আপনি ভুলে যান যে আপনি একজন লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করা আপনার কর্তব্য। দেখা না করলে বরং অশোভন দেখাবে। কংগ্রেস লাট বেলাটের সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছেন। আপনি তো লাটসাহেব হিসেবে তাঁর কাছে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের কাছে। আপনি এ দিকটা একটু ভালকরে বিবেচনা করে দেখুন। এই যুক্তিতে কাজ হল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা, আমি যেতে পারি যদি চ্যান্সেলার আমার কয়েকটি শর্ত মেনে নেন। প্রথম, আমার যাবার কথা বাইরের কাগজে বা সরকারী সার্কুলারে প্রকাশিত হবে না এবং গভর্নরের দৈনিক ভিজিটারস লিস্টে আমার নাম থাকবে না। দ্বিতীয়, আমি যখন চান্সেলারের কাছে যাব তখন তাঁর সেক্রেটারী বা অন্য কোন কর্মচারী উপস্থিত থাকতে পারবেন না; চ্যান্সেলার একাই থাকবেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে চলে আসব।" আমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাঁকে জানালাম। তিনি এ দুটি শর্তই মেনে নিলেন এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন জানালেন।

সকাল ন'টা দশটার মধ্যে আমি শ্রীমতী নাইডুকে নিয়ে যখন চ্যান্সেলারের বাসভবনে উপস্থিত হলাম তখন কর্মচারী তো দূরের কথা চাকর বাকর বা দারোয়ান পর্যন্ত কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না। আমরা গাড়ী থেকে নামতেই চ্যান্সেলার নিজে এসে শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে করমর্দন করে তাঁকে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি চারদিকে লক্ষ্য করে দেখলাম কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। একটি ঘটনায় এই অবস্থাটি একটু হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হল। প্রায় আধঘণ্টা কথাবার্তার পর শ্রীমতী নাইডু জল খেতে চাইলেন। চ্যান্সেলার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনারই শর্তমত চাকর দারোয়ান কাউকেই এখানে রাখিনি। আমি নিজেই জল আনতে যাচ্ছি।" এই বলে

তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং দু'এক মিনিট পরে এক গ্লাস জল হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। আমি বেশ বুঝতে পারলাম শ্রীমতী নাইডু নিজেই একটু লজ্জিত হয়েছেন। বাড়ী ফিরে এসে তিনি চ্যান্সেলারকে এই কারণে খুবই প্রশংসা করলেন, বললেন, "রাজনৈতিক কারণে ইংরেজদের আমরা যতই গালমন্দ করি না কেন, এইভাবে তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যে সদাশয়তা ও মহত্বের পরিচয় দিলেন, তা খুবই প্রশংসনীয়।" চ্যান্সেলারের সঙ্গে শ্রীমতী নাইডুর ঠিক কি কথা-বার্তা হয়েছিল তা আজ আমার বিশেষ মনে নেই। তবে তার বেশীর ভাগই ছিল সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে। ভারতীয় নারী সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে অনেক আলোচনা হয়। গভর্নর শ্রীমতী নাইডুর ইংরাজী কবিতার খুব প্রশংসা করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে দু'একটি কবিতা নিয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনাও হয়েছিল।

(৩৪)

স্যার আকবর হায়দারী, শ্রীমতী নাইডু, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই চারজনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ আমার ঢাকার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা বলেই মনে করি। এ ছাড়া আর দু'জন অতিথির কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। এঁদের একজন হলেন জার্মান পণ্ডিত Luders—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে ইনি একজন অসাধারণ খ্যাতিমান পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অতি সুপণ্ডিত এবং এঁর প্রধান কীর্তি হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে তিনশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যত প্রাচীন শিলালেখ (inscription) এদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রণয়ন। প্রত্যেকটি লেখর সারমর্মও তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রায় ১৪০০ প্রাচীন লেখর বিবরণ তিনি দিয়েছেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস যাঁরাই আলোচনা করবেন তাঁদের পক্ষে এই Luders' List একান্ত অপরিহার্য। এটি না থাকলে ছাত্র ও গবেষকদের যে কি অসুবিধায় পড়তে হত তা এককথায় বলা যায় না। ইনি ঢাকায় এলে আমি তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

নিমন্ত্রণের সময়ের অনেক পূর্বেই তিনি আমার বাড়িতে এসে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা ও আলাপ শুরু করেন। আমার বড় মেয়ে তার অটোগ্রাফের খাতায় তাঁকে কিছু লিখে নাম সই করে দিতে অনুরোধ করে। তিনি তৎক্ষণাৎ চার লাইনের একটি সংস্কৃত শ্লোক দেবনাগরী অক্ষরে লিখে দিলেন এবং নীচে ঐ অক্ষরেই নিজের নাম সই করে দিলেন। আমার বাড়ীর লনে এই চায়ের আসরের ব্যবস্থা হয়েছিল। কেক প্যাস্ট্রি ইত্যাদি বিদেশী খাবারের চেয়ে নানা ধরনের দেশী খাবারেরই বেশী আয়োজন করা হয়েছিল। বিদেশী খাবার না নিয়ে তিনি দেশী খাবারই বেশী নিলেন এবং খেয়ে বললেন যে, তা তার খুবই ভাল লেগেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এবং শহরের অনেক গণমান্য ব্যক্তি এই আসরে হাজির ছিলেন। তিনি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে আলাপ করলেন। ঢাকায় তিনি আরও দু' একদিন ছিলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে সে সময় দেখা করেছিলাম। তাঁর অসামান্য বিনয় ও সৌজন্যের কথা আজও আমার মনে পড়ে।

এঁর জীবনের পরিণাম বড় শোচনীয়। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের পরে তাঁর অকস্মাৎ তিরোধান হয়। এদেশে অনুসন্ধান করে আমরা যতদূর জেনেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই যে, হিটলারের অনুচরেরাই তাঁকে হত্যা করেছিল। এই সময়ে তিনি প্রাচীন ভারতের আর একখানি লেখ সংগ্রহ প্রকাশের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অনেকগুলি লেখ সংগ্রহ করে তিনি তার বিবরণ লিখেছিলেন। এ সম্বন্ধে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর অনেক পত্র বিনিময় হয়। আমার যতদূর স্মরণ আছে তাতে মনে হয় যে, ভারত সরকারই এই বই প্রকাশ করবেন এরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাঁর প্রথম লেখ সংগ্রহটিও ভারত সরকারই প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাঁর যখন আর কোন সন্ধানই মিলল না, তখন ভারত সরকার বিলাতের কর্তৃপক্ষের সাহায্যে ঐ দ্বিতীয় পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। Luders এর চিঠি থেকেই জানা গিয়েছিল যে তিনি এই তালিকাটি প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন। লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ এই পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধারের অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এভাবে

পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট হওয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

এইবার দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা আমি বলব। এঁর নাম হল সৈয়দ মামুদ। ঢাকার পুরনো নবাব বংশে এঁর জন্ম। অনেকেই বোধহয় জানেন না যে এখন ঢাকার নবাব বলে যাঁরা পরিচিত উনিশ শতকের আগে তাঁদের কোন প্রসিদ্ধি ছিল না। মুসলমান যুগে বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁর বংশধরেরা আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত ঢাকায় বেশ মান সম্ভ্রমের সঙ্গে বসবাস করতেন। সেই সময় একজন কাশ্মীরী শালওয়ালা প্রতি বছর তাঁদের কাছে শাল বিক্রয় করতে আসত। সেই শালওয়ালা পরে খুব ধনী হয়ে জমিদারী কেনেন এবং নবাব উপাধি পান। ঢাকার নবাব গণি মিঞা এঁরই বংশধর এবং তিনি একজন খুবই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। বর্তমানে ঢাকার নবাব বলে যাঁরা পরিচিত তাঁরা এঁরই বংশধর।

পুরনো শায়েস্তা খাঁর বংশধরেরা তখনও ঢাকায় ছিলেন। তাঁদের তখন খুবই দৈন্যদশা ; সৈয়দ মামুদ এই বংশেরই সন্তান। তিনি আমেরিকার কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। সেই উপলক্ষে ঢাকায় এসে তিনি আমার বাড়িতে অতিথি ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে তাঁদের বংশের পুরনো ইতিহাস শোনালেন। সেই বংশের যিনি বর্তমান কর্তা, তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি পুরনো নবাব বাড়িতে গেলেন। পরের দিন সেই বৃদ্ধ আমার বাড়িতে এসে সৈয়দ মামুদের সঙ্গে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে রাত্রে তাঁর বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা সকলে এক সঙ্গে গেলাম। বাড়িটি বেশ বড় হলেও তখন ভগ্নদশায় ; নবাব বংশের বর্তমান দুর্দশার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তাঁদের সৌজন্য ও আদবকায়দায় আমি ও আমার স্ত্রী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। নবাব বাড়ির মানুষদের কথাবার্তা এবং আচরণ আমাদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এঁদের প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরব ও মর্য্যাদা যে তখনও কতদূর টিকে ছিল তা বেশ বোঝা গেল। নবাব বাড়ির মেয়েরা পর্দানশীন ; তাঁরা বাইরে বেরলেন না। আমার স্ত্রীকে অবশ্য তাঁরা অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে অন্তঃপুর-

বাসিনীদেরও এমনই সৌজন্য ও আভিজাত্যের কথা শুনেছিলাম। ঢাকার এই প্রাচীন নবাব বংশের ইতিহাস ও সৌজন্যের কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

সৈয়দ মামুদ ছিলেন অতি সুপুরুষ ও প্রতিভাশালী। তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং সকলের মুখেই তার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর বক্তৃতার বিষয়ে একটি কথা বিশেষভাবে আজও আমার মনে আছে। প্রত্যেকটি বক্তৃতা তিনি ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ করতেন—একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে। অথচ লেখা বক্তৃতা তিনি পাঠ করতেন না। এটা আমেরিকায় বসবাস করার ফল বলে মনে হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। পরবর্তী কালে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। বিশেষতঃ পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব সৌহার্দ্য ছিল এবং এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু নানা কারণে তা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত হবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর তিনি মিশরে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ে। তবে তাঁর সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি।

(৩২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রায় একুশ বছর ছিলাম : এর মধ্যে ভারতের প্রায় সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ায় এভাবে ঘুরে দেখার বিশেষ সুযোগ হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম হল—ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন, ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেস, ইণ্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড। ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস ও ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেস—এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের আমি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। এদের প্রায় সব অধিবেশনে আমি যোগ দিতাম এবং যখনই কোন জায়গায় যেতাম তখন অধিবেশন শেষ হলে তার কাছাকাছি জায়গাগুলি ঘুরে দেখতাম। তখনকার দিনে দক্ষিণ ভারতের রেল কোম্পানী এক রকম টিকিট বিক্রয় করতেন তাতে একটি নির্দিষ্ট ভাড়া

দিলেই ঐ লাইনের যে কোন জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার ইচ্ছা ঘুরে বেড়ান যেত। এমনি এক টিকিট কিনে সস্ত্রীক নানা জায়গায় ঘুরেছি। তার মধ্যে কয়েকটি জায়গার কথা বিশেষভাবে মনে আছে, যেমন, হায়দ্রাবাদ, বিজয়নগর, ত্রিবাঙ্কুর, কন্যাকুমারী, ত্রিচিনাপল্লী, মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, মাদুরা, মহাবলীপুরম, পক্ষীতীর্থ, মহীশূর, শ্রীরঙ্গপত্তন। এছাড়া উত্তর ভারতের জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানেও গিয়েছি। এদের মধ্যে অনেক জায়গাতেই স্টেট গেস্ট হিসেবে থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার! সুসজ্জিত ঘর, আহারের প্রাচুর্য এবং ঘুরে বেড়ানর জন্য একটি মোটর গাড়ী সর্বদাই আমার তাঁবে থাকত। বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর এবং হায়দ্রাবাদে যে রকম রাজসিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামে ছিলাম তা আমার পূর্বজন্মের বহু সুকৃতির ফল বলেই ধরে নিতে হবে।

আর একটি ভ্রমণ বিশেষভাবে স্মরণীয় বলেই তার কথা এখানে একটু বিস্তৃতভাবে লিখছি। একবার পেশোয়ারে ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের অধিবেশন হয়। সেই উপলক্ষ্যে অধিবেশনের কর্তৃপক্ষরা আমাদের খাইবার গিরিপথ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই ইতিহাসে খাইবার গিরিপথের কথা পড়ে আসছি। এই পথেই বিদেশীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। যখন মোটরে সেখানে যাই তখন বারে বারে মনে পড়ছিল যে এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথটি ভারতের অতীত ইতিহাস গঠনে কিভাবে সাহায্য করেছে।

খাইবার গিরিপথে আমাদের গাড়ী যেখানে গিয়ে থামল সেখানে একটি লৌহকপাট ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমান্ত নির্দেশ করছে। কপাটের ওদিকে আফগান সৈন্য এবং পুলিশ; কপাটের এদিকে ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশ। গ্রিল দেওয়া গেটের মধ্য দিয়ে লোকজন বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, দু'পক্ষে কথাবার্তাও হয়। কিন্তু গেট পার হলে আর রক্ষে নেই। ভারতের কোন লোক যদি গেট পার হতেন, তখনই তাকে ধরে একেবারে সোজা কাবুলে চালান করে দেওয়া হত—এই রকমই নিয়ম ছিল। একবার একটি আট দশ বছরের ছোট ছেলে ভারতীয় সৈন্যদের কাছে চা বিক্রি করছিল।

গেটের ওধারের এক কাবুলী সৈন্য তার কাছে চা চায়। ঐ সৈন্যটি চা নেবার জন্য দরজা খুলে দাঁড়ায়। ছোট ছেলেটি হাত বাড়িয়ে চা দেবার সময় ভুলে দরজা পার হয়ে ওপারে চলে যায়। যাওয়ামাত্রই কাবুলী সৈন্যরা তাকে ধরে কাবুলে পাঠানর আয়োজন করে। ভারতীয় সৈন্যদের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলে যে গেট পার হয়ে এলেই কাবুলে পাঠান নিয়ম; এর অন্যথা হবে না। তবে আমরা কাবুলে লিখে দিচ্ছি ছেলেটির যাতে কোন শাস্তি না হয়। ছেলেটি অবশ্য পরে কাবুল থেকে নিজের দেশে ফিরে আসে।

খাইবার গিরিপথ থেকে আমাদের সোয়াট নদীর উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তখন এক পাঠান নবাব ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি Dir এর নবাব বলে পরিচিত। তিনি একদিন সমস্ত প্রতিনিধিদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের মধ্যে আট দশজন পাঠান নবাবের বাড়িতে মাংস খেতে রাজী হলেন না, বললেন তাদের জন্য নিরামিষ ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে চাঁদোয়া খাটিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একটি চাঁদোয়ার নীচে আমিষ এবং আর একটির নীচে নিরামিষ ভোজ্যবস্তু সব টেবিলে সাজান ছিল। আমিষ ভোজ্য দ্রব্যের সম্ভার দেখে নিরামিষ ভোজীদের টেবিল একরকম ফাঁকা পড়ে রইল। সবাই আমাদের টেবিলে এসে যোগ দিল।

খাওয়ার প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ছে। খাইবার গিরিপথের একজন কর্মচারী আমাদের সকালবেলায় চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সীমান্তের সেই চায়ের আসরে নানা ধরনের সুস্বাদু ফল—আঙ্গুর, খরমুজা ইত্যাদি—প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করা হয়েছিল। তার স্বাদই অতি বিচিত্র। সে রকম সুস্বাদু ফল এর আগে কখনও খাইনি, ভবিষ্যতে খাব বলে আশা হয় না।

পেশোয়ারে একজন হিন্দু পাঞ্জাবী মিলিটারী ডাক্তারের বাড়িতে আমার ও আমার স্ত্রীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। খাওয়ার বিষয়ে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অতিথিদের জন্য আয়োজনে তিনি কোন কার্পণ্য করেননি। তাঁদের রেওয়াজই হচ্ছে খাওয়ার পর প্রচুর আঙ্গুর খাওয়া। রাত্রে খেতে বসে দেখি

বড় বড় আঙ্গুর একটি পাত্রে সাজান আছে। এখানকার আঙ্গুর যাঁরা খেয়েছেন একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন সে আঙ্গুরের স্বাদ কি রকম। কথা-প্রসঙ্গে গৃহস্বামী বললেন, "এখন কি আর ভাল খাওয়ার উপায় আছে। আঙ্গুরের সের আট আনা।" শুনে বললাম, "আট আনা?" "হ্যাঁ, আগে তো মাত্র দু'আনা সের ছিল।" তখনই মনে পড়ল কলকাতায় পাতলা কাঠের বাক্সে যে আঙ্গুর আসত কিনি তার দামই বা কি এবং স্বাদই বা কি। ঐ অঞ্চলের ফলের স্বাদ সত্যই কি অপূর্ব।

এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে আমরা তকৎ-ই-বাহি পাহাড় দেখতে গিয়েছিলাম। এই পাহাড়ের চূড়ার কাছেই আছে প্রসিদ্ধ গণ্ডোফারিসের শিলা-লিপি। এর কথা বইএ পড়েছি, এবার স্বচক্ষে দেখলাম।

এই যাত্রায় পাঠানদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হল। সেখানে ছেলেবুড়ো সকলের কাঁধেই দেখি একটি বন্দুক ঝোলান। শুনলাম ওখানকার রীতি নাকি এই যে ওরা রেগে গেলে একে অন্যকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছোঁড়ে, আমরা যেমন বন্দুক নিয়ে পাখী শিকার করি। জাফর নামে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন কর্মচারী আমাদের গাইড ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম একথা সত্য কিনা। তিনি বললেন, "সত্য, তবে পাঠানদের উপর অত্যাচার বা তাদের অপমান করা না হলে তারা কখনও অপরের প্রাণ হানি করে না। আপনারা শুনেছেন যে পাঠানরা গুলি করে ইংরাজদের হত্যা করেছে। কিন্তু তার আসল কারণ ইংরাজরা কখনও বলেন না, একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পাঠান মেয়েদের উপর অত্যাচার করায় একবার পাঠানরা ইংরেজদের উপর বন্দুক নিয়ে চড়াও হয়। ইংরাজরা তার প্রতিশোধ নিল পাঠানদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে, তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে। আপনারা পাঠানদেরই গুলি চালানর কথা কেবল শুনেছেন: গুলি চালানর আসল কারণ বা ইংরাজদের অকথ্য অত্যাচার—এর কিছুই শোনেননি।" জাফর বা আরও দু'একজন পাঠানের অমায়িক ব্যবহারে আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ হই। আসার পূর্বে তিনি আমার স্ত্রীকে বলেন, "আপনার বড় মেয়ের বিয়ের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ করবেন। আমি নিশ্চয়ই যাব।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকার সময় মালদহের জেলা শাসক শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন আমাকে সেখানকার নব প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামটির দ্বারোদ্ঘাটন করতে আমন্ত্রণ করেন। সেই উপলক্ষ্যে আমি মালদহে যাই এবং গৌড়-পাণ্ডুয়া ভালভাবে ঘুরে দেখি। একবার মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ এক উৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে কারণেই আমি মেদিনীপুর যাই। যে বাড়িতে এই সভা হয়, সেই বাড়িতে একটি ছোট মিউজিয়ামও ছিল। মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখবার সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একটি কাচের আলমারিতে দুটি তাম্রশাসন রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম এ দুটি কার তাম্রশাসন। পরিচালকবর্গ কিছু বলতে পারলেন না। আমি ঐ দুটি দেখতে চাইলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু' এক লাইন পড়েই মনে হল এটি সম্পূর্ণ নতুন : এর কোন বিবরণ আগে পড়িনি। ভাল করে পড়ে দেখবার জন্য সেদিনকার মতো সেগুলি সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। পরিষ্কার করে পড়বার চেষ্টা করে দেখি যে এ দুটি মহারাজ শশাঙ্কদেবের তাম্রশাসন এবং ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে খুবই মূল্যবান। বিকেলে কর্তৃপক্ষকে বললাম এই রকম দুইটি মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনের বিষয়ে কোথাও কিছু প্রকাশ করেননি কেন। এই তাম্রশাসন দুটি কোথা থেকে এল—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানালেন যে যখন শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন মেদিনীপুরের জেলাশাসক ছিলেন তখন একবার মফঃস্বল ট্যুর করতে গিয়ে এক গ্রামে তিনি এগুলি পান এবং পরে তাঁদের উপহার দেন। এর বেশী কিছু তাঁরা জানেন না। তাঁদের বলে ঐ তাম্রশাসন দুটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করে দেখি যে এ দুটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই বেশি। Epigraphic Indiaয় ছাপানোর জন্য এই তাম্রশাসন দুটির বিবরণ আমি লিখি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে ; Epigraphic Indiaর প্রকাশ বন্ধ থাকায় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে সেই বিবরণ ছাপা হয়। এখন বাংলাদেশের সব ইতিহাসে এদের উল্লেখ দেখা যায়। একটি জেলার মিউজিয়ামে বহুদিন এ দুটি পড়ে ছিল। কেউই তার কথা প্রকাশ বা প্রচার করেননি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে মিউজিয়ামের

ভিজিটার্স বুকে দেখি যে আমার পূর্বে আরও দু'তিনজন ইতিহাসের অধ্যাপক ঐ মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলেন ; সে সময়েও তাম্রশাসন দুটি সেখানে ছিল। অথচ তাঁরা এ বিষয়ে কোন কৌতূহল প্রকাশ করেননি, কোন অনুসন্ধানই করেননি।

(৩৬)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহযোগী অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী-কালে দেশে বিদেশে খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান হলেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু এবং আরও দু'জন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো—কে, এস, কৃষ্ণান (ফিজিক্স) ও পি, মহেশ্বরী (বটানী)। এঁরা সকলেই আপন আপন বিষয়ে সর্বজনস্বীকৃত পণ্ডিত মানুষ। অবশ্য প্রথম আমলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় ছিলেন ; তবে তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিসেবেই ঢাকায় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া আরও কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষের উদ্ভাবিত ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে একটি নতুন আবিষ্কার তাঁর নামানুসারে Ghose Law নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এই Lawটি এখন আর সর্ববাদীগ্রাহ্য তথ্য বলে স্বীকৃত হয় না, এ রকম কথা শুনেছি। তবে একসময় পৃথিবীর সর্বত্র এর খুবই সমাদর হয়েছিল। সুশীলকুমার দে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পাশ করে-ছিলেন ; তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। এই দুই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করে তিনি যশস্বী হয়েছেন। পুণাতে মহাভারতের যে critial edition ছাপা হয় তার কয়েকটি পর্ব তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। মৌলভী মহম্মদ শহীদুল্লাহ অল্পদিন পূর্বে ঢাকায় পরলোকগমন করেছেন। ইনিও একজন বড় পণ্ডিত। বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরেই এঁর স্থান। আমরা একসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলাম। ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ ; ডি, এল একজন বড় আইনজ্ঞ ছিলেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। পরে সেই পদ ত্যাগ করে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ

করেছিলেন। আর একজন খ্যাতনামা আইনের অধ্যাপক ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ইনি আইন বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্য জগতে সুপরিচিত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার দু'জনেই আমার সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন কালিকারঞ্জন কানুনগো। ইনিও পরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এছাড়া গণিতশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ভূপতিমোহন সেন (বি, এম, সেন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে পুনরায় সরকারী কলেজে যোগ দেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। অর্থনীতির অধ্যাপক এইচ, এল, দে ভারত সরকারের তরফ থেকে আমেরিকায় ইউ, এন, ও-র অধীনে দীর্ঘকাল দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে চাকরী করেছেন। দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য এবং গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নলিনীমোহন বসুও খুব লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জুনিয়ার অ্যাসিস্টান্ট লেকচারারদের মধ্যেও অনেকে পরবর্তী জীবনে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন অমিয় কুমার দাশগুপ্ত। ইনি এদেশে এবং ইয়োরোপে অনেক উচ্চপদ অধিকার করে সম্প্রতি পাটনায় একটি সোস্যাল ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। এই রকম কৃতি ও খ্যাতিমান আরও অনেক প্রোফেসর ও লেকচারার ছিলেন। মোটকথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী অন্য যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে তুলনায় যে বেশ উচ্চস্থানই পাবেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ইতিহাস বিভাগে আমার ছাত্রদের মধ্যে পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী, শশীভূষণ চৌধুরী ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী ঢাকায় অধ্যাপনা করেন ও পরবর্তী জীবনে ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রমনার কাছাকাছি এক পাড়ায় আমাদের মধ্যে অধিকাংশ অধ্যাপকই বাস করতেন। ফলে পরস্পরের মধ্যে একটি নিবিড় সৌহার্দের ভাব জন্মেছিল। আমরা যেন সবাই এক পরিবারের মানুষ ছিলাম। প্রত্যেকের সুখে দুঃখে আপদে বিপদে অনেকের সাহায্য, সাহচর্য ও সহানুভূতি পাওয়া যেত। পরস্পরের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া ছিল খুবই আনন্দের ব্যাপার।

সেই সামাজিক জীবনযাত্রার স্মৃতি আজও আমার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত রয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত বড় বড় সব অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও ঢাকা শহরের হিন্দু অধিবাসীরা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়কে আদৌ ভাল চোখে দেখতেন না। প্রথম থেকেই তাঁদের মনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি খুব বিদ্বেষভাব ছিল। তার একটি কারণ যে হিন্দুরা কোনদিনই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পছন্দ করেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকাই তাঁদের ইচ্ছা ছিল। সুতরাং গভর্নমেণ্ট যখন প্রস্তাব করলেন যে মুসলমানদের সুবিধার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে তখন মুসলমানেরা যে পরিমাণে খুশী হলেন হিন্দুরা সেই পরিমাণে অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস হল যে এও আরেকভাবে বাংলা দেশকে দু'খণ্ড করা হল।

হিন্দুদের এই বিশ্ববিদ্যালয় ভাল না লাগার আরও একটি কারণ বোধ হয় ছিল। বাইরে থেকে আমরা এতগুলি অধ্যাপক ঢাকায় গিয়ে বড় বড় বাড়িতে থাকি আর মোটা মাইনে পাই এটা তাঁদের বিসদৃশ লাগত। ঢাকার স্থানীয় লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পায় নি—ঢাকার উকিলদের মধ্যে এই ভাবটি প্রবল ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কানুন তৈরী, বাজেট পাশ এবং সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সকল বিষয়ের আলোচনা এবং বিতর্ক হত। এই কোর্টে স্থানীয় হিন্দুদের একটি বড় দল ছিল। কোর্টের মিটিংএ প্রায় সব বিষয়েই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেন এবং নানা প্রস্তাব আনতেন। তাঁদের তর্কের উত্তর দেওয়ার ভার ছিল আমাদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপকের উপর। কারণ মুসলমান সভ্যরা যদিও আমাদের পক্ষে ভোট দিতেন, তাদের মধ্যে তেমন বক্তা কেউ ছিলেন না। আমি যে বিশ বছর ঢাকায় ছিলাম, তখন সব সময়েই কোর্টের মিটিএ বিরোধী হিন্দু দলের সঙ্গে আমায় তর্ক করতে হয়েছে। নরেশবাবু যতদিন ঢাকায় ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন আমাদের দলের নেতা। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি তাঁর স্থানে জগন্নাথ হলের

প্রোভোস্ট নিযুক্ত হলাম এবং কোর্টের সভাতেও আমাকে তাঁর স্থান দখল করতে হল। নরেশবাবু প্রবীণ লোক ছিলেন। আমার বয়স কম, হিন্দু সভ্যরা আমায় Leader of the House বলে ঠাট্টা করতেন। মুসলমান সদস্যেরা আমাদের দলে থাকায় ওঁরা কোনদিনই অবশ্য আমাদের অনিষ্ট করতে পারেননি। এঁদের কয়েকজন প্রতিনিধি ছিলেন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে। প্রতি সপ্তাহের অধিবেশনে তাঁদের সঙ্গে আমাদের বাদ প্রতিবাদ চলত। একজন ব্যারিস্টার ছিলেন তাঁদের নেতা। আমার প্রতি তিনি কোন কারণে বেশ রুষ্ট ছিলেন। একদিন তিনি প্রস্তাব করলেন যে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ উঠিয়ে দেওয়া হোক। দলের দু'জন ছাড়া বাকী সতের জনের কেউই অবশ্য এই প্রস্তাবে সায় দেননি। এইরূপে নানাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ব্যাপারে আমরা যে সুখে শান্তিতে ছিলাম তা নয়। তবে মুসলমান ছাত্র শিক্ষক ও শহরের অধিবাসী সকলেই হিন্দু অধ্যাপকদের সমর্থন করতেন। তাঁদের যুক্তি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্যই হল মুসলমানদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় গঠন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এইটিই তাঁরা বিশেষভাবে চাইতেন। আগেকার ঢাকা কলেজের তুলনায় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যায় ও গুণে অনেক বেশী অধ্যাপক আছেন। তাঁদের কাছ থেকে মুসলমানেরা অনেক উপকার পাবে সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী না হলে তো তা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এজন্যেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার বা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লেকচারারের পদে অনেক সময় আবেদনকারীদের মধ্যে গুণে শ্রেষ্ঠ না হলেও উপযুক্ত মুসলমান প্রার্থীকেই নিয়োগ করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু প্রফেসর বা রীডারের বেলায় তা করতেন না। তাঁরা জানতেন এঁদের উপরেই শিক্ষার উৎকর্ষ নির্ভর করে : এইজন্য যোগ্যতম প্রার্থীকেই এই সব পদে নিয়োগ করা উচিত।

(৩৭)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পূর্বেই বলেছি সে অনেক ছাত্র 'হলে' থাকত। যারা

থাকত না তাদের কোন না কোন 'হলের' সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও তিন ভাগ করে প্রত্যেককে তিনটি হলের যে কোন একটির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হত; এবং হলের প্রোভোস্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে সেই হলের সঙ্গে যুক্ত বাইরের ছাত্রদের ভাগ করে দিতেন—যাতে শিক্ষকেরা সেই ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে তাদের পড়াশোনা, অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে পারেন, উপদেশ দিতে পারেন। কাজেই প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন না কোন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হত। পূর্বেই বলেছি ক্লাশের পড়াশোনা ছাড়া প্রত্যেক হলে খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ সাহিত্যচর্চা সমাজসেবা ইত্যাদি নানা বিভাগ ছিল। ছাত্রদের এর কোন না কোনটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। সুতরাং হলের প্রোভোস্ট বা হাউস টিউটর প্রায় অধিকাংশ ছাত্রকেই ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। সেই জন্যই ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সহজেই একটি নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজকালকার দিনে এর মূল্য যে কত বেশী তা বলাই বাহুল্য।

তখনকার ছাত্ররা সবাই যে সুবোধ সুশীল ছিল তা নয়। তারাও অনেক গোলমাল, হাঙ্গামা করেছে। রাজনীতির প্রবল আকর্ষণে ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে নানা আন্দোলনে যোগ দিত। তখন সরকারের নির্দেশ আসত তাদের ঠিকপথে চালনা করবার। আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেকে কারাবরণও করেছিল। তখন আমরা কিভাবে তাদের জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতাম সেকথা পূর্বেই বলেছি।

তখন ছাত্রদের উপর আমাদের কিরকম প্রভাব ছিল সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের খেসার মাঠে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের গোলমাল হওয়ায় সাহেব ভাইস-চ্যান্সেলার পুলিশ সাহেবের উক্তির উপর নির্ভর করে ছাত্রদের দণ্ডবিধান করেন। দণ্ডের মধ্যে একটি ছিল এই যে নিজেদের দুর্ব্যবহারের জন্য তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। ছাত্ররা তা কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী নয়, প্রায় একহাজার ছাত্র একজোট হয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। আমি তখন ঢাকায় ছিলাম না। ইতিহাসের ছাত্রদের নিয়ে অন্যান্য বছরের মতো ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণে বেরিয়েছি। হঠাৎ একদিন ভাইস-

চ্যান্সেলারের টেলিগ্রাম পেলাম—তখনই ঢাকায় ফিরতে হবে। সেই অনুযায়ী ঢাকায় ফিরে এসে স্টেশন থেকে সোজা ভাইস-চ্যান্সেলারের ঘরে হাজির হলাম। আমার ফেরার কথা আগেই জানাজানি হয়েছিল। গিয়ে দেখি ভাইস-চ্যান্সেলারের ঘরের সামনে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রায় হাজার খানেক ছাত্র জমায়েৎ হয়েছে; ভাইস-চ্যান্সেলার দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। কাচের জানালায় টোকা দিতে তিনি আমাকে দেখে দরজা খুলে দিলেন। তাঁর কাছে ব্যাপারটি শুনে বললাম একবার ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে আসি। এই বলে উঠে যেই দরজার দিকে এগিয়েছি তিনি আমার হাত ধরে বললেন, "করো কি। তোমাকে ওরা মেরেই ফেলবে।" বললাম যে সে ভয় করলে তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে থাকা উচিত নয়। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে দরজা খুলে তিনি আমাকে বাইরে যেতে দিলেন। পরের দিন তিনি বলেছিলেন বাইরে বেরনমাত্রই ছাত্ররা চারিদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরছে দেখে আমার জীবন সম্বন্ধে তিনি খুবই ভয় পেয়েছিলেন।

ছাত্রদের মধ্যে গিয়ে আমি তাদের কয়েকজন বাছাই বাছাই নেতাকে কাছে ডেকে নিলাম, এদের আমি জানতাম। এক ঘণ্টার উপর তাদের সঙ্গে অনেক কথা হল। তাদের যে অভিযোগ তাও মন দিয়ে শুনলাম। শুনে ধারণা হল যে কয়েকজন ভারতীয় পুলিশ কর্মচারী প্রথমে ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে; তারপর অবশ্য ছাত্ররা নানারকম গোলমাল এবং হাতাহাতি শুরু করে। উভয় পক্ষে কিছুক্ষণ মারপিটও হয়েছিল এবং সেই সময় কয়েকজন সাহেব কর্মচারীদের দিকে ছেলেরা ধাওয়া করে; তারা অবশ্য ছাত্রদের প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করেনি। ছাত্র নেতাদের সঙ্গে তর্কাতর্কির পর এই মর্মে বোঝাপড়া করলাম যে যেসব কর্মচারী ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে পুলিশের বড়সাহেব তাদের শাস্তি দেবেন; সাহেব কর্মচারীদের কাছে ছাত্রদের নিজেদের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। ক্ষমা চাইতে ছাত্ররা কোনমতেই রাজী হল না। পরে ভাইস-চ্যান্সেলারের সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটির পর এই সিদ্ধান্তই বহাল হয় এবং ছাত্রদের জরিমানা সব বাদ হয়ে যায়।

এই ঘটনার একটি উপসংহার আছে ; তখন জানতাম না, পরে জেনেছি। কয়েক মাস পূর্বে কলকাতার একটি সভায় সে সময়কার একজন শিক্ষক (শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ) এই কাহিনী বলেছিলেন। তখন ইংরাজী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন Wrenn সাহেব। আমি যেদিন ঢাকায় এসে ছাত্রদের সঙ্গে মিটমাট করলাম তার পরের দিন Wrenn সাহেব ইংরাজী বিভাগের শিক্ষকদের ঘরে গিয়ে বলেন, "তোমরা শুনেছ কি যে ভগবান পৃথিবীতে এসেছেন ?" ব্যাপারটি কি ? সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। সাহেব বললেন, "তোমরা তো জান ছাত্ররা বলেছিল যে স্বয়ং ভগবান এসে বললেও তারা দুঃখ প্রকাশ বা দোষ স্বীকার করবে না। এখন যখন তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে তখন ভগবানই এসেছেন বলতে হবে।" এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকদিন হাসাহাসি চলেছিল।

আর একটি ছোট ঘটনার কথা বলি। একদিন ক্লাশ নিচ্ছি এমন সময় ভাইস-চ্যান্সেলারের এক স্লিপ এল—"তুমি এখনই বাড়ি যাও। লাঞ্চ খেয়ে ফেরার পথে আমি এই মাত্র দেখে আসছি যে একদল ছেলে তোমার বাড়ি ঘিরেছে। তোমার স্ত্রী একা আছেন।" তখনই ক্লাশ বন্ধ করে ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার ?" তিনি বললেন যে প্রায় ষাট সত্তর জন ছেলেকে আমার বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বেশ ভয় পেয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ি গেলাম। তখন দুপুর দুটো আড়াইটা হবে। গিয়ে দেখি 'হলে'র ৬০।৭০ জন ছাত্র দাঁড়িয়ে আছে। তারা বলল যে আজ তাদের জন্য খাবার কিছু নেই। সেটা দোল যাত্রার দিন, তারা আবীর খেলতে শহরে গিয়েছিল, অনেক দেরীতে ফিরেছিল। ফিরে দেখে খাবার নেই। সুতরাং এর একটা ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। এই শুনে আমার স্ত্রী বলেছেন, "তোমরা স্নান সেরে এস, খাবারের ব্যবস্থা করছি।" ইতিমধ্যেই তিনি দু'জন ছেলেকে আমার গাড়িতে নবাবপুর থেকে মিঠাই কিনে আনতে পাঠিয়েছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঠাই এসে গেল। ছেলেরা সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে খুশী মনে বাড়ি চলে গেল।

৩

আমি ফিরে গিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলারকে সব বললাম। তিনি বললেন, "এতো বড় আব্দার, হস্টেলে থাবার নেই বলে তোমার স্ত্রীর উপর উৎপাত করবে, এ কেমন কথা?" বললাম, 'সব ব্যাপারে অত খুঁটিনাটি নিয়ম মেনে চলা যায় না। আর এমন ব্যাপারে টাকা খরচাও কিছু অপব্যয় নয়। ভবিষ্যতে গোলমাল হলে দেখবেন ওরাই আমার পিছনে দাঁড়াবে।" গল্পটি বলার উদ্দেশ্য এই যে ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করলে তার প্রতিদান পাওয়া যাবেই। আমার বিশ্বাস ছাত্রদের উপর আমাদের যে এমন প্রভাব ছিল তার কারণ তারা মনে মনে বেশ ভালভাবেই জানত যে আমরা তাদের ভালবাসি।

ডঃ জ্ঞান ঘোষ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার তখন ছাত্রদের সঙ্গে অনেকবার গোলমাল হয়। এই সব মেটাবার উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষকদের একটি সভা ডাকেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন— "যদি কিছু মনে না করেন আমরা একটি অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলি। আমি বা মজুমদার ছেলেদের যে যথেষ্ট শাসন করতাম তার একটা কারণ তাদের সঙ্গে আমরা আন্তরিকভাবে মিশতাম, তাদের অসুবিধা দূর করতে চেষ্টা করতাম। এটা তারাও জানত এবং বিশ্বাস করত। আজকাল ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের আর সে সম্পর্ক নেই। ছাত্র হাঙ্গামা দূর করতে হলে ছাত্রদের সঙ্গে এই রকম সম্পর্ক আগে স্থাপন করতে হবে।"

জ্ঞান ঘোষের মুখে যেমন শুনেছি, লিখলাম। আমারও মনে হয় আজকাল প্রায়ই ছাত্র হাঙ্গামার যে-কথা শুনি তার অনেক কারণ আছে সত্য, কিন্তু ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে পরস্পর পরিচয় ও নিবিড় বন্ধনের অভাবও অন্যতম কারণ।

(৬৮)

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে অনেক বিপ্লবীও ছিল জানতাম। একবার কার্জন হলে পুলিশ ঢুকে কয়েকজন বিপ্লবী ছাত্রকে মারধোর করে এবং একজন ছাত্র মারা যায়। তাতে ছাত্রের দল ক্ষেপে উঠেছিল। অনেক

কষ্টে আমরা ছাত্রদের উত্তেজনা দূর করি এই বলে যে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করছি যাতে একজন সিনিয়ার টিচার সঙ্গে না নিয়ে কোন পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িতে ঢুকবে না এবং কোন 'হলে' সার্চ করতে হলে পুলিশকে প্রোভোস্ট বা হাউস টিউটরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গভর্নমেণ্ট এই প্রতিশ্রুতি পালন করেই চলত। মাঝে মাঝে আমাদের বেশ মুশকিলে পড়তে হত। সাধারণতঃ কোন 'হলে' সার্চ করতে হলে শেষ রাতে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলত এবং খুব ভোরেই সার্চ করত। সুতরাং আমাকেও খুব ভোরে ডেকে তুলত। দুটি সার্চ পার্টির কথা উল্লেখযোগ্য। একবার ঐ রকম ভোরবেলায় পুলিশ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ছাত্রদের প্রতিটি ঘর দেখতে থাকে। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি, পুলিশের লোকে ভিতরে গিয়ে তল্লাস করে। এইভাবে আমরা চলেছি। পুলিশ কর্মচারীটি হঠাৎ এক লাফে একটি ঘরের বাইরে এসে চীৎকার করে উঠল—"বোমা! বোমা!" পুলিশ অফিসারকে বললাম, "কি ব্যাপার, ভিতরে চলুন তো।" কিন্তু কেউ ভিতরে ঢুকতে চায় না; আমাকেও একা যেতে দিতে রাজী নয়, যদি আমি সেগুলি লুকিয়ে ফেলি। পুলিশ কর্মচারীটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল যে চার পাঁচটি বোমা রয়েছে। দেখি ছেলেটির খাটের তলায় কয়েকটি কালো কালো জিনিস। দেখে আমিও কিছু বুঝতে পারিনি। ছেলেটিও কেমন মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে; কিছু বলতে চায় না। আমি তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "আজ্ঞে, ওগুলি তামাক খাওয়ার গুল।" শুনে হাতে করে সেগুলি বাইরে এনে পুলিশকে ব্যাখ্যা করে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম।

আর একবার ভোররাত্রে পুলিশ এসে বলল যে ঢাকা থেকে তিন চার মাইল দূরে একটি ডাকাতি হয়েছে। আমার হলের একজন ছাত্র সেই ডাকাতিতে আছে; এখনই তার ঘর সার্চ করতে হবে। আমি তখনই তাদের সঙ্গে নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ছেলেটির ঘর তালাবন্ধ। পাশের ঘরের একটি ছেলে বলল সে খুব ভোরে উঠে সে বাড়ি চলে গেছে। পুলিশ অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কি কাল রাত্রে এখানে ছিল? 'হলে'র নিয়ম ছিল যে প্রতিরাত্রে ৯।১০টার সময় হাউস টিউটর ছাত্রদের নাম ডেকে খাতায়

হাজিরার ঘরে দাগ দেবেন। হাউস টিউটরকে রেজিষ্ট্রি বই নিয়ে আসতে ডেকে পাঠালাম। দেখা গেল যে ছেলেটি প্রতিদিন রাত্রেই হাজির ছিল। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে ঘরের বাইর থেকে নাম ধরে ডাকার পর সে ভিতর থেকে 'প্রেজেণ্ট স্যার' বলে উত্তর দিয়েছিল। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তালা ভেঙ্গে পুলিশ সেই ঘরে ঢুকল। ঘরে একটি সাইকেল; তার উপর ধুলো জমে আছে। পুলিশ অফিসার বললেন এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ছেলেটি ঘরে ছিল না; ব্যবহার হলে সাইকেলের সিটে ধুলো জমত না। পুলিশের সন্দেহ যে একেবারে অমূলক নয় তা মনে হলেও পুলিশের কথার প্রতিবাদ করে বললাম সে রাত্রে নামডাকা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে সে হাজির ছিল। তাছাড়া হাউস টিউটর নিজে বলছেন যে সে ঘরের ভিতর থেকে সাড়া দিয়েছে—এরপর কি করে অবিশ্বাস করা যায়? যাই হোক পুলিশ তো চলে গেল। কিন্তু আমার মনে বেশ একটু সন্দেহ থেকে গেল। আমাদের "হলে" এক একটি বড় ঘরে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ভাগ করে চারজনের থাকার ব্যবস্থা ছিল। ঐ ছেলেটি যে ঘরে থাকত তার দু'পাশের ঘরে যে দুটি ছেলে থাকত তাদের আমি ডেকে পাঠালাম। তার-মধ্যে একজন আমার কাছে গোপনে স্বীকার করল যে ঐ ছেলেটি তার দিন যাবৎ ঘরে থাকত না। পূর্ববাবস্থামত এই ছেলেটি পার্টিশন টপকে পার হয়ে পাশের ঘরে গিয়ে 'প্রেজেণ্ট স্যার' বলত। এর দু'একদিন পরে এই ছেলেটিই দৌড়ে আমার বাড়িতে এসে বলল যে স্যার, সে এইমাত্র ফিরেছে। আমি বললাম যে এখনই তাকে চলে যেতে বল। পুলিশ যখন পিছু লেগেছে তখন এই 'হলের' আশে পাশে চর রেখেছে। আমার নির্দেশমত ছেলেটি তখনই চলে গেল। কিন্তু পরে সে ধরা পড়েছিল এবং ডাকাতির অপরাধে কয়েক বছর তার জেলও হয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক আমীর খসরু

গৌতম ভদ্র

আজও ইতিহাস ও কাব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সীলি ও ট্রেভেলিয়ানের ঐতিহাসিক বিরোধের নিষ্পত্তি হয় নি। কিন্তু এই বিরোধ বর্তমান যুগ জনিতই ; প্রাচীন বা মধ্যযুগে একটির গায়ে অপরটি অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত ছিল। কবি প্রায়শই হতেন ঐতিহাসিক। সভাকেন্দ্রিক যুগে ইতিহাসকেই আশ্রয় করতেন কবি ; অলঙ্কার শাস্ত্রের ভাষায় নায়ককে হতে হ'ত পুরাবৃত্ত খ্যাত ব্যক্তি। সুলতানী আমলে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে এই রকম একজন কবি-ঐতিহাসিক হলেন আমীর খসরু। তাঁর জীবনী, তাঁর রচনা ও বর্তমানের মানদণ্ডে তাঁর কাব্য ইতিহাস কিনা—তা বিচার করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জীবনী

আমীর খসরুর আসল নাম আবুল হাসান। আমীর খসরু হল তাঁর তৎকালীন সুধীবৃন্দ প্রদত্ত নাম যার অর্থ "কবিদের রাজা।" তুর্ক-আফগান যুগের সকল বর্ণাঢ্যতা ও কলুষতাকে নয়ন ভরে দেখেছেন তিনি। দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী, পর্যটক, রাজদরবারের কেন্দ্রে বসবাসকারী, সহৃদয় ব্যক্তির জীবন তাঁর যুগ ও তাঁর সাহিত্যের মতই আকর্ষণীয়। আবার কবি যেহেতু আত্ম প্রচারে বিমুখ ছিলেন না সেহেতু তাঁর জীবনের সকল বৃত্তান্তই আমরা জানতে পারি। তাঁর জীবনের কাহিনীর মধ্যেই মধ্যযুগের বুদ্ধিজীবিদের আশা, নিরাশা, শ্রেণীগত সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয় উপ্ত আছে। অন্য কোন সুলতানী আমলের ঐতিহাসিককে এতটা ব্যাপক ভাবে জানা সম্ভব নয়। এবং যেহেতু কোন সাহিত্য বা শিল্পই সেই বিশেষ যুগ বা বিশেষ শ্রেণীকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না, যেহেতু প্রত্যেক মানবিক কর্মই কর্তার বিশেষ শ্রেণী চরিত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেহেতু আমীর খসরুর লেখা ইতিহাসকে বোঝার আগে তাঁর জীবনকে, সমাজে কোন শ্রেণী স্বার্থের তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন, কোন দ্বন্দ্ব দ্বারা তার জীবন প্রভাবান্বিত হয়েছিল ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক।

292072

আমীর খসরুর সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিকরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তিনি হাজরা-ই-লাচিন[১] নামে হাজরা দলভুক্ত ছিলেন এবং তিনি জাতে তুর্কী। তাঁর নিজের জবানবন্দীতেই।

"যদিও আমি জন্মে তুর্কী ও সৈনিক"[২].....

তাঁর উপাধি "তুর্করুল্লা"ও তাঁর জাতি নিরূপণের বড় প্রমাণ।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে আমীর খসরুর পৈত্রিক বাসস্থান ট্রান্স্-অক্সিনিয়ায়। তাদের ভারতে আগমনের সময় ও কারণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে দৌলৎ শাহের একক অভিমতানুযায়ী একথা অনুমান করা যায় যে আমীর খসরুর পিতা মাঙ্গাবারাণীর অনুচর ছিলেন। চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণের সময়ে প্রভুর সাথে তিনি পলায়ন করে ভারতে প্রবেশ করেন, পরে তিনি দিল্লীতে ইলতুৎমিসের কাছে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আমীর সৈফুদ্দীন মামুদ। বীর্যবান পুরুষ ছিলেন তিনি। "ইলতুৎমিস তাঁর (সৈফুদ্দীন) সাহায্যে পৃথিবী জয় করেন। ঈশ্বর যেন তাঁকে নিজের কোষমুক্ত অসি করেই সৃষ্টি করেন।"[৩] তিনি তাঁর কর্মদক্ষতার জন্য সাইফ-ই-সানসি উপাধি গ্রহণ করেন।

খসরুর মাতামহের উপাধি ছিল ইমাদ্-উল্ মুলক্। সুলতানের অশ্বশালার অধ্যক্ষ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালক ছিলেন তিনি। "সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন তিনি। যদিও তাঁর নিজস্ব কোন বাহ্যিক রাজচিহ্ন ছিল না, তিনি রাজশক্তির প্রকৃত অধিকারী ছিলেন।.....পাদপ্রদীপের পেছনে তিনি রাজকার্য সমাধা করতেন।"[৪]

অতএব আমীর খসরু জন্ম থেকেই নীলরক্তের অধিকারী ছিলেন। সমাজের উদ্বৃত্ত ধনের দ্বারাই তাঁর জীবিকা নির্বাহ হত এবং তাঁর কাজও ছিল রাজা-বাদশার স্বার্থকেই সমাজে রক্ষা করা। তিনি সেভাবেই ছোটবেলা থেকে পরিবর্ধিত হন।

আমীর খসরু জন্ম গ্রহণ করেন এটাওয়া রাজ্যের পাতিয়ালি নামে জায়গায়। "গঙ্গার তীরে পাতিয়ালা হল সেই জায়গা যেখানে আমীর খসরু জন্মগ্রহণ করেন ও পালিত হন।"[৫] এই পাতিয়ালি হল আগ্রা থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত মোমিনপুর নামে একটি জায়গা। "তাঁরা (খসরুর পিতা মাতা)

সাধারণের মধ্যে পাতিয়ালি নামেই পরিচিত, গঙ্গার তীরবর্তী মোমিনপুরের সুরক্ষিত স্থানে বাস করলেন।"৬ তাঁর জন্ম ৬৫১।১২৫৩ সালে। ৬৮৫ সাল অর্থাৎ আমীর ৩৪ বছর বয়স থেকে ৬৯৩ সাল অর্থাৎ আমীর ৪৩ বছর বয়স পর্য্যন্ত.....।"৭

আমীর খসরুরা তিন ভাই ছিলেন। বড়জনের নাম ইজাজউদ্দীন আলী শাহ এবং ছোট জনের নাম ছিল হাসিমুদ্দীন কুতলুঘ। বড়জন রাজদরবারের কাজে যোগদান করেন ও ছোটজন যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন।

আমীর খসরুর পিতা নিরক্ষর হলেও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অল্প বয়সেই যেহেতু আমীর খসরু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন যেহেতু তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেন। "আমার পিতার একটি মাত্রই আশা পোষণ করতেন যে পুত্র শিক্ষিত হবে।"৮

সেকালে দুই রকম শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল। মসজিদ বা কোন সাধু পুরুষের সমাধিতে মখতাব্ বা পাঠশালা বসত। এখানে মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত পরিবারের ছেলেরা পড়ত। উচ্চ বিত্তের ছাত্ররা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করত।

আমীর খসরু এই দুই রকমের শিক্ষার অধিকারী ছিলেন। যদিও মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান, মাতামহের আনুকূল্য ও দাক্ষিণ্যের জন্য জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য কোনরকমেই ব্যাহত হয় নি। "ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন ছিল কারণ আমার মাতামহ তখনো জীবিত। তিনি আমাকে আশ্রয় দেন ও তাঁর কাজে আমাকে নিযুক্ত করেন।"৯ সুতরাং কৈশোরে দারিদ্র্যের সাথে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয় নি। সেদিক থেকে তিনি সুখী ছিলেন।

ইংলণ্ডের কবি আলেকজাণ্ডার পোপের মত কাব্যের প্রতি আমীর খসরুর বাল্যকাল থেকেই একটা ঝোঁক ছিল। "হস্ত লিখন পদ্ধতি" শেখা তখন একটি অর্থকরী বিদ্যা ছিল এবং খসরুকে তা শেখানোর চেষ্টা হলেও তাতে তিনি অনাগ্রহী ছিলেন।....."পাঠশালায় আমি শুধু কবিতা বলতাম। যখন আমার শিক্ষক সৈফুদ্দীন মহম্মদ.....আমাকে হস্তাক্ষরের পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ দিতেন আমি তখন সুন্দরীদের অবগুণ্ঠন সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ কাব্য লিখতাম।"১০ অবশ্য শিক্ষকরা তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে উৎসাহিত ছিলেন। নানা বিশিষ্ট ব্যক্তি বাল্যকালেই তাঁর লেখা রচনা পড়ে ও শুনে চমৎকৃত হন।

"নগরের কোতোয়াল খাজা এলেন·····আমাকে চুল, ডিম, তীর ও রসুন— এই চার পরস্পর সম্পর্করহিত জিনিষ দিয়ে একটি কবিতা রচনা করতে বললেন।·····আমার চতুষ্পদী কবিতা শুনে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।"১১।

খসরু অল্প বয়স থেকেই যশস্বী হন। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে কৈশোরে বা যৌবনে তিনি কোন বিশেষ জ্ঞানচর্চা বা পাঠ্যসূচী নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করেন নি। সহজাত শক্তি সম্পন্ন ছিলেন তিনি। কাব্য ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য বিষয়ে তাঁর সেরকম কোন ঔৎসুক্য ছিল না।·····"কোন নামকরা শিক্ষকের কাছ থেকে কবিতার রহস্য শিখিনি। আমার গুণগুলো বিকশিত করতে বা ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করতে আমি কারুর সাহায্য নিই নি।·····কল্পনাই আমার কাব্য-নিয়ে পরীক্ষার সব উৎস ছিল। আর বিখ্যাত কবিদের রচনা খুব পড়েছি।"১২ ছন্দ বা অলঙ্কারের নিয়মাবলী সম্পর্কে-ও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না।·····"তুমি আমাকে বললে হে খসরু তুমি ছন্দ সম্পর্কে অজ্ঞ।"·····আমার ছন্দের প্রয়োজন হয় না। নিজস্ব অনুভূতির সাহায্যেই সামঞ্জস্যপূর্ণ কবিতা আমি লিখি।"১৩

বিভিন্ন ভাষায় তিনি দক্ষ ছিলেন। "জ্ঞানপিপাসু মন নিয়ে আমি মনুষ্য কথিত বহু ভাষাই অধ্যয়ণ করেছি।"১৪ তবে তিনি আরবী ভাষা জানতেন না। "আরব সম্পর্কে আলোচনা করার মত আরবী ভাষা আমি জানি না।"১৫

আসল কথা হল এই যে খসরু পারদর্শী ছিলেন না; বরং প্রতিভাবান ছিলেন। তিনি ছিলেন জাত কবি, জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে আমরা যা বুঝি তা তিনি কোনদিনই ছিলেন না।

মাতামহ মারা যাবার পর ২০ বছর বয়সে আমীর খসরু ভাগ্যান্বেষণে লিপ্ত হন। তাঁর একমাত্র গুণ কাব্য রচনা করা। সেটাকে তিনি শুধু নেশা নয়, পেশা হিসাবেও গ্রহণ করলেন। দিল্লীর তৎকালীন সময়ও তাঁর পক্ষে অনুকূল ছিল। মোঙ্গল আক্রমণের জন্য মধ্য এশিয়ার সুধীরা দিল্লীতে আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে দিল্লী সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কেন্দ্রে রূপায়িত হয়েছে। বলবনের সুশাসনে তখন উত্তর ভারতে রাজনৈতিক শান্তি পূর্ণভাবে বিরাজ করছিল। এছাড়া ওমরাহরা নিজেদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয়ের সাথে সাথে বদান্যতা ও

বিদ্যোৎসাহীতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতেন। আধুনিক যুগের মত তখনকার যুগেও বড় বড় গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সমাজে সংস্কৃতির ধারক বলে নাম কেনার একটা "ফ্যাশন" ছিল।

সুতরাং মুরুব্বী জোটাতে আমীর খসরুর খুব বেগ পেতে হয় নি। তিনি হলেন রাজ্যের প্রধান আমীর মালিক চজ্জু। কবির ভরণ-পোষণের ভার তিনিই গ্রহণ করেন। "মাতামহের মৃত্যুর পর কিসলু খাঁনের দরবারে আমি যোগদান করি। তাঁর সংসর্গের জন্যই আমি গৌরবের চরম শীর্ষে আরোহণ করি। তাঁর কাছে কিছুদিন কাজ করার পরেই আমি তাঁর পরম বিশ্বাসভাজন হই।"

কিন্তু মালিক চজ্জুর অনুগ্রহ লাভ বেশীদিন আমীর খসরুর ভাগ্যে ছিল না। দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি বলবনের দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খাঁনের সভা ঘুরে শেষে যুবরাজ মহম্মদের আনুকূল্য লাভ করেন ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাস করেন। সুলতানী আমলের অন্যতম সেরা কবি হাসান আলী সজ্জারীর সাথে তাঁর আলাপ হয়। পাঁচ বছর ধরে অবিরাম কাব্য চর্চায় তিনি লিপ্ত থাকেন। "পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীকে আমি কবিতা লিখেই যেন ভরিয়ে দিয়েছিলাম।"[১৭]

কিন্তু এই সুখের দিনের-ও শেষ হল। মোঙ্গল আক্রমণে মহম্মদ নিহত হলেন ও আমীর খসরু শত্রুদের হাতে বন্দী হলেন। পরে তিনি মোঙ্গলদের হাত থেকে বেঁচে যান। "আমি জীবিত অবস্থায় বন্দী হই। সেই বিপর্যয়ের সময় বিধর্মীরা গলায় দড়ি দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু ভগবানের দয়ায় আমার আয়ু থাকার দরুণ আমি পালিয়ে যাই ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাই।"[১৯]

প্রথমে প্রভুহারা হয়ে খসরু খুব বিপাকে পড়েন। পরে তিনি অযোধ্যায় হাসান আলী সরজন্দারের[২০] কাছে গিয়ে থাকেন। কিন্তু বলবনের পুত্র কায়কোবাদ সুলতান হবার পর তাঁকে সভাকবি হবার আমন্ত্রণ জানান এবং খসরু সাগ্রহে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

বলবনের কঠোর শাসনের পর দিল্লীর সব জায়গায় স্ফূর্তির জোয়ার বয়ে যায়। ভোগ করাই ছিল কায়কোবাদের জীবনের মূল কথা। দিল্লী

ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রমোদ নিকেতন হয়। "অলসেরা তাদের দিন ফিরে পেল।··· বিলাসী, নির্বোধ এবং সুখীরা·····এখন কাজ পেল।·····প্রত্যেকটি বারান্দায় জুরীদের সমাবেশ হল, প্রত্যেকটি গলি থেকে গায়করা সমবেত হল এবং প্রত্যেকটি জায়গায় কবি জন্ম নিল।"২০ আমীর খসরু এই প্রমোদোচ্ছল জীবনে ভোগের জয়গান গাইলেন।

কিন্তু তুর্কীরক্তজাত অভিজাত মামলুক এবং ভারতীয় রক্তজাত মুসলিমদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ভারতীয় খিলজীরা ক্ষমতাদখল করল। নিজে তুর্কী হলেও "চাচা আপণ প্রান বাঁচা"— এই নীতির অনুসরণ করে খিলজীদের জয়গানে মুখর হন এবং পুরনো প্রভুদের কথা বিস্মৃত হন।

বৃদ্ধ জালালুদ্দীন খিলজী কাব্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন ও কবির পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর দাক্ষিণ্য লাভ করে আগের মতই কাব্যচর্চায় দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। "প্রতি রাত্রিতে খসরু রাজসভায় নূতন গজল গাইতেন।"২১ এই সময় তিনি বিদ্রোহী তাঁর পূর্বতন মালিক চজ্জুকে বিশ্বাসঘাতক (বদ্ অহদ্) বলে অভিহিত করেন।

সুলতানের দরবারে আমীর খসরুর পদ ছিল কোরাণের রক্ষাকর্তার বা মুসাফদারীর। তিনি সুলতানের নাদিম বা সভাসদ-রূপেও সম্মানিত হন। তাঁর বার্ষিক বেতন ছিল ১১০০ তঙ্কা। জালালুদ্দীনের কাছেই কবি তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন।

কিন্তু জালালুদ্দীন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে নিহত হবার সাথে সাথেই তিনি আলাউদ্দীনকে সেলাম জানান। "আমিই কি আপনাকে সিংহাসনারোহণের পূর্ব মুহূর্তে প্রথম অভিনন্দন জানাই নি?"২৩ কিন্তু বৈষয়িক এবং ব্যয়কুণ্ঠ আলাউদ্দীনের আমলে আমীর খসরু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন না। "কিন্তু হায়, আমি এতই দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি যে, স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারি না·····এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়····· আমার মত কবি অনশন করছে।"২৪ বরাণীর মতে আলাউদ্দীন খসরুর বেতন কমিয়ে বার্ষিক ১০০০ তঙ্কা দিতেন। তাছাড়া আলাউদ্দীন খসরুকে কিছু কাজের ভার দেন যার ফলে তাঁকে নিয়মিত রাজদরবারে উপস্থিত থাকতে হয়। "যদি আপনার সামনেই আমাকে দিনরাত হাজিরা

দিতে হয় তাহলে কখন আমি কবিতা লিখব ?"২৫ যদিও এই সময়ই আমীর খসরুর কাব্যের শ্রেষ্ঠ কাল। মুসলিম উচ্চবিত্তদের বিকাশ এবং দক্ষিণ ভারতে বিস্তার এই সময়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপস্থিত হয়। দিল্লীতে ব্যাপকভাবে দক্ষিণী সেনা অনুপ্রবেশ করে। আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক নীতির ফলে গ্রামীন জীবনের সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করে দিল্লীর বাণিজ্যজগৎ এক অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সুবিধা ভোগ করে। এক কথায় নিজের শ্রেণীর সমৃদ্ধি খসরুর কাব্যিক সমৃদ্ধিকেই বিকশিত করে। এ ছাড়া এই সময় মধ্য যুগের অন্যতম মরমী সাধক নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সঙ্গে সংস্পর্শ হেতু তিনি আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতায় আউলিয়ার বন্দনা-গান সংযোজিত হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে সুফী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন।

আলাউদ্দীনের হত্যাকারী কাফুরকে খসরু "মেহদী কুশ" বা রাজহত্যাকারী বলেন এবং রাজদরবার থেকে দূরে থাকেন।

মুবারক শাহের সময় কায়াকোবাদের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হল এবং কবিও স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু মসজিদে নমাজ পড়ার রাজানুরোধ প্রত্যাখ্যান করার জন্য নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও মুবারক শাহের সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। আপাতভাবে খসরু এই বিবাদে নিরপেক্ষ থাকলেও অন্তরে তিনি সুলতানের ব্যবহারে অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। "নো সিপিহরে" প্রথমে শেখ পরে সুলতানের বন্দনা আছে। সুলতানের মৃত্যুর পর "দিওল রাণী অর্ খিজির খাঁ" কাব্যে কতকগুলি ছত্র যোগ করে মুবারক শাহকে তিনি "বিমিজর" বা হৃদয়হীন বলেন।

পারওয়ারি২৬ অভ্যুত্থানের সময় আমীর খসরুর কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় না।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের রাজত্বকালে আমীর খসরু আবার রাজকবিরূপে সম্মানিত হন। তিনি এই সময় জুনা খাঁনের সাথে দাক্ষিণাত্য ও গিয়াসউদ্দীনের সাথে বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন। খসরু খানের কাছে অর্থ গ্রহণ করার দরুণ গিয়াসউদ্দীন নিজামুদ্দীন আউলিয়ার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু তাদের বিরোধের বহু গল্পই অসত্য। প্রথমত, আউলিয়া

খুব অসুস্থ ছিলেন এবং ইবন বতুতার সাক্ষ্যানুযায়ী সুলতানের মৃত্যুর আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বরানী, আমীর খুরদ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সন্তের সাথে সুলতানের কোন বিরোধ বর্ণনা করেন নি। ফিরিস্তাই প্রথম বিবাদের উল্লেখ করেন।

বাংলা থেকে আমীর খসরুর ফিরে আসবার আগেই নিজামুদ্দীন মারা যান। গিয়াসউদ্দীনও দুর্ঘটনায় নিহত হন। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত আমীর খসরু গুরুর মৃত্যু সহ্য করতে পারেন নি। ৭২৫।১৩২৫ সালে ৭২ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ও নিজামুদ্দীনের কবরের কাছেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

আমীর খসরুর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় কতগুলি বিষয় পরিষ্কার। এইখানে কয়েকটি প্রশ্ন বিচার করা প্রাসঙ্গিক। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে সুলতানদের তিক্ত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সুফী কবির রাজদরবারে অবস্থান প্রাসঙ্গিক কি না। দ্বিতীয়ত, ঘন ঘন রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে আমীর খসরুর খাপ খাইয়ে নেওয়াটা তাঁর ব্যক্তি চরিত্রে কৃতজ্ঞতা বলে গুণটির অভাব সূচিত করে কিনা। তৃতীয়ত, মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবির জীবন কি ভাবে রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ?

একথা মনে রাখা দরকার বৌদ্ধদের মত সুফীদের দুটি ভাগ আছে— মুরিদ ও খলিফা। খলিফাদের রাজ সংসর্গ ত্যাগ করতে হয় কিন্তু মুরিদরা সংসারের মধ্যেই বাস করতে পারেন। এবং আমীর খসরু এই শেষোক্ত দলভুক্তই ছিলেন। দ্বিতীয়ত, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের উপর সুফীরা খুব গুরুত্ব আরোপ করতেন। রাজদরবারই আমীর খসরুর কবি-প্রতিভা বিকাশের স্বাভাবিক ক্ষেত্র ছিল।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা যায় যে ঘন ঘন রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা বা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা বিপজ্জনক ছিল। সেই পরিস্থিতিতে নীরবতাই ছিল স্বার্থ রক্ষার শ্রেষ্ঠ নীতি। আমীর খসরু সেই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তবে

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে মালিক চজ্জু ও মুবারক শাহ ছাড়া কোন পৃষ্ঠপোষকের তিনি সরাসরি নিন্দা করেন নি।

তৃতীয় প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, জন্মগত দিক দিয়ে বা পেশাগত দিক দিয়ে শোষক শ্রেণীর পক্ষে ছিলেন কবি। তাঁদের সংস্কৃতিই তিনি প্রতিফলিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, তখনকার যুগে কবিদের সমঝদার হতেন রাজা-মহারাজাই। সুলতানের বা ওমরাহদের দাক্ষিণ্যই বুদ্ধিজীবিদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রধান উপায় ছিল। 'জাংক' উপন্যাসে স্পেন্স ড্যুরল আধুনিক যুগে শিল্পপতিদের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবিদের জীবনের কথা বলেছেন। সে রকম মধ্যযুগেও সভাকেন্দ্রিক ছিল বুদ্ধিজীবিদের চলা ফেরা, বাঁচা, জীবন যাত্রার সবকিছুই। সুতরাং তাঁরা ছিলেন পরগাছা জাতীয় এবং শোষক শ্রেণীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতার জন্য সাধারণ মানুষের সাথে তাঁদের শত্রুতামূলক দ্বন্দ্ব ছিল। যেহেতু তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না সেহেতু লেখার স্বাধীনতা তাঁদের কাছে আকাশকুসুম ছিল। আমীর খসরু এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তৃতীয়ত, আমীর খসরুর সাথে রাজসভার যোগাযোগ রাজনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ ছিল না। তিনি মূলত কবি ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। মধ্যযুগের অনেক ঐতিহাসিকই রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমীর খসরু এদিক থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিলেন। কাব্য রচনাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান এবং অন্য সব কিছু তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল। ফলে উদিত সূর্যকেই তিনি সর্বদা বন্দনা করেছেন অতীতের কোন স্মৃতি চারণই তিনি করেন নি। যুগের দাবিকে তিনি অসংকোচে মেনেছেন। ফলত এই নিরপেক্ষ ভাবের দরুণ তাঁর রচনা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখতে পারে নি। সেদিক থেকে কবি নিশ্চয় প্রতিক্রিয়াশীল।

কিন্তু অন্যদিকে খসরুর রচনার মধ্যে ক্ষীণ ইতিবাচক দিক-ও আছে। প্রথমত, সূফী ধর্মমতের জন্য সব ভোগস্পৃহার মধ্যে খসরুর মনে বৈরাগ্যের ভাবনা ছিল, "আমার চোখে সোনার দাম কি? এক মুঠি ধুলো ছাড়া কিছু না।" (গ্রানজে জর্ অনদর্ নজরম্ চিস্ত্? থঅ্গ্)। ফলে তিনি সুলতানদের ভোগ বিলাসকে মনে মনে অপছন্দ করতেন এবং মানসিকতার

দিক দিয়ে শোষক শ্রেণীর সাথে তাঁর বিরোধ ছিল, দ্বিতীয়ত, বোধহয় লেখক রূপেই তিনি নিজের বাক্-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা ও নিজের মানসিক ভাব গোপন রাখার বেদনা তাঁকে অনেক সময় প্রচ্ছন্নভাবে অনেক সত্য কথা বলতে প্রণোদিত করেছে। সেদিক থেকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকার দরুণ তাঁকে প্রগতিশীল বলা যায়। "আমার স্বার্থপরতার জন্য আমি আমারই মত এক মানুষের সামনে নতজানু হয়েছি" বা "প্রতিটি রাজ্যে মিথ্যা কাহিনী বিবৃত করে আমার পথ অনুসরণ করো না"[২৮] ইত্যাদি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি মধ্যযুগের ঐতিহাসিককুলের মধ্যে বিরল। তৃতীয়ত, সূফীদের সাথে যোগাযোগের দরুণ তিনি সাধারণ জনগণের সাথে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ আমীর খসরু এক দ্বৈত সত্তার অধিকারী ছিলেন যা বুদ্ধিজীবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কথা আমীর খসরুর ঐতিহাসিক সত্তা নির্ধারণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমীর খসরুর চরিত্রের অন্যতম দিক হলো তিনি নাগরিক সভ্যতায় দীক্ষিত ছিলেন। নগরের কবি ছিলেন। তিনি—নগর দিল্লীর। বিদেশে থাকার সময় বরাবরই তিনি দিল্লীর জন্য 'নষ্টালজিক' ভাব অনুভব করেছেন, 'হায়! দিল্লীতে এই সময় সুন্দরী সুন্দর শিরোপা পড়ে ঘুরে বেড়াত।"[২৯]

একান্ত ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়ে বলা হয় যে আমীর খসরু অত্যন্ত স্নেহকাতর ছিলেন। তাঁর রচনায় ভাই সন্তান ও মায়ের কথা বহুবার বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তিনি মোটেই ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। পরের দুঃখমোচন ও ভোগ—এই দুইটি উদ্দেশ্যেই তিনি অর্থ চাইতেন। তাঁর অমিতব্যয়িতা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—"আমীর আলী সরজন্দরের দেওয়া প্রচুর বিত্ত যদি আমি চিন্তা করে ব্যয় করতাম তবে আমি ধনশালী হতাম।"[৩০] ব্যক্তি আমীর খসরু দিলদরিয়া ভালো মানুষই ছিলেন।

রচনা

নিজের জীবদ্দশাতেই আমীর খসরু যশস্বী হন। বরণী নিজে কবি সম্বন্ধে মধ্যযুগের লোকেদের মনোভাব বর্ণনা করেছেন "প্রাচীন ও আধুনিক সব কবিদের মধ্যে আমীর খসরু শ্রেষ্ঠ। রচনার সংখ্যাধিক্যে, নব নব ভাষা

সৃষ্টিতে বা বাচ্যার্তীত ভাবের বিশ্লেষণে তিনি হলেন অ-প্রতিদ্বন্দ্বী।...তিনি নিষ্ঠাবান সূফী ছিলেন.....তিনি নিজেই সঙ্গীত রচনা করতেন ও সুরসংযোগে গাইতেন।"৩১

এই জনপ্রিয়তার সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। জনসাধারণ আমীর খসরুর রচনা যত্নের সাথেই অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে। অন্য পক্ষে বলা যায় যে নিজের রচনাকে বিখ্যাত করার মানসে বহু স্বল্প প্রতিভার লোকও আমীর খসরুর নামে কাব্য রচনা করেছেন। সুতরাং আমীর খসরুর প্রকৃত রচনাগুলো নির্ধারণ করার প্রয়োজন আছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে কবি তার বন্ধু তাজউদ্দীন জাহিদের সহযোগিতায় গ্রন্থগুলিকে সম্পাদিত করেন ও প্রত্যেক গ্রন্থের একটি পরিচ্ছন্ন অনুলিপি প্রস্তুত করেন। অবতরণিকায় গ্রন্থের রচনাকাল, রচনার উদ্দেশ্য প্রভৃতি স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে। এই সব তথ্য আমীর খসরুর লেখা গ্রন্থ বিচারে উল্লেখযোগ্য নির্দেশিকা।

মোটামুটিভাবে আমীর খসরুর গ্রন্থগুলিকে এই কয়ভাগে ভাগ করা যায়

(ক) ৫টি দিওয়ান—৩২ "তুহফাৎ-উস্-সিগাহর,
ওয়াসত্-উল্-হাওয়াৎ, ঘুরাৎ-উল—
কামিল, বাকিয়া নাকিয়া, নিহাৎ-উল্-কামিল।

(খ) ৫টি ঐতিহাসিক মথনওয়াভি—৩৩ কুরবাণ-উস্-সাদিন, মিফতা-উল্-ফুতু, আশিকা, নো সিপিহর্ এবং তুঘলক নামা।

(গ) খামসা—৩৭ মাৎলা-উল্-আনওয়ার, শিরিণ-ও-খসরু, আইন-ই-সিকন্দিরী, হস্ত বিহিস্ত ও মজনুন্-উ-লায়লা।

(ঘ) গদ্য-রচনা—খাজাইন-উল্-ফুতু অথবা তারিখ-ই-আলাই আবদল্-উল্-ফুয়াইদ্ এবং ইজাজ-ই খসরুয়ি।

এছাড়া আছে অজস্র গজল ও কবিতা। প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতার কথা মনে রেখে আমরা কবির ইতিহাসধর্মসম্মত রচনার কথাই আলোচনা করব।

আমীর খসরুর প্রথম ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ হল কুররাণ-উস্-সাদিন (দুটি গ্রহের মিলন)। কবি ৩৭ বছর বয়সে ৬৮৮ অল্ হিজরা/১২৯০ খৃষ্টাব্দে কাব্যটি রচনা করেন।

অযোধ্যা থেকে ফিরে আসার দুদিন পরেই কায়কোবাদ আমীর খসরুকে কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করলেন। "তোমার কল্পনা শক্তির সাহায্যে আমার অনুরোধ রক্ষা করলে তুমি তোমার খুশিমত সোনা পাবে।.....আমার সাথে পিতার বিচ্ছেদ দুঃখকে প্রশমিত করার জন্যে পিতার সাথে আমার মিলনকে অবলম্বন করে একটি কাব্য রচনা কর।"[৩৩] রাজানুরোধ আমীর খসরু পালন করলেন।

কাব্যটি বর্ণনামূলক। প্রথমেই ঈশ্বর, মামুদ ও কায়কোবাদের প্রশস্তি আছে। সরোবর ও শীতের সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। বুঘরা খাঁনের বিদ্রোহ ও মোঙ্গল আক্রমণের আখ্যানে প্রথম ভাগ শেষ হয়েছে।

কায়াকাবাদের অযোধ্যা যাত্রা ও পিতার সহিত পত্র-বিনিময়ে কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ শুরু। শেষ হয়েছে পিতা ও পুত্রের সাক্ষাৎকার ও মিলনে।

তৃতীয় ভাগে বুঘরা খাঁন কর্তৃক রাজ্যশাসনের পদ্ধতি বর্ণনা এবং পিতা ও পুত্রের পারস্পরিক বিদায়-গ্রহণ-এর কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কায়কোবাদের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই কাব্য শেষ হয়েছে।

এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক কাহিনী সামান্য। পিতা ও পুত্রের অস্বাভাবিক কলহ ও সেই কলহের প্রহসনাত্মক পরিসমাপ্তি—উচ্চ শ্রেণীর ঐতিহাসিক কাব্যের বিষয় নয়। ফলে আমীর খসরু এই কাব্যে প্রচুর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। "যেহেতু বিষয়টি নীরস ও মূল আখ্যানভাগ প্রাণহীন সেহেতু কবিতাটির মূল বিষয়ের সাথে আমি অন্য কথা যোগ করেছি।"[৩৫] একটি মাত্র ঐতিহাসিক সূত্রে বিধৃত বহু বিচ্ছিন্ন কবিতাগুচ্ছের সমষ্টি-মাত্র এই কাব্যগ্রন্থ।

এর ঐতিহাসিক মূল্য বিষয়গত দিক দিয়ে কতটা গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শী হলেন আমীর খসরু। তিনি বুঘরা খাঁনকে রাজদ্রোহী ও কায়কোবাদকে সুশাসকরূপে চিত্রিত করেন। অথচ বরণী পুত্রের প্রতি পিতার সতর্কবাণীর অভিব্যক্তিরূপেই বুঘরা খাঁনের বিদ্রোহকে বর্ণনা করেছেন। বুঘরা খাঁনকে সিংহাসনের দাবিদার বলে তিনি চিত্রিত করেন নি। বুঘরা খাঁনের নিষ্ক্রিয় চরিত্রের সাথে বরণীর বর্ণনাই অনেক বেশী সঙ্গতিপূর্ণ।

এই গ্রন্থটির আবেদন অন্যত্র নিহিত আছে। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। উৎসব ও ভৌগোলিক অবস্থা, যুদ্ধযাত্রা, রাজকীয় সমাহার, শোভাযাত্রা, নাগরিক বিলাস, রুচি, ব্যসন ইত্যাদি অলঙ্কার-বহুল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেকোন সামাজিক ঐতিহাসিকের পক্ষে তাই গ্রন্থটি মূল্যবান।

আমীর খসরুর দ্বিতীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ হল মিফতা-উল্-ফুতু (বিজয়ের চাবি)। ইহা বস্তুত ঘুরাৎ-উল্-কামিলের অন্তর্গত। কিন্তু গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের জন্য একে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলেই চিহ্নিত করা হয়। গ্রন্থটি রচিত হয় ৬৯০।১২৯২খৃষ্টাব্দে। বিষয়বস্তু হল জালালুদ্দীন খিলজীর যুদ্ধযাত্রা। গ্রন্থটিতে চারটি যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। মালিক চজ্জুর বিদ্রোহ, অযোধ্যার রাজা ও ঝানের রাজার অভ্যুত্থান এবং মোঙ্গলদের আক্রমণ।

এই গ্রন্থটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, আমীর খসরুর আঙ্গিক সহজ ও স্বচ্ছ। দ্বিতীয়ত, কাব্যসম্মত অতিরঞ্জন এখানে বিশেষ নেই। তাঁর কথায় "কবিতা লেখার আগে আমি অতিশয়োক্তি ব্যবহারের কথা ভেবেছিলাম।...কিন্তু সত্যাসত্যের কথা বিচার করে নিজেকে সংবরণ করলাম।" অন্যান্য বিষয় না থাকায় মিফতা-উল্-ফুতু নিছকই যুদ্ধসংক্রান্ত বই এবং মধ্যযুগীয় যুদ্ধবিদ্যার উল্লেখযোগ্য আকরগ্রন্থ।

আমীর খসরুর তৃতীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ আশিকা বা প্রেম। খিজির খাঁনের ও দেবল রাণীর প্রেম হল কাব্যের বিষয় বস্তু। গ্রন্থটি রচিত হয় আলাউদ্দীনের আমলে। উভয়ের মিলনেই কবিতাটি সমাপ্ত হয়। মুবারক শাহের মৃত্যুর পর আমীর খসরু খিজির খাঁনের বিয়োগান্তক পরিণতি নিয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেন।

খিজির খান ও আমীর খসরু দুজনেই আউলিয়ার প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতি ছিল। সুতরাং খিজির খাঁনের অনুরোধে কবি সাগ্রহে তাঁদের দাম্পত্য প্রেমের কথা কাব্যে রূপায়িত করলেন।

কাব্যের প্রথমভাগে আছে ঈশ্বর ও আউলিয়া প্রশস্তি এবং আলাউদ্দীনকে

উপদেশ দেবার ছলে রাজধর্ম সম্পর্কে আমীর খসরুর নিজস্ব চেতনার অভিব্যক্তি। পূর্ববর্তী মুসলিম নৃপতিদের পরিচয় এবং ভারতের ভাষা ও ধর্ম সম্পর্কে গাথায় অবতরণিকা শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে আছে গুজরাট জয়ের কাহিনী ও কমলাদেবীর বন্দীত্ব, দেবলা দেবীর অনুসন্ধান ও সন্ধান লাভ, রাজকন্যার প্রতি খিজির খাঁনের প্রেমের উন্মেষ ইত্যাদি। এইভাবে একটি প্রেমকাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমি রচনা হল।

তৃতীয় ভাগে প্রণয় কাহিনীর বিবরণ ও পূর্বরাগ, মিলনে পারিবারিক বাধা ও অবশেষে বিবাহ—কাব্যের মিলনাত্মক দিক শেষ হয়েছে।

কিন্তু সব সুখেরই শেষ আছে। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর মালিক কাফুর খিজির খাঁনকে অন্ধ ও বন্দী করেছিলেন এবং মুবারক শাহকে হত্যা করেন। একটি চক্রান্তের আবর্তে কিভাবে পবিত্র প্রেম নিষ্পেষিত হল—তারই কাহিনী হৃদয়ের সকল দরদ দিয়ে আমীর খসরু উপসংহারে বর্ণনা করেছেন।

'আশিকার' বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে এই গ্রন্থে খসরু তাঁর প্রতিভার যথোপযুক্ত বিষয় খুঁজে পান এবং গ্রন্থ রচনাটি তিনি অর্থ অপেক্ষা প্রাণের তাগিদেই সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয়ত, রোমান্সের আখ্যানভাগ একটি বাস্তব কাহিনী, নায়ক-নায়িকা ও ঘটনা সবই ঐতিহাসিক। একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসকাব্য "আশিকা"। তৃতীয়ত, আশিকার প্রতিছত্র স্বাদেশিকতায় পূর্ণ। ভারতবর্ষের প্রতি কবির অন্তহীন ভালবাসায় কাব্যটি পরিশোধিত হয়েছে।

আমীর খসরুর চতুর্থ ঐতিহাসিক গ্রন্থ হল নো সিপিহর (নয়টি আকাশ, গ্রন্থটি রচিত হয় ৭১৮ অল হিজরী বা ১৩২০ খৃষ্টাব্দে। কবির তখন ৬০ বছর বয়স। এই কবিতা রচনার প্রাক্কালে তিনি মুবারক শাহ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে উপহারের আশায় কাব্য রচনা করেন।

এই কাব্য পুস্তকটি অসমান আয়তনবিশিষ্ট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। মুসলিম জ্যোতির্বিদ্যার নয়টি আকাশের নামে একটি একটি অধ্যায় চিহ্নিত। প্রত্যেকটি অধ্যায় ভিন্ন ছন্দে রচিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটির শেষে একটি

সাকীনামা ও গজল রয়েছে। 'আবওয়াৎ-ই-সিসিপা'' অর্থাৎ পদার্থ ও বিচিত্র ঘটনার রূপকের মাধ্যমে বর্তমান ঘটনার ইঙ্গিত প্রদান করার পদ্ধতি এই গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে।

প্রথানুযায়ী আউলিয়া ও ঈশ্বরের প্রশস্তি দিয়েই অবতরণিকার শুরু। প্রথম সিপিহের বিষয় হল মুবারকশাহের প্রশস্তি, কবিতা রচনার উদ্দেশ্য এবং দেবগিরি জয়।

দ্বিতীয় সিপিহের বিষয় হল মুবারক শাহের স্থাপত্য প্রীতি, দিল্লী নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব ও ওয়ারঙ্গল জয়। 'স্থির তারার গগনের' নামে অধ্যায়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তৃতীয় সিপিহই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। শনির নামে অধ্যায়টি চিহ্নিত। বিষয়বস্তু হল ভারতবর্ষ। দশটি কারণের জন্য ভারতকে শ্রেষ্ঠ বর্ণনা করে ভারতের উদ্ভিজ্জ, আবহাওয়া ও ভাষা সম্পর্কে বিবিধ মন্তব্য কবি এই অংশে করেন।

চতুর্থ সিপিহতে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নীতিবোধ ও আচরণ নিয়ে আলোচনা আছে। দেবশ্রেষ্ঠের নামে অধ্যায়টি উৎসর্গ করা হয়েছে। এই সিপিহতে তৎকালীন যুগের নৈতিকতার কথা পাওয়া যায়।

পঞ্চম সিপিহতে শিকার যাত্রা ও বিচিত্র অস্ত্রাদির কথা আছে। কালপুরুষের নামে চিহ্নিত।

ষষ্ঠ সিপিহ সূর্যের নামে চিহ্নিত। এইখানে মুবারকশাহের পুত্রের জন্মের কথা বলা হয়েছে।

সপ্তম সিপিহতে ভরতবর্ষের উৎসব ব্যাপক সমারোহভরে বর্ণিত হয়েছে। এই সর্গটি শুক্রের অধীনে।

অষ্টম সিপিহতে পোলোখেলার বল ও লাঠির কথোপকথনের মাধ্যমে সুফী প্রেমের আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। স্বর্গাধিষ্ঠিত গ্রহ হল বুধ।

নবম সিপিহতে ভারতীয় কবিতা ও সাধারণভাবে কাব্য হল বিষয়বস্তু।

নো সিপিহর-এর বিশেষ লক্ষণ হল এই যে বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয়কে কবি একসূত্রে রচনা করেছেন। রাষ্ট্র নীতি অপেক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

বিষয় এই গ্রন্থে অধিক আলোচিত হয়েছে। তাই আমরা গ্রন্থে জনমানসের পরিচয় পাই।

তাঁর শেষ ঐতিহাসিক কাব্য গ্রন্থ তুঘলক নামা। পারওয়ারি অভ্যুত্থান, খিলজী বংশের অবসান এবং তুঘলক বংশের আরম্ভ—এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের উপজীব্য। এই গ্রন্থ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের নামে রচিত হয়।

এই গ্রন্থে যেন একটি নীতিমূলক নাটক বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সু-এর প্রতিনিধি গিয়াসউদ্দীন ও কু-এর প্রতিনিধি হল খসরু খাঁন। এ যেন চিরকালীন ন্যায় ও অন্যায়ের সংগ্রাম।

এই গ্রন্থটি মিফতা-উল্-ফুতুর মত পূর্ণভাবেই রাজনীতি সংক্রান্ত। দিল্লীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিনগুলি তথ্যনিষ্ঠার সাথে আলোচিত হয়েছে।

আমীর খসরুর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ হল খাজাইন উল্ ফুতু (বিজয়ের কোষাগার)। গদ্যে রচিত গ্রন্থটিতে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানের বিজয়গাথা রচিত হয়েছে।

গ্রন্থটির রচনা কাল ৭১১।১৩১৫ খৃষ্টাব্দে। ঈশ্বর ও আলাউদ্দীনের বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ। তারপর এর বিষয় হলো দেওগিরীতে আলাউদ্দীনের অভিযান, সিংহাসনারোহণ, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রাসাদের বর্ণনা, মোঙ্গলদের প্রতিরোধ, গুজরাট, রণথম্ভর, মালব, চিতোর, সিওয়ানা, তেলিঙ্গনা ও মাবার (পাণ্ড্য) জয়।

এই গ্রন্থটি কতকগুলি অসমান অনুচ্ছেদের সমবায়ে রচিত। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে একটি বিশেষ বস্তু ও বিশেষ উপমার উল্লেখ আছে। সংক্ষিপ্ত সারের নামকরণের মতই এই বিশেষ বস্তুর উল্লেখ অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত অর্থকে পরিস্ফুট করে। এই উদ্ধৃতিগুলির নাম 'নিসবৎ' দ্বিতীয়ত, কোরাণের প্রচুর ছত্র তিনি এই গ্রন্থে কৌশলে ব্যবহার করেছেন। তাঁর আখ্যানের মধ্যে তিনি কোরাণের শ্লোক দুভাগে ভাগ করে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যে আখ্যানের গতিবেগ ক্ষুণ্ণ হয় নি।

এই গ্রন্থটির গুরুত্ব তিনদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, আলাউদ্দীনের

রাজত্বে দক্ষিণ ভারতে অভিযানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই রচনা থেকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থে আমীর খসরুর ভাষা স্বচ্ছ ও ভাবের পরিবাহী। তৃতীয়ত, গ্রন্থটির পরিকল্পনা সংহত ও পাঠকের মনকে শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে।

অবশ্য একথা লক্ষনীয় যে গ্রন্থটি আলাউদ্দীনের রাজত্বের পূর্ণ ইতিবৃত্ত নয়। ৭০৫ অল হিজরীতে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে অভিযানই গ্রন্থের মূল আখ্যানভাগ। সময় ও বিষয়ের দিক দিয়ে "খাজাইন-উল্ ফুতু" খণ্ডিত। তার অধুনালুপ্ত 'ফতে নামায়' (কবিরুদ্দিন রচিত) আলাউদ্দীনের কথা পূর্ণাঙ্গভাবে ছিল বলেই আমীর খসরু হয়তো সুলতানের ব্যাপক ইতিহাস রচনা না করে "খাজাইনকে" পরিপূরক গ্রন্থ বলেই মনে করেন।

মূল ইতিহাস গ্রন্থগুলির আলোচনা শেষ করে অন্যান্য শ্রেণীর কয়েকটি গ্রন্থের অনুধাবনার প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে ঘুরাং-উল্-কামিল ও ও ইজাজ-ই খসরুয়ির নাম স্মর্তব্য। প্রথম পদ্য গ্রন্থটি ৬৯৩ অল্ হিজরী বা ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে সংকলিত হয়। কবির ৩৪ থেকে ৪৩ বয়স পর্যন্ত রচিত কাব্যগুলি এই গ্রন্থে সংরক্ষিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় কাব্য সম্পর্কে ও কবির জীবন সম্পর্কে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে।

তাঁর অপর গদ্য গ্রন্থ ইজাজ-ই খসরুয়ি একদিক থেকে অভিনিবেশের দাবি রাখে। সাধারণ লোককে একটি নির্দিষ্ট ও শুদ্ধ গদ্য রচনা শিক্ষা দেবার উদ্দেশেই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থ পাঁচটি 'রিসালায়' বিভক্ত। প্রত্যেকটি রিসালা আবার কতকগুলি 'খৎ' এবং খৎগুলি কতকগুলি 'হারফ্' বা বিষয়ে বিভক্ত। কাব্যরচনার পরিবর্তে বাস্তব প্রয়োজনেই গ্রন্থটি রচিত হয়। লোকরঞ্জন নয়, লোকশিক্ষাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন বিষয়ের জন্য গদ্য রচনার আদর্শ এখানে সংকলিত হয়েছে। ফলে বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং মধ্যযুগের খণ্ড খণ্ড সামাজিক চিত্র এই গ্রন্থ থেকে পাই।

আমীর খসরুর অপর গ্রন্থ আফদল্-উল-ফৈয়াদ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কথামৃতের সংকলন মাত্র। খুবই সহজ ভাষা। কবির তথা ভারতীয় সুফীদের ধর্ম জীবন সম্পর্কে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

ক্রমশ

পাদটীকা

১। হাজরা-ই-লাচিন-'তারিখ-ইফসিদি' থেকে আমরা জানতে পারি 'হাজরা' অর্থ পাহাড়িয়া জাতি। চেঙ্গিজ খাঁনের 'হাজরা' সৈন্যবাহিনীর দলকে-ও হাজরা বলা হত। তাই সাধারণভাবে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী পাহাড়িয়া অধিবাসীদের বলা হত 'হাজরা' যদিও এর বিশেষ কোন জাতিগত অর্থ ছিল না। আর 'লাচিন' হচ্ছে সম্ভবতঃ আমীর খসরু যে দলভুক্ত ছিলেন সেই দলের কোন প্রাচীন নায়কের নাম।

২। ইজাজ-ই-খসরুবি।

৩। খুরাৎ-উল-কামিল।

৪। ঐ।

৫। মুন্-তাখাব-উল্-তওয়ারিখ, বদাউনি।

৬। খুরাৎ উল-কামিল।

৭। ঐ।

৮। ঐ।

৯। ঐ।

১০। তুহফাৎ-উল্-সিগাহর।

১১। ঐ।

১২। খুরাৎ-উল-কামিল।

১৩। বাকিয়া নাকিয়া।

১৪। নো সিপিহর্ ১৮৭: পৃ।

১৫। খুরাৎ-উল-কামিল।

১৬। ঐ।

১৭। ঐ।

১৮। ঐ।

১৯। ঐ

২০। সরজনদার—'জনদর' অর্থ প্রতিহারী বা রক্ষক। 'প্রতিহার' বা 'রক্ষকদের শ্রেষ্ঠ' এই অর্থে সরজনদর কথাটি ব্যবহৃত হত। সাধারণত হারেমের আবকাদিপতি বা সীমান্ত প্রদেশপালরা এই উপাধি লাভ করত।

২১। তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, বরণী। এলিয়ট ও ডসন অনূদিত পৃ: ১২২

২২। ঐ পৃ: ২০০।

২৩। শাহনামা—আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে লিখিত কবিতা।

২৪। আয়ন্-ই-জাল।

২৫। ঐ।

২৬। পারওয়ারি—পারওয়ারি অর্থ মুদ্দাফরাস এবং খসরু খানকে কোন কোন ঐতিহাসিক সেই জাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবশ্য খসরু খাঁন প্রকৃতপক্ষে কোন বর্ণজাত ছিলেন—তা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিপুল মতভেদ আছে।

২৭। মসনুন্-উল্-লায়লা।

২৮। কুলিয়াৎ-ই খসরু। পৃ: ২৪৫।

২৯। ভুজুকাৎ-উস-সিপাহর।

৩০। ঘুরাৎ-উল-কামিল।

৩১। তারিখ। ৩৫৯-৩৬৫।

৩২। দিওয়ানা—খণ্ড খণ্ড কবিতার বা গল্পের সংকলনকে দিওয়ানা বলে।

৩৩। মথনওয়াজি—সাধারণত ফারসী কবিতায় প্রত্যেকটি বয়েৎ অর্থাৎ পূর্ণ অর্থবোধক কবিতার চরণ সমষ্টি দুটি সমান ভাগে বিভক্ত থাকে তাকে বলে 'মিশরা', যে কাব্যে প্রত্যেকটি বয়েৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ, ব্যাকরণসম্মত এবং দুটি মিশরার মিল পারস্পরিক ও অন্য বয়েতের 'মিশরার' মিলের সহিত সাধারণত সম্পর্করহিত, সেই কাব্যরচনা পদ্ধতির নাম মথনওয়াজি। একটি বয়েৎ থেকে অন্য বয়েতে যাবার সময় ছন্দের পরিবর্তন হয়।

৩৪। খামসা—পাঁচটির সমাহার। কোন কোন মুসলিমের কাছে এই সংখ্যাটি পবিত্র। ''পাঁচটি ত্রৈমাসিক কাব্যগ্রন্থের'' সমষ্টিকে খামসা বলা হয়।

৩৫। কুরয়াণ-উস্-সাদিন।

৩৬। মিফতা-উল্-ফুতু।

প্রাগৈতিহাসিক প্যালেষ্টাইন পরিক্রমণ

বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মানব-তৎপরতার বিভিন্ন নিদর্শন বহুলক্ষ বৎসর ব্যাপী পৃথিবীর বুকে বিস্তৃত। প্রত্নতত্ত্ববিদ সেইসব প্রত্নবস্তু বিভিন্ন দেশের প্রান্ত হতে উদ্ধার করে লোকচক্ষুর গোচরে আনেন। পৃথিবীতে এইরকম একটি বিশেষ প্রান্ত হচ্ছে প্যালেষ্টাইন। এই দেশটি একাধারে খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ভূমি, ইহুদীদের স্বর্গ এবং মুসলমানদের দ্বিতীয় পবিত্র দেশ। এখানে ইহুদী ও খৃষ্ট-ধর্মের শৈশবাবস্থা কেটেছে; এই উভয় ধর্মের প্রভাবে ইসলাম-ধর্ম ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর দিগ্বিদিকে ধাবিত হয়েছে। ঐতিহাসিক যেমন এই ভূখণ্ডে অনুসন্ধান করেন বাইবেলোক্ত স্থানসমূহের, তেমনি প্রত্নতত্ত্ববিদ অনুসন্ধান করেন আদিম মানবের কীর্তি-চিহ্ন তথা তৎপরতার নিদর্শন।

এই ভূখণ্ডের পশ্চিমের সীমায় ভূমধ্যসাগর, উত্তরে আনাতোলিয়ার পর্বতশ্রেণী এবং পূর্বে পারস্যের উচ্চ মালভূমির উপলম্ব (escarpment)। বর্তমানকালে এই ভূভাগের অধিকাংশ অঞ্চল মরুভূমির কবলে। কেবলমাত্র পাহাড়ের পাদদেশের প্রান্ত হতে উত্তর-পূর্ব দিক, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমের অংশ পূর্বদিকের তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসের জলধারা এবং ভূ-মধ্যসাগরীয় উপকূলের জল নিষ্কাশন-পদ্ধতি দ্বারা বিধৌত এই অঞ্চলটুকুকেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ "ফার্টাইল ক্রিসেণ্ট" (Fertile Crescent) বা "খণ্ড চন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূভাগ" বলে অভিহিত করেছেন।

ভূতাত্ত্বিক মধ্যজীবীয় যুগের (Mesozoic Age) ক্রিটেসাস্ কল্পে প্যালেষ্টাইন টেথিস সাগরের জলরাশি দ্বারা প্লাবিত ছিল। অবশ্য মহাদেশীয় চড়ায় ঠিক তীরেই তার অবস্থান ছিল। তারপর ক্রীটেসাস্ কল্পের সামুদ্র-পলল লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে সমুদ্র তলদেশে সঞ্চিত হয়ে উত্থিত হতে হতে প্রায় পাঁচকোটি বৎসর পূর্বে নবজীবীয় যুগের (Tertiary Age) প্রারম্ভ-কালের দিকে টেথিস্ সাগরের বুকে জেগে উঠল। আরও একাধিক জটিল আবহ-চক্র আবর্তিত হবার পর মোটামুটি বর্তমান-সীমা প্রাপ্ত হল। সেই

সময়ে এখনকার মত জর্ডন উপত্যকা বা মরুসাগরের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

* * *

ভূতাত্ত্বিকগণের মতে মানুষের জীবাশ্ম ও ভূগর্ভে আবিষ্কৃত তার ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র প্রায় দশলক্ষ বৎসরের প্রাচীন এবং ভূতত্ত্বীয় প্লিষ্টোসিন কল্পের অন্তর্গত। এই প্লিষ্টোসিন কল্পে চারবার শীতল ও আর্দ্র দশার আবির্ভাব হয়েছে। তাদের বিরতিতে উষ্ণ ও শুষ্ক দশা দেখা গিয়েছে। শীতল দশাকে উত্তর অক্ষাংশে "হিমযুগ" (glacial period) এবং প্যালেষ্টাইনের অক্ষাংশে "আর্দ্রযুগ" (pluvial period) বলা হয়। প্যালেষ্টাইনে কোন হিমক্রিয়া না থাকলেও ব্যাপকভাবে বৃষ্টিপাত হত। আবহ-চক্রও ছিল অত্যন্ত জটিল। ভূতাত্ত্বিক জয়েনারের (Zeunner) মতে সাড়ে পাঁচলক্ষ বৎসর পূর্বে ইউরোপে প্রথম অর্থাৎ গুনজ্ হিমক্রিয়ার (Gunz glaciation) সমাপ্তি হয়েছিল।

উপরে পৃথিবীতে দশলক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষের যন্ত্র নির্মাতা হিসাবে আবির্ভাবের কথা বলা হলেও, তুষার যুগের বা হিমান্তর কালের কোন্ সময়ে প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল তা নির্ধারণকল্পে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে একাধিক মত প্রবর্তিত। একদলের মতে, সুনির্দিষ্ট আদিপ্রস্তর নির্মিত যন্ত্রাদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় হিমান্তর কালের মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট। অপরদল ঐ যন্ত্রাদি প্রথম বা দ্বিতীয় হিমান্তর-কালের বলে বিশ্বাস করেন। যাই হোক, প্রথম প্রকৃত প্রস্তর-যন্ত্র হিসাবে আচুলীয়-লেভালোয়িশীয় (Acheulian-Levalloisian) যন্ত্রশিল্প আদি এবং পরবর্তী যুগের মধ্যে সুদীর্ঘকালব্যাপী যোগসূত্র রচনা করে। জয়েনারের মতে আচুলীয় অস্ত্র ৪,৩০,০০ হতে ১,৫০,০০০ বৎসর পূর্বের এবং লেভালোয়িশীয় যন্ত্রশিল্প ২,৩০,০০০ হতে ৮০,০০০ বৎসরের প্রাচীন। তবে প্রাচীনতম যন্ত্রশিল্প দ্বিতীয় হিমান্তরকালের বলে মনে করাই সঙ্গত। এর ব্যাপ্তিও সুদীর্ঘকাল। ফ্রান্সে এই দশাতেই আবিভিলীয় (Abbevilian), চেলীয় (Chellean) এবং আদি আচুলীয় দশার যন্ত্রসমূহ প্রধানতঃ নদী-সোপানে এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে মনুষ্যকর্তৃক পরিত্যক্ত দেখা যায়। শেষ আচুলীয় দশায় সর্বপ্রথম গুহার অবক্ষেপে যন্ত্রসমূহ আবিষ্কৃত হওয়াতে

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অত্যন্ত প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশেই আদিম মানব গুহায় স্থায়ীরূপে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছিল।

প্যালেষ্টাইনেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উন্মুক্ত আকাশতলে চেলীয় বা আদি-আচুলীয় ধরণের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হস্তকুঠার যেমন রয়েছে, তেমনি আচুলীয় দশার অন্তিমকালে পৌঁছিয়েই গুহা-অবক্ষেপে অস্ত্রসস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রধানত হাইফা'র নিকটবর্তী অঞ্চলের একসারি প্রাকৃতিক গুহা যেমন সিরিয়া-প্যালেষ্টাইনের তথা পরিবেশন করে, তেমনি পরিবেশন করে বেইরুট-দামাস্কাস অঞ্চলের অপর একসারি গুহা। মিস্ গ্যারড্ (Miss Garrod) এবং নেভিল (M Neuvill) কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন গুহা হতে (বিশেষ করে মাউন্ট কার্মেল-এ) আবিষ্কৃত প্রাচীনতম মনুষ্য-নির্মিত ফ্লিণ্ট-প্রস্তরের ছিল্‌কার যন্ত্রশিল্প (flake-industry) ফ্রান্সের টায়াসীয় (Tayacian) যন্ত্রশিল্পের সমসাময়িক। যন্ত্রগুলি দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যন্ত্রনির্মাণে উন্নতধরণের কারিগরিক কৌশল ঐসব যন্ত্রনির্মাতাদের তখনও অজ্ঞাত। ভূগর্ভে এই যন্ত্রশিল্পের ঠিক উপরেই প্রাপ্তব্য কিছুটা বিবর্তিত হস্তকুঠার যন্ত্রশিল্প (hand-axe-industry) আকৃতির দিক দিয়ে আবার পশ্চিম ইউরোপীয় হস্তকুঠার যন্ত্রশিল্পের শেষ (আচুলীয়) দশার সঙ্গে সাদৃশ্য-সম্পন্ন। গুহার প্রাচীনতম আচুলীয় যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে আর্দ্র দশার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুর প্রাণীর চিহ্নও রয়েছে। রিস্-উরম্ হিমান্তরকালের শুষ্ক দশায় জলবায়ুর ক্রমবর্ধমান উষ্ণতায় উল্লিখিত সংস্কৃতির পরবর্তী একাধিক বিবিধ দশার আগমন হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নিত্য পরিবর্তনশীল এইরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে প্রতিনিয়তই জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত। সেই সঙ্কটময় কালে মানুষকে অগ্রগমণের পথে অসংখ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। নিম্নপুরাপ্রস্তর যুগের এইখানেই সমাপ্তি। অবশ্য সমাপ্তি হলেও প্যালেষ্টাইনে শেষোক্ত ধারা শেষ হিমান্তর-কাল পর্যন্ত (মধ্যপুরা-প্রস্তর যুগ) সুদীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। এই যুগের মানব-তৎপরতার বিষয় প্যালেষ্টাইনে এর থেকে অধিক কিছু জানা যায় না। পৃথিবীর অপরাপর

প্রান্তের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। মনুষ্য-প্রজাতির কোন্ শাখা এই সব যন্ত্রের নির্মাতা, যারা সেই সুপ্রাচীনকালের অসহনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে কেবলমাত্র ঐসব যন্ত্রের সহায়তায় ভয়াবহভয়ঙ্কর গণ্ডার, হস্তী, বাইসন প্রভৃতি জন্তুর বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করেছিল, তা' অজ্ঞাত। অন্তত সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

এরপরে মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগের একাধিক গুহা খনন করে প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ফ্রিণ্ট-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি ধারা আবিষ্কৃত হল। প্যালেষ্টাইনের মানব-তৎপরতার এই নিদর্শনের নাম হচ্ছে লেভালোয়িশো-মুস্তেরীয় যন্ত্রশিল্প। মানুষ এইসময়ে হস্তকুঠারের পরিবর্তে ছিল্‌কার-যন্ত্র নির্মাণে যত্নবান হয়েছিল। ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষ এইধরণের যন্ত্র ব্যবহার করত বলে জানা যায়। ইউরোপের নিয়ান্‌ডার্থালয়েডরা ছিল্‌কা তুলবার জন্য যে সব কারিগরিক কৌশল একটি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে, তা' হতেও উন্নতধরণের কৌশল প্রয়োগ এই যন্ত্রশিল্পে দেখা যায়। প্যালেষ্টাইনে ছিল্‌কা তুলবার নিপুণতার এই অসাধারণ উন্নতি লক্ষ্য করলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ এখানে প্রাপ্ত উৎকৃষ্ট-ধরণের খননের যন্ত্র বা বাটালি এবং হাতুড়ির সঙ্গে ব্যবহৃত একটি খাঁটি বাটালির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমোক্তটি বস্তুতঃ ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে চাতেলপেরনীয়দের (Chatelperronian) পূর্বে অজ্ঞাত ছিল এবং শেষোক্তটিও উচ্চপুরাপ্রস্তরযুগের পূর্বে ইউরোপের অজানা। সুতরাং কালানুক্রমের দিক দিয়ে প্যালেষ্টাইনের মানুষ ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ অপেক্ষা বহুকাল পূর্বেই যে যন্ত্রনির্মাণে মননশীলতার পরিচয় দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এই যুগের যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে আনুমানিক ১,৫০,০০০ হতে ১,২০,০০০ বৎসরের প্রাচীন এক অবক্ষেপে (deposit) মিস্ গ্যারড্ এবং ম্যাক্‌কাউন (T. D. McCown) একদা বারটি নরকঙ্কাল আবিষ্কার করেছিলেন। নেত্তিলও নজারেথ-এর (Nazareth) দক্ষিণে এক গুহায় একাধিক নরকঙ্কালের সন্ধান পান। পরীক্ষিত জীবাশ্মসকল প্রমাণিত করেছে যে মানুষগুলি সম্ভবত দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্যে প্রকৃত জ্ঞানী নিয়ান্‌ডার্থালেনসিস্ (Palaeon-

thropic man) এবং জ্ঞানী মানবের (Neanthropic man) মধ্যবর্তী এক সঙ্কর জাতীয় ছিল। অবশ্য তাদেরকে উভয় মানবের মধ্যবর্তী কোনও এক প্রকৃত উদ্বর্তিত দশার মানুষ বলে একদল বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এই মত সমর্থীতও হয়। নিয়ান্‌ডার্থলয়েড্‌ মানুষের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একাধিক মুস্তেরীয় মানুষের কঙ্কাল ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তর হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। বাস্তবিকই প্যালেষ্টাইন হচ্ছে এমনই এক আন্তঃ-মহাদেশীয় সেতু। যেখানে মানবজাতির বিভিন্ন প্রজাতির সংমিশ্রণ হয়েছে। জ্ঞানী মানবেরা (Homo Sapiens) নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষকে বিতাড়িত করে সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। সেইসঙ্গে এই দুই প্রজাতির মধ্যে যৌনসম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। এতদ্ভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে আজ এই মত স্বীকৃত যে, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার উচ্চ-পুরাপ্রস্তর যুগের আদি মানবের তৎপরতার পরে প্যালেষ্টাইনে আচুলীয় এবং লেভালো-ঝিশো-মুস্তেরীয় সংস্কৃতি অনাহূতভাবে প্রবেশলাভ করেছিল (Stone Age of Northern Africa, p. 48)।

প্যালেষ্টাইনে এই পর্যায়ের ঠিক উত্তরকালে আবার মনুষ্য-তৎপরতার উন্নত ধরণের চিহ্নাদি পাওয়া গিয়েছে। সেইসব নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল্‌কার যন্ত্র এবং প্রাচীনধরণের এমিরীয় (Emiran) নামে পরিচিত ফলক যন্ত্রশিল্প। এইভাবে, মাউণ্টকার্মেলের বা অন্যান্য প্রান্তে আবিষ্কৃত মনুষ্য-তৎপরতার চক্রবৎ বির্বতনের বিভিন্ন নিদর্শন জীবাশ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকেই সুস্পষ্ট করে যে, প্যালেষ্টাইনেই জ্ঞানী মানবের প্রকৃত উদ্ভব হয়েছিল। এই জ্ঞানী-মানবের (Homosapiens) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক তৎপরতার পরিচয় আমরা ইউরোপের উচ্চপুরাপ্রস্তর যুগ হতেই লাভ করি। অতীতে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় প্যালেষ্টাইনে তিনবার ব্যাপক বৃষ্টিপাত-যুগের আগমন হয়েছিল। প্রথমটির কালেই মানুষ হস্তকুঠার যন্ত্রশিল্প ব্যবহার করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাপক বৃষ্টিপাত-যুগের অন্তবর্তীকালে নিয়ান্‌-ডার্থালয়েড-রা প্রথম আবির্ভূত হয়ে যন্ত্রশিল্প ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাপক বৃষ্টিপাতযুগের পরবর্তীকালের প্রথম দিকে মানুষ প্রাচীনতম ফলক যন্ত্রশিল্প নির্মাণ করেছে। আর তৃতীয় ব্যাপক বৃষ্টিপাতযুগের উত্তর-

কাল হতেই প্যালেষ্টাইনে নাটুফীয়দের তৎপরতার চিহ্নস্বরূপ শেষপাদের ফলক যন্ত্রশিল্প ও তৎসহ আদি কৃষিমূলক চিহ্নাদি প্রকাশিত হয়েছে।

যাই হোক, মানুষ ইউরোপের শেষ হিমদশার (উরম্) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর্দ্রপর্বে শীতল আবহ-চক্রের মধ্যেও লেভালোয়িশো-মুস্তেরীয় সংস্কৃতির ধারা প্যালেষ্টাইনে অবিচ্ছিন্ন রেখেছিল দেখা যায়। তারপরে এইকালেই উচ্চ-পুরাপ্রস্তর যুগের অরিনেশীয় (Aurignacian) সংস্কৃতির মানুষ উপরি উক্ত ধারাকে স্থানচ্যুত করল। প্যালেষ্টাইন ইতিমধ্যে ১,২০,০০০ হতে ২০,০০০ বৎসর পূর্বের মধ্যে উরম্ হিমযুগের সর্বোচ্চ ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র জলবায়ুর তিনটি পর্যায়ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানকার প্রাক্-অরিনেশীয় যন্ত্রশিল্পও অপরাপর স্থান অপেক্ষা যথেষ্ট প্রাচীন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে লেবাননের উপকূলবর্তী একপ্রান্তে আবিষ্কৃত প্রাক্-অরিনেশীয় যন্ত্রশিল্প উচ্চ সাগরাঙ্কের সমসাময়িক এবং কখনই তা ইউরোপের শেষ হিমান্তর কালের উত্তরকালীন নয়।

প্যালেষ্টাইনের অরিনেশীয় সংস্কৃতির ধারকগণ প্রকৃতই এক খাঁটি ফলক যন্ত্রশিল্পের নির্মাতা। তারা যেমন ভোঁতা পশ্চাদ্দেশ-বিশিষ্ট ফলক (blunted backed blade) নির্মান করেছে, তেমনি প্রস্তরখণ্ডের চাঁচনি, উন্নত ছিল্কার চাঁচনি এবং পুরু বাটালির বিভিন্ন আকৃতি দেবার জন্য একাধিক আঘাত দিয়ে (secondary flaking) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলক তুলবার কৌশলও প্রয়োগ করেছে। প্যালেষ্টাইনের এই মানব-তৎপরতার সঙ্গে আবার ইউরোপের কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় অরিনেশীয় সংস্কৃতির মানুষ বিভিন্ন অস্থির যন্ত্রনির্মাণে বিশেষ সমৃদ্ধশালী ; এতে তারা বৈশিষ্ট্যও অর্জন করেছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের অরিনেশীয় সংস্কৃতিতে সেইরকম নিদর্শন খুবই দুর্লভ। শুধু তা-ই নয়, ইউরোপের অরিনেশীয় সংস্কৃতির প্রথম দশার জীবাশ্ম-ধর্মী গর্তযুক্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্রের (Split base point) মতন নিদর্শন প্যালেষ্টাইনের মানুষের প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞাত। ইউরোপের আরও পরবর্তীকালের ঐধরণের যন্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন কয়েকটি অস্থির নিদর্শন সিরিয়ার জাব্‌জদের প্রান্তে আবিষ্কৃত হলেও প্যালেষ্টাইন অঞ্চলের অরিনেশীয় সংস্কৃতির মানুষ এই ধরণের যন্ত্রনির্মানে অনভিজ্ঞ ছিল বলে মনে হয়। প্যালেষ্টাইনের এই

দশার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একটি বিশেষ তথ্য প্রকাশ করে। ইউরোপে অরিনেশীয় দশার শেষভাগ হতে একেবারে ইউরোপীয় পুরাপ্রস্তর-যুগের সমাপ্তিকাল অর্থাৎ ম্যাগদালেনীয় (Magdalenian) সংস্কৃতির কাল পর্যন্ত মনুষ্য-সৃষ্ট সুন্দর সুন্দর প্রাগৈতিহাসিক পশুর গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু, প্যালেষ্টাইন বা তার সন্নিহিত অঞ্চলে আজও পর্যন্ত সেইরকম গুহাচিত্র অনাবিষ্কৃত-ই রয়েছে। এর কারণ সঠিক বলা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপে অরিনেশীয় সংস্কৃতির স্থিতি দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু প্যালেষ্টাইনে দীর্ঘস্থায়ী নয়। সম্ভবত ইউরোপে সলুত্রীয় সংস্কৃতি (Solutrean culture) কর্তৃক অরিনেশীয় সংস্কৃতি বিতাড়িত হবারও বহুপূর্বে প্যালেষ্টাইনের মধ্য-অরিনেশীয় সংস্কৃতি আটলিটিয় (Atlitian) নামক এক নিকৃষ্টধরণের ফ্লিণ্ট সংস্কৃতি কর্তৃক বর্তমান হতে আনুমানিক ১৫,০০০ বৎসর পূর্বে বিতাড়িত হয়েছিল।

প্যালেষ্টাইনে এর পরবর্তী আদি মধ্যপ্রস্তর যুগের মনুষ্য-তৎপরতার বিভিন্ন নিদর্শন ক্রমানুসন্ধানে লোকচক্ষুর গোচরে এলেও তার মাঝে কিছু কিছু ফাঁক এখনও দৃষ্ট হয়। আটলিটীয় বা কেবারানের যন্ত্রশিল্পগুলি ১২,০০০ হতে ৮,০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী। মাউণ্টকার্মেলে আটলিটীয় দশার ঠিক উপরেই হিমোত্তরকালের শেষ দশায় আবির্ভূত এবং আদি খাদ্য উৎপাদক নিওলিথিক দশার ঠিক পূর্ববর্তী এক নাটুফীয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যাওয়ায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আকৃতির দিক দিয়ে ইউরোপের গ্রাভিটীয় (Gravettian) ধারার সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন সর্বপ্রথম প্রকৃত ভোঁতা-পশ্চাদ্দেশ বিশিষ্ট ফলক যন্ত্রশিল্প এইসময়ে এতদঞ্চলে প্রবেশলাভ করেছিল। আরও দক্ষিণাঞ্চলে এই শিকারজীবী নরগোষ্ঠির তৎপরতার আবিষ্কৃত তথ্যাদি সম্ভবত দক্ষিণ-রাশিয়ার সমতলভূমি হতে একেবারে উত্তর পর্যন্ত মূল গ্রাভিটীয় সংস্কৃতির নৈকট্য প্রকাশ করে। যাই হোক, ঐ সংস্কৃতির তুল্য পরস্পর-সম্পর্কীত একাধিক অস্পষ্টধরণের যন্ত্রশিল্প বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল।

ক্রমশই সুপ্রাচীনকালের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যন্ত্রাদি সমসাময়িককালে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হয়, মানুষ নব নব চিন্তাধারা উদ্ভাবন করে এইসব পরিবর্তন-

সাধন করেছিল। এই পরিবর্তন সম্ভবত মধ্য রাশিয়া বা পারস্য হতেই এই অঞ্চলে প্রবেশলাভ করে থাকবে। এমনও হতে পারে যে, এরপরেই কেবারান্ (Kebaran) এবং মিলিত সংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে নিকটসম্পর্কযুক্ত মূল শিকারজীবী নাটুফীয় সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছিল।

• • •

বর্তমানকাল হতে প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্বে (আনুঃ খৃষ্টপূর্ব ৮,০০০ অব্দ) এই দেশে বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মধ্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা নাটুফীয় সংস্কৃতির (Natufian Culture) আবির্ভাব হল। নাটুফীয়রা এক ক্রম-প্রবহমান সংস্কৃতির ধারক। তারা যে কেবলমাত্র গুহাতেই বাস করত না তা' কমপক্ষে তিনটি উন্মুক্ত আকাশতলে তাদের বসতিচিহ্ন আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে। একথা ঠিক যে, তাদের সবচেয়ে ভালভাবে জ্ঞাত বাসস্থান হচ্ছে মাউণ্ট কার্মেলের গুহা। একটি বড় প্রস্তরাশ্রয়ের খোলা মুখে এবং তার সম্মুখস্থ সোপানে বাস করবার সুবিধাজনক স্থান তারা নির্বাচন করেছে। কারণ, স্থানটি জল ও শিকার সরবরাহের এক উপযুক্ত স্থান। সোপানের উপরে তাদের স্থাপিত দুটি প্রস্তরের ছোট বক্ররেখাকে সম্ভবত পৃথিবীতে মনুষ্য-নির্মিত প্রথম স্থাপত্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বরং তাদের বেঞ্চির মতনই দেখায়। সেইসঙ্গে আবার এক বা দুটি প্রস্তরের ছোট স্তবক আচ্ছাদিতভাবেও রয়েছে। রয়েছে একটি চুল্লী বা অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে প্রস্তরের একটি চক্র। প্রস্তরের মেঝেতে কোথাও কোথাও কড়াই-এর মতন আকৃতির সুন্দর গোল এবং সুষম টোল কাটা। সম্ভবত এইসব নিদর্শন নাটুফীয়দের গৃহের চিহ্নাদিই প্রকাশ করেছে।

নাটুফীয়রা বড়শী ও তারের সাহায্যে মৎস্য শিকার করত। তাদের ব্যবহৃত অস্থির বড়শী সম্ভবত প্রাচীনতম জ্ঞাত জিনিষ। এতদ্ভিন্ন তারা সরু অস্থির নির্মিত হার্পুনের সাহায্যেও মৎস্য শিকার করেছে। স্থলভাগের জীবজন্তু শিকারের জন্য নাটুফীয়দের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র আবার জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট ক্ষুদ্রপ্রস্তরের ছিল।

• • •

এ যাবৎ প্রাগৈতিহাসিক প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে যা আলোচিত হল তাতে

শিকারজীবী মনুষ্যতৎপরতার পরিচয়-ই মেলে। ক্রমশঃ সেইসব মানুষের বিস্ময়কর তৎপরতার পরিচয় আমরা লাভ করি। কিন্তু মানব-সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক এবং বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে খাদ্য সংগ্রাহকের অবস্থা হতে মানুষের খাদ্য উৎপাদকের অবস্থায় পরিবর্তিত তথা উন্নীত হওয়া। পৃথিবীর ইতিহাসে এই যে প্রস্তরযুগের প্রথম এবং বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হতে চলেছিল, যা মানব-জীবনযাত্রা প্রণালীর আমূল পরিবর্তন সাধন করল – তা' সর্বপ্রথম এই "কার্টাইল ক্রিসেন্ট"-ই সংঘটিত হয়েছিল। মাউন্ট কার্মেলের ওয়াদি-এল্-নাটুফ (Wadi-el-Natuf) নামক প্রান্ত হতেই খাদ্যের বিষয়ে সংগ্রহ ও শিকারীর পর্যায় হ'তে কৃষিজীবী পর্যায়ে মানুষের ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রাচীনতম প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে। এখানে কাস্তের ফলক (sickle-blade) এবং গাঁতি (picks) পাওয়া গিয়েছে। কাস্তের উপরে চাক্‌চিক্য ও মসৃণতা বিদ্যমান। ঘাস বা শস্যের মধ্যে কিছু পরিমাণ সিলিকার অবস্থান-হেতু শস্য কাটবার যন্ত্র ক্রমাগত সিলিকার ঘর্ষণে ঐরকম চক্‌চকে এবং মসৃণ হয়েছে। সুতরাং, নাটুফীয়রা যে শস্য বা ঘাস-জাতীয় কিছু কাটবার জন্য ঐ জিনিষ ব্যবহার করেছিল তা নিশ্চিত। কাস্তের দীর্ঘ ফলকের হাতলে জন্তুর মস্তক খোদিত দেখা যায়। এমনও সোজা অস্থির হাতল আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে চরণশীল পশুর মূর্তি খোদিত। আবার কতকগুলি অস্থির হাতলে একই রেখায় একাধিক ফ্লিন্টপ্রস্তরের ফলক বসানো। কালক্রমে কাস্তের আকৃতির রূপান্তর হলেও প্যালেষ্টাইনে উত্তরকাল এমনকি লৌহযুগের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত সেই একই নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। কতকগুলি গাঁতি দেখতে লাঙ্গলের মত, সম্ভবত শস্য বপনের পূর্বে মৃত্তিকা ভাঙ্গবার জন্য ব্যবহৃত হত। আবার মাউন্ট কার্মেলের মুঘারেত্-এল্-ওয়াদ-এ (Mugharet-el-Wad) উঁচু বেরযুক্ত গোলাকার কড়াই-এর মতন গর্ত নাটুফীয়রা তাদের গৃহের সম্মুখে নির্মাণ করেছিল। পূর্বেই তা' উল্লিখিত হয়েছে। ঘাসের বীজ চূর্ণ করবার জন্য এইগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল বলেই মনে হয়। একটি বেসল্টের খলে (Pestle) আবার হরিণের ক্ষুর খোদিত। কোন কোন খলের ভিতর লাল গিরিমাটির মতন কিছু চিহ্নও দেখা যায়।

এইগুলি সম্ভবত খাদ্য-পেষাই করবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর ঘাস উপরি উক্ত কাস্তের সহায়তায় কাটা হয়েছিল তা' আমাদের অজ্ঞাত। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, প্যালেষ্টাইন বুনো বার্লি এবং এমের-এর স্বাভাবিক বাসস্থান।

নাটুফীয়রা খননের জন্য ব্যবহারোপযোগী আরও ভারী ফ্লিণ্টের তীক্ষ্ণ অস্ত্র নির্মাণ করেছিল। পূর্বের আলোচনায় দেখা গিয়েছে, নাটুফীয়রা খাদ্যের বৃহত্তম অংশ শিকার করে এবং মাছ ধরে সংগ্রহ করত। তাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল কেবল ছাগল ও কুকুর। কুকুরের সহায়তায় শিকার করা মৃগ, ছাগলের মাংস এবং হার্পুনের সাহায্যে ধরা মাছ এই ক্রমবর্ধমান নাটুফীয় জনগোষ্ঠীর স্থায়ী খাদ্য যোগান দিত।

ইতিমধ্যে নাটুফীয়দের অস্থির যন্ত্রশিল্পও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। বেধনী (awl), আলপিন ছুঁচ প্রভৃতি যেমন তারা নির্মাণ করে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করেছে তেমনি তারা মালা, হার, বালা প্রভৃতির দ্বারা দেহ অলঙ্কৃত করেছে। নাটুফীয় নারীরা সচ্ছিদ্র শঙ্খ (shell) সুতোয় গেঁথে কটিবন্ধ অলঙ্কৃত করেছে। অস্থির কর্ণাভরণও তাদের ব্যবহার্য জিনিষ ছিল। এইসব চিহ্নাদি এবং এই সংস্কৃতির ঠিক উত্তর কালের ফ্লিণ্টপ্রস্তরের যন্ত্রাদি (গাঁতি, কুঠার প্রভৃতি) যে মৃৎপাত্র ব্যবহার করবার পূর্বে এক বিশেষ যুগে নির্মিত হয়েছিল তা গারষ্টাং (Garstang) কর্তৃক জেরিকোর (Jericho) সর্বশেষ অনুসন্ধান হতে প্রমাণিত হয়েছে। বাস্তবিকই নাটুফীয়দের এই তৎপরতায় মৃৎপাত্র অনুপস্থিত। আবার খৃষ্ট-পূর্ব ৫,০০০ অব্দের সমসময়ে ঐ যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে মৃৎপাত্রের আগমণ লক্ষ্য করা হয়। এই যুগের যন্ত্রের নির্মাণ-কৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখে নেভিল এই "তাহুনীয়" (Tahunian) যন্ত্রশিল্পকে নিওলিথিক বা নব্যপ্রস্তর যুগের বলে অভিহিত করলেন। এই শিল্প ইউরোপের নিওলিথিক দশা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। নিকটপ্রাচ্য হতেই ঐ অঞ্চলে তা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং খৃষ্ট-পূর্ব তিন সহস্রাব্দের মধ্যভাগে উত্তর ইউরোপে পৌঁছেছিল।

নাটুফীয় সংস্কৃতির আলোচনাপ্রসঙ্গে তাদের মৃতদেহ কবরস্থ করবার বিষয়

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুহার মধ্যে একসঙ্গে একাধিক মানুষ যে সমাহিত করা হয়েছিল তা একস্থানে তিনটি স্তরে একই শ্রেণীর দশটি নরকঙ্কাল পাওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে। বড় গুহার সোপানের উপর অপরাপর মানুষকে কবরস্থ করা হত। গুহার মধ্যে মৃতদেহ ছড়িয়েই সমাহিত করা। আর সোপানে মৃতদেহগুলি কুঞ্চিত অবস্থায় দেখা যায়। মনে হয়, সোপানের কঠিন-চাপা মেঝেতে অপেক্ষা গুহায় গর্ত খনন করা সহজ ছিল। সেইকারণে মৃতদেহ শয়ন করানোতে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নাটুফীয়রা যে মৃতদেহের সঙ্গে কিছু কিছু জিনিষ কবরস্থ করেছিল তা ঐ কবরে একাধিক উৎকৃষ্ট গুটিকার নিদর্শন হতে প্রতীয়মান হয়েছে। এইপ্রসঙ্গে করোটির অন্তত দুটিতে শঙ্খের (shell) গুটিকা-নির্মিত শিরোভূষণের চিহ্নপ্রাপ্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, নাটুফীয়রা কুকুরের সাহায্য পেয়েছিল। যদি আনুমানিক ৭৭৫০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে নাটুফীয়দের কাল হয়, তাহলে তারা উত্তর ইউরোপের মাগ্‌লেমোশীয়দেরও (Magleinosean) পূর্বে কুকুরকে পোষ মানিয়েছিল। মৃগের মধ্যে তারা বেশী পরিমাণে গ্যাজেল শিকার করত। কিন্তু, নাটুফীয়রা যে শিকারে পূর্ববর্তী যেকোনও যুগ অপেক্ষা অনেক বেশী তৎপর এবং সুনিপুণ ছিল তা হায়না, ভল্লুক, বন্যশূকর, নেকড়ে প্রভৃতি মারাত্মক ধরণের পশুর বড় বড় অস্থি আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে। এইকালে প্যালেষ্টাইনের জলবায়ু বর্তমানের মতই ছিল।

নাটুফীয়রা আদি মেডিটারেনিয়ান্ (early Mediterraneans) মানুষের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিল বলে মনে হয়। লম্বা-মাথা, পাতলা সুন্দর গঠন, এবং সুন্দর মুখ। উচ্চতায় সাড়ে পাঁচফুটের সামান্য কিছু বেশী।

এইপর্যন্ত নাটুফীয় সংস্কৃতির আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, তাদের ব্যবহৃত উপকরণাদি খাদ্য-উৎপাদকের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করে না। অতএব এই সংস্কৃতি শিকার দশা হতে খাদ্য-উৎপাদন দশার উদ্বর্তনের মধ্যবর্তী আদি দশা প্রকাশ করে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।*

* গর্ডন চাইল্ড বলছেন, এই নাটুফীয়রা হয়তো ছিল এক অনগ্রসর নরগোষ্ঠির মানুষ। অপর এক উন্নত ধরণের কৃষিজীবী নরগোষ্ঠির কতকগুলি সাংস্কৃতিক উপাদান (অর্থনৈতিক বিধি) গ্রহণ করলেও নিজেদের অনগ্রসর জীবনযাত্রা প্রণালীকে হয়তো পুরোপুরি ঢালিয়ে সাজাতে পারে নি (Man Makes Himself, 3rd ed., p.69)। ইহা যুক্তিগ্রাহ্য হলেও প্রমাণ-সিদ্ধ নয়।

তার চেয়ে বরং এই প্রান্তটিকে অর্ধ-যাযাবরশ্রেণীর সাময়িক আবাস বলা যেতে পারে। একদিকে এরা শিকার করেছে, অপরদিকে ভারতবর্ষে-কথিত ঝুম-পদ্ধতি চাষের সঙ্গে (Shifting Cultivation) কিছু সম্পর্কও করতে শিখেছে। আদি প্রাগ্য কৃষিসমাজের কালের মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি, তারা প্রকৃতই খাদ্য উৎপাদক। এই নাটুফীয়রা তখনও পর্যন্ত সেই স্তরে বা পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। এবং নাটুফীয়দের এই বসতি-কেন্দ্র প্রকৃতই প্যালেষ্টাইনের খাঁটি কৃষিজীবীর প্রথম পল্লী অপেক্ষা প্রাচীন। একথাও বলা নিশ্চয় অসঙ্গত নয় যে, পৃথিবীর মানবসমাজের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই নাটুফীয়রাই নবাপ্রস্তর যুগের বিপ্লবের পথপ্রদর্শক।

* * *

নিকটপ্রাচ্যের মানুষ যে প্রাক্-মৃৎশিল্পীয় নবাপ্রস্তরযুগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির পথে চালিত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ক্রমশই তারা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে একটি স্থায়ী আশ্রয়ের চতুষ্পার্শে গ্রামে বসবাস করতে আরম্ভ করল। এই কালের বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাইগ্রিস নদীর পূর্ব-দিকে কুর্দিসের পাদদেশে কোয়াল্-এত্ জারমো'তে (Qual-at-Jarmo)। অবশ্য প্যালেষ্টাইনে জর্ডন-উপত্যকার মরুদ্যান-পল্লী জেরিকোর (Jericho) কতকগুলি "ঢিবি" ও আনুমানিক ৭,০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের মানব-বসতির উল্লেখযোগ্য উপাদান প্রকাশ করেছে। জেরিকোর ভূ-প্রকৃতি একটি ভিন্ন রকমের। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৭০০ ফুট নিম্নে এর অবস্থান।

জেরিকো হতেই পৃথিবীর প্রাচীনতম জ্ঞাত স্থায়ী গৃহ পাওয়া গিয়েছে। প্রধানতঃ মাটির দেওয়াল দিয়ে গৃহগুলি নির্মিত। ঘরের অভ্যন্তরভাগে চুণের প্রলেপ। কখনও কখনও ঘরগুলি চিত্রিতও করা হয়েছে। মেঝেগুলি উজ্জ্বল মাটির। জেরিকোর একটি স্থানে এই ধরণের সাতটি পরপর স্থাপিত মেঝে দেখা যায়। দু'টি কাঠের দণ্ডের উপর একটি বারান্দা ভিন্ন দু'টি ঘরবিশিষ্ট (একটি গর্ভগৃহ ও অপরটি চওড়া-সম্মুখস্থ কক্ষ) একটি গৃহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি সম্ভবত ধর্মমন্দির বা দেবালয় জাতীয় কিছু ছিল।

এই সৌধের ভিতরে এবং চতুষ্পার্শে কোথাও গৃহস্থের ব্যবহৃত তৈজস-পত্রাদি পাওয়া যায়নি। কিন্তু, সেখানে কাঁচামাটির একাধিক পশুমূর্তি (ভেড়া, বড় গাভী, ছাগল প্রভৃতি) এবং পুরুষ লিঙ্গের অনুরূপ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মাঘারেত্-এল-ওয়াদেও (Magharet-el-Wad) নাটুফীয়দের নিদর্শনে সুন্দরভাবে খোদিত একটি ফ্লিণ্ট প্রস্তরের লিঙ্গ দেখা যায়। সুতরাং, লিঙ্গ-উপাসনা ইতিমধ্যেই যে প্যালেষ্টাইনের নব্য প্রস্তরযুগে পুরাতন হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এবং আরও জানা যায় যে, ঐ জেরিকোর মানুষগুলির কাছে টোটেম-তন্ত্র অজ্ঞাত ছিল না। উপরি-উক্ত গৃহের নিকটবর্তী অপর একটি গৃহের মেঝের নিম্ন হতে দু'টি পুরুষের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। তারমধ্যে একটিকে স্পষ্টতই আক্রমণ করে হত্যা করা হয়েছিল।

নিওলিথিক জেরিকোর স্থায়ী পল্লীটির আয়তন আট একর, যা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। আরও আশ্চর্যজনক হচ্ছে এই পল্লীর রক্ষা-ব্যবস্থা। ২৭ ফুট প্রশস্ত ৫ ফুট গভীর একটি পাথর-কাটা পরিখা পল্লীটিকে সুরক্ষিত করেছে। এতদ্ভিন্ন জেরিকোর মনুষ্য-সৃষ্ট অপরাপর স্থাপত্যও কম জটিল নয়। বড় বড় প্রস্তরের উঁচু দেওয়াল তারা যেমন দিয়েছে, তেমনি সূর্যতাপে শুষ্ক কাঁচা ইট-ব্যবহারও তারা করেছে। এখানকার আদি বসতি-স্থাপনকারীরা শিকারও সংগ্রহ করেছে এবং সেইসঙ্গে বর্ষব্যাপী স্থায়ী জলের সহায়তায় কিছু কিছু শস্যও উৎপাদন করেছে। পশুর কাঁচা মৃৎ-মূর্তি যেমন তাদের সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রমাণ, তেমনি কাস্তের ফলক, পেষণ-যন্ত্র এবং কাদার সারি দিয়ে তৈরী শস্যাগার বা ভূগর্ভস্থ শস্যাগার তাদের শস্যাদি চাষ করাকেই প্রমাণিত করে। সেইসঙ্গে তারা মেষ ও ছাগল পালন করেছে। কিন্তু তারা কোন মসৃণ-প্রস্তরের কুঠার ব্যবহার করত না। অগ্নি-দগ্ধ করে কাদামাটি হতে মৃৎপাত্র তৈরীর কৌশলও তাদের অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং ইহা (Jericho I) প্রাক্-মৃৎশিল্প যুগীয় নিওলিথিক দশা। আরও সহস্র বৎসরের পরবর্তী কালের অপর একটি গ্রামেও (Jericho II) ঐ একই দশার নিদর্শনাদি উন্নত ধরণের মানুষকর্তৃক নির্মিত দেখা যায়।

এইকালে মৃৎপাত্র দৃষ্টত মানুষের অজ্ঞাত ছিল। তবে ক্যাল্‌সিটের (Calcite) খোদাই করা মালসা (bowl) এবং বেসল্ট ও চুণাপাথরের খণ্ড হতে নির্মিত হামানদিস্তা ব্যবহৃত হত।

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ব্রেইড্‌উড্ নিওলিথিক জেরিকোর উৎপত্তি পূর্ব-আলোচিত মেসোলিথিক নাট্‌ফীয়দের হ'তে হয়েছে কিনা, সে-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—

"While I am not sure that the Jericho sequence will prove valid from those parts of Palestine outside the special Dead Sea environmental niche, the sequence does appear to proceed from the local variety of Natufian into that of a very well settled community"

—(Prehistoric Men, p. 133)

প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত ট্রান্সজর্ডনে বহু ছোট ও বড় "পাথরের টেবিল" বা "Dolmen"-এর প্রাস্ত রয়েছে। এই "পাথরের টেবিল"-এ বড় বড় প্রস্তরের খণ্ড একের 'পর এক রেখে কখনও একটি প্রকোষ্ঠের দেওয়াল, কখনও বারান্দা, আবার কখনও বা একাধিক প্রকোষ্ঠ তৈরী করা হয়েছে। তার উপরে আবার বড় বড় প্রস্তর খণ্ড চাপা দিয়ে ছাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর সমস্ত গঠনটাই মাটির বা প্রস্তর-স্তূপের নীচে সমাহিত করা। এগুলি ছাড়া এইসব অঞ্চলে বৃহদায়তনের একক প্রস্তর-স্তম্ভ বা মেনহির (Menhir), প্রস্তর-চক্র (stone-circle) প্রভৃতিও রয়েছে। মনুষ্য-নির্মিত এইসব উপাদানে মৃৎপাত্র বলতে গেলে অনুপস্থিত। পাথরের টেবিলের মধ্যে বা সন্নিকটে প্রাপ্ত বহু উত্তরকালের কয়েকটি পাত্র এবং নব্যভাবাপন্ন খোলাম কুঁচি তাদের আবির্ভাব সম্পর্কে কোন তথ্য পরিবেশন করতে পারেনা। বৃহৎ প্রস্তর-স্মৃতিস্তম্ভ যুগের নিদর্শন, বিশেষ করে পাথরের টেবিল ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে (বিশেষত ভারতের দাক্ষিণাত্যে) দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে তাদের সময় আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চম হতে দ্বিতীয় সহস্রাব্দ। বিশেষ করে মেগালিথিক-প্রস্তর-মন্দিরগুলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের। প্যালেষ্টাইনের উপরি-উক্ত নিদর্শনগুলির সঙ্গে গঠনের

দিক দিয়ে ইউরোপের নিওলিথিক এমনকি ব্রোঞ্জযুগের নিদর্শন মিল থাকলেও প্রথোমোক্ত নিদর্শনগুলি নিঃসন্দেহে প্যালেষ্টাইনের নিওলিথিক যুগের আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব ৫,৫০০-৪,০০০ অব্দ)। পাথরের টেবিলে যে গৃহেরই অনুকরণ ছিল তা বলা-ই বাহুল্য। মানুষ তাতে বাস করত।

প্যালেষ্টাইনে প্রাক্-মৃৎশিল্প যুগের পর তার অধিকার করল মৃৎপাত্র ব্যবহৃত নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা। এই পর্যায়ের উৎকৃষ্ট নিদর্শন সাড়ে চার মীটার ভগ্ন-স্তূপ-রাশির পরে জেরিকো-৯ (Jericho-IX) হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে ভূগর্ভে কাঁচামাটির বেড় দেওয়া শস্যাগার, তুষ বা বালি-মিশ্রিত কাঁচামাটির মূর্তি এবং তুষ মিশ্রিত সুদগ্ধ মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যেই পাত্রগুলিতে ধরবার জন্য ছোট ছোট হাতল যুক্ত হয়েছে এবং সমতলভাবে সেগুলি বিদ্ধ করা। পাত্রগুলির গাত্রে কখনও কখনও লালাভ প্রলেপও দেওয়া হয়েছে। জেরিকোর এই একই স্তরে একটি বেদীতে পাওয়া গিয়েছে কাঁচা মাটির প্রতিমাসদৃশ্য ত্রিমূর্তি—একটি শ্মশ্রুধারী পুরুষের, একটি স্ত্রীলোকের এবং অপরটি এক শিশুর। ইহা নিঃসন্দেহে নিওলিথিক জেরিকোর মৃৎশিল্প দশার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তাদের প্রত্যেকেরই চোখ ঝিনুকের (shell)। ঐ একই স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে দুই-তলা বিশিষ্ট শস্যাগার বা দেবালয়ের প্রতিরূপ (model)। সুতরাং সুমের-এর মত নিওলিথিক জেরিকোর সমাজ সম্ভবত ত্রিমূর্তির উপাসনাকে ঘিরে পরিচালিত হয়েছিল।

❖ ❖ ❖

সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে দশ হাজার বৎসর পূর্ব-কাল পর্যন্ত মানব তৎপরতার বিভিন্ন পর্যায়ের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য যে প্যালেষ্টাইনে বর্তমান তা উপরি উক্ত আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতীয়মান হয়েছে, পুরাপ্রস্তর যুগে মানব-তৎপরতার সেই গতি ছিল অতি শ্লথ। জীবনযাত্রা প্রণালীর বা যন্ত্র নির্মাণের সামান্য এতটুকু উন্নতিসাধন করতে হাজার হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। তারপরে সেই মহা নিশ্চেয়তা-যুগের পর অসংখ্য পরীক্ষা ও ভ্রান্ত-ধারণার মধ্য দিয়ে এবং অদ্ভুত ও অপ্রয়োজনীয় জটিলতায় নিজেদের

জড়িয়ে তবে সেই মানুষ একটি কার্যকরী অভ্যাসে এসে পৌঁছেছে। এই ভাবে অগ্নি প্রভৃতি একাধিক বৈপ্লবিক আবিষ্কারের পর দশ হাজার বৎসর পূর্বে বিবর্তিত মানবসমাজের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক ঘটনা তারা ঘটালো। খাদ্য-সংগ্রহের আর্থিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত পুরাপ্রস্তর যুগের মানব সমাজের শিকার-নির্ভর জীবনযাত্রা-প্রণালী অব্যবহিত পরে এইভাবে চরম বিকাশলাভ করল। প্যালেষ্টাইনের অরিনেশীয়, ম্যাগ্‌দালেনীয় প্রভৃতি সংস্কৃতির পর পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ নেতারা প্রস্তর যন্ত্র নির্মাণে যুগান্তর এনেছে, শিকারী জীবনের সাফল্য নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কারে সুনিশ্চিত করেছে। কুকুর এবং ছাগল পোষ মানিয়ে এই ভাবে শিকার ও সংগ্রহের ইতিহাসে তারা নূতন অধ্যায় যোগ করেছে। তারপরে নাটুফীয় বা জেরিকোর নিওলিথিক মানুষকে সর্বপ্রথম মৃৎপাত্র তৈরী করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় রত থাকতে দেখা যায়। পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ বৎসরের শ্লথ গতি অপেক্ষা এ যে অতি দ্রুতগতি তাতে সন্দেহ নেই। সর্বোপরি, এইকালেই মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহকের অবস্থা হতে খাদ্য-উৎপাদকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। মানুষ কৃষি ও পশুপালনের সাহায্যে এইভাবে খাদ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে মৃৎ-শিল্প, বয়নশিল্প, ধাতু, চাকা প্রভৃতি আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবসভ্যতার প্রথম লীলাক্ষেত্র (অর্থাৎ প্রথম নগর-সভ্যতা) আগমনের পথ ত্বরান্বিত করে দিয়েছে।

প্রমাণ পঞ্জী

Archaeology of Palestine, The—W.F. Albright
Dating the Past—Zeunner.
Flint Implements-Pub. by The Trustees of the British Museum.
Man Makes Himself—V. G. Child.
Man The Tool Maker—K. P. Oakley.
New Light of the Most Ancient East—V. G. Child.
Old Stone Age-Burkitt
Prehistoric Men—R J. Braidwood.
Stone Age of Northern Africa, The—C.B. M. M. Burney.
What Happened in History—V. G. Child.

সামাজিক তথ্যের টুকিটাকি (২)

বাঙ্গলীর সাথ "ওগরা" বহু প্রাচীন

শ্রীষতীন্দ্রমোহন দত্ত

ইতিহাসের নব পর্য্যায়ের ৪র্থ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যায় (পৌষ চৈত্র ১৩৭৬) "সামাজিক তথ্যের টুকিটাকি" প্রবন্ধে বাঙ্গালী খৃষ্টিয় ১৫শ বা ১৬শ শতাব্দীতে কি কি খাইত তাহার কিছু বিবরণ দিয়াছি। চর্য্যাপদ রচিত হইছিল ১০ম-১১শ শতাব্দীতে। একটী চর্য্যাপদে আছে—

ওগ্‌গরা ভত্তা রন্ধয়ে পত্তা
খাইক দিত্তা দুহু সজুত্তা
মৌইলি মচ্ছা লালিত গচ্ছা
দিব্বই কান্ত যা পুনবস্তা ॥

কলাপাতে গরম গরম ওগ্‌রা (খিচুড়ির মতন ডালে চালে তৈয়ারী) তাহাতে গাওয়া ঘী, মৌরলা মাছ, লালিতা শাক স্ত্রী যদি রাঁধিয়া দেয় পুণ্যবন্ত স্বামী তাহা খায়।

ওগ্‌রা খাওয়া আমাদের বাংলাদেশে, হাজার বছর ধরিয়া চলিত আছে। কবির বাড়ি খুব সম্ভবতঃ রাঢ় দেশে ; কারণ রাঢ় দেশে মৌরলা মাছ যেরূপ সহজপ্রাপ্য ও "রেড়ো" বাঙ্গালী যেরূপ আগ্রহের সহিত খায়েন এইরূপ অন্য অঞ্চলের বাঙ্গালীরা খায়েন না। লালিতা শাক পাট চাষের কৃপায় এখন বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই সহজ লভ্য। কিন্তু পূর্বে, ৮০।৯০ বৎসর পূর্বেও এইরূপ সহজলভ্য ছিল না – আর পিতামহ মাতমহর মুখে শুনিয়াছি যে সব পাট গাছ থেকে লালিতা হয় না। পূর্বে লালিতা শাক শুকাইয়া ঘরে তুলিয়া রাখা হইত। রাঢ় অঞ্চলে লালিতা খাওয়ার প্রচলন বেশী ছিল।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান সীমিত। অন্যান্য পাঠকগণ যদি এইরূপ বাঙ্গালীর খাদ্যবস্তুর উল্লেখ বাংলা সাহিত্যে পায়েন তাহা হইলে সেইটী চয়ন

করিয়া কোথায় পাইয়াছেন ও পুথিটি কোন সময়ের হইবে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব যদি ইতিহাসের পাতায় প্রকাশ করেন তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে আমাদের খাদ্যবস্তুর বিবর্ত্তনের একটি সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

(গত সংখ্যায় প্রকাশিত "সামাজিক তথ্যের টুকিটাকি" প্রবন্ধের ভ্রম সংশোধন)

		উপর হইতে	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৩ পৃঃ	লাইন	৭ ও ৮	"গঙ্গাজল"	গঙ্গাফল
১৮৫ পৃঃ	,,	২	পাহে	গাহে
ঐ		২৫	জাতিগণ	জ্ঞাতিগণ
			তাহা আমরা	তাহা হইতে আমরা
		১৯	জাতিগণে	জ্ঞাতিগণে

ইতিহাস কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে (১৯৭০) সাধারণ সভাপতির ভাষণ

নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

কুড়ি বছর আগে আমি কটকে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আধুনিক শাখার সভাপতিত্ব করেছিলাম। সে সময়ে আমি ইতিহাস কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলাম। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে আমি বাৎসরিক বৈঠকেও যোগ দিতে পারিনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস অধ্যাপনা এবং গবেষণা পরিচালনার সর্বপ্রকার সক্রিয় কাজ থেকেও আমি অবসর গ্রহণ করেছি। অবসরের অর্থ অবশ্য আলস্যযাপন না হয়ে সসম্মান স্বাচ্ছন্দ্যও হতে পারে। মনে হয় ইতিহাস কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিও এই ধারণা পোষণ করেন। আমার বয়ঃপ্রবীণতাই সম্ভবত এই সম্মান লাভের কারণ, তবু ভাবতে ইচ্ছে করে, যে এ অংশত আমার সহকর্মীদের আমার কাজ সম্পর্কে স্বীকৃতিজ্ঞাপন।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতিহাসে এম এ. উপাধি পাবার পর বেকার যুবক হিসাবে প্রথমেই আমি ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেণ্টে (বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় মহাফেজখানা—তখন কলকাতাতে ছিল) গিয়ে রণজিৎ সিং সম্পর্কিত যাবতীয় সরকারী দলিলপত্র দেখার অনুমতি চেয়েছিলাম। একথা অবশ্যই ভাববেন না যে আমি আমার ছাত্র ও শিক্ষাজীবনের প্রত্যেকটি বিষয় দরকারী মনে করে তাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আমি শুধুমাত্র নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্রমবিকাশের দৃষ্টান্ত দিতে চাই। সে সময়ে ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেণ্টে পড়াশুনোর জন্যে কোন নির্দিষ্ট ঘর ছিল না। আমাকে টাইপিষ্টদের কাছে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সেই অসুবিধাজনক পরিবেশে আমি করেন পলিটিকাল প্রোসিডিংস এবং করেন মিস্‌লেনিয়াস রেকর্ডস্ পড়লাম। সে ঘরে যে সব সহকারী নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা খুবই সহৃদয়

ছিলেন, আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন -- এবং কম কথা বলতেন। আমার এই গবেষণার কর্মপর্যায় ছ'মাস ধরে চলেছিল—যতদিন আমি বেকার ছিলাম। এভাবে প্রথমেই আমি সরকারী দলিলপত্রের সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। শুনেছি একজন বলেছেন রণজিৎ সিং সম্বন্ধে আমার বই অপ্রাথমিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে লেখা। সে ছ'মাসে আমি ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেণ্টে এমন কাউকে দেখিনি যিনি গবেষণা সংক্রান্ত ব্যাপারে সেখানে পড়তে এসেছেন। কিন্তু গত তিনদশক ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ইতিহাসের ছাত্রদের মধ্যে—দলিলপত্র সম্পর্কে সচেতনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেদিনের যে নিঃসঙ্গ যুবক, গবেষণার মধ্যে বেকারত্ব থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছিল (আজ সে এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ) এতে খুসী না হয়ে পারছে না। জাতীয় মহাফেজখানায় এখন সব সময়েই গবেষকদের ভীড় দেখা যায়। যে সমস্ত অধ্যাপক, গবেষণা পরিচালক এবং নথিপত্রের দপ্তরের কর্মকর্তারা এই দলিল সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু এইই কি যথেষ্ট ? এদেশে ভালো শিক্ষকতার কাজ পেতে হলে পি. এইচ. ডি ছাপ থাকা প্রয়োজন। নথিপত্রের ভিত্তিতে রচিত অনেক গ্রন্থ প্রকাশের মূলে রয়েছে এই উপাধি প্রাপ্তির ব্যগ্রতা। সেগুলোর বেশীর ভাগই কাষ্ঠবৎ নীরস, কয়েকটি তো ঢালাই করা করাতের গুঁড়ো। আগের যুগের সরকারী দলিলপত্র দেখে যে আনন্দ পাওয়া যায়. শেষের দিকের দলিল পত্রে ভয়াবহ যান্ত্রিক নিয়মরীতির প্রতিফলনে সে আনন্দ আর পাওয়া যায় না। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে দলিলের সংক্ষিপ্তসার কখনোই চিত্তাকর্ষক ইতিহাস হতে পারে না। আমাদের একটি প্রধান অন্তরায় হ'ল ইংরাজী ভাষার যথাযোগ্য জ্ঞানের অভাব। এই ভাষায় আমরা অনেকেই চিত্তাকর্ষক ও প্রাঞ্জল ভাবে লিখতে পারি না। কিন্তু স্বচ্ছ চিন্তার দৈন্য ও বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনার অভাবকে তো এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। মূলেই কোথাও গলদ রয়ে গিয়েছে। গবেষণার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে এরকম বহু লেখক বোধ হয় ডক্টর হয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। মার্ক ব্লখ বলেছিলেন "বিধিমাফিক লিখিত দলিল পত্রাদি ও প্রতিষ্ঠান সমুদয়ের

পশ্চাতে মানুষের অস্তিত্ব, আর এই মানুষকে জানাই হ'ল ইতিহাসের অন্বেষণ প্রচেষ্টা।" আমাদের বেশীর ভাগ গবেষকই ইতিহাস লেখেন না। সরকারী দলিলের আড়ষ্টতা যেন এঁদের লেখার মধ্যেও সংক্রামিত হয়। এটা কেটে যাবে যদি আমরা জ্ঞানের নতুন উৎসের সন্ধান করি। সরকারী দলিলের ভিত্তিতে লেখা এই রচনাগুলির দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতই ব্রিটিশ। আমাদের আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চায় এই ব্রিটিশ প্রভাবের স্বরূপ ব্লটিং কাগজের ওপর তেলের মত। সরকারী নথিপত্রের অতিরিক্ত প্রাচুর্যের দরুণ বেসরকারী উপাদানগুলি যথাযোগ্য প্রাধান্য পায়নি। তাই আমরা ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাধারা ও সাহিত্যের উল্লেখ না করেও তাদের সম্বন্ধে লিখতে কুণ্ঠিত হই না। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ইস্তাহার, পুস্তিকা, পুরনো খবরের কাগজ, জীবনী এবং চিঠিপত্র সরকারী দলিলের মত অপর্যাপ্ত পরিমাণে হয়তো পাওয়া যায় না; কিন্তু তারা অনেক অন্ধকার কোণকে উজ্জ্বল করে তোলে, কিছুটা তাজা হাওয়া নিয়ে আসে। আমাদের আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস রচনার শোচনীয় অস্পষ্টতা দূর করাতে এই সজীবতার ভূমিকা খুব বেশী।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক ইতিহাস সমীক্ষার পালা শেষ হয়েছে। এতদিন আমরা সাবেকী ইংরেজী চালে শুধু রাজনৈতিক, সামরিক, শাসন ও রাষ্ট্র তান্ত্রিক ইতিহাসের নানা ঘটনার খুঁটিনাটির গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের নানাবিধ জটিলতা ও বৈচিত্রসমন্বিত ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুধাবন করা প্রয়োজন। ইতিহাসের এই সমস্ত শাখায় আমাদের পারদর্শী হতে হবে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক নীতি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে বোধ হয় সরকারী দলিল পত্র অপর্যাপ্ত নয়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনাতে সরকারী দলিলপত্রাদির একটা গৌণ কিন্তু প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী উপাদানের উপর ভিত্তি করে লেখা একটি গবেষণা গ্রন্থ পরীক্ষা কালে আমি লক্ষ্য করি যে অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী ধারণাভিত্তিক বর্ণনার সমাবেশ রচয়িতার

অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হয়েছে। গবেষণার জন্য সরকারী সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন সর্বদাই আছে। দেখা গেছে যে ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের ইউরোপের ইতিহাস রচনার জন্যে এই দু বছরে প্রকাশিত সব পত্রপত্রিকার চাইতে কয়েকটি গোপন পত্র এবং গোপন সামরিক প্রতিবেদনের মূল্য বেশী। কেউ কেউ এই তর্ক তুলতে পারেন যে সরকারী নথিপত্র শুধুমাত্র কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে আমার নিজের পড়াশোনা থেকে আমি আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত দিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচনের একটি গোপন নির্দেশনামা সিমলা রেকর্ড ১.১৯০৪, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হোম ডিপার্টমেণ্ট এডুকেশন এ নিম্নলিখিত নির্দেশটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল—"বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিরোধীপক্ষ দ্বারা নতুন সিনেট গঠন সংক্রান্ত আমাদের কার্যাবলী প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হতে পারে। সরকারী ও বিভাগীয় স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবর্গকে অসম প্রাধান্য দেবার প্রচেষ্টা প্রকট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য আমাদের মতামতের স্বপক্ষে কার্যকর সংখ্যা গরিষ্ঠতা রাখতেই হবে"। এরপর বিশদভাবে দেখানো হয়েছে যে কি ভাবে সরকারী স্বার্থে এই সক্রিয় সংখ্যাধিক্যের ব্যবস্থা করা যায়। সরকারী দলিলপত্রের সাহায্যেই যা ছিল একটি অস্পষ্ট অভিযোগ তাকে একটি বিশদ পরিকল্পনা হিসেবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়।

বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের গুরুত্বের উপর যথাযোগ্য জোর দেওয়া উচিত। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে ইতিহাসের ধারাকে সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের সমগ্র আকস্মিক ঘটনা ও ভুল বোঝাবুঝি (যা সেই ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে) বিশদভাবে বর্ণনা করা উচিত। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি অনুসন্ধানই যথেষ্ট নয়। এখন আমাদের গবেষণার ফল সহজভাবে সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করবার সময় এসেছে। ইতিহাসের আবেদন সাধারণ মানুষের কাছেও থাকা উচিত। আমরা অর্থনীতিবিদদের মতো পুরোপুরি গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারি না। আমরা একই মানববিদ্যার স্রোতস্বিনীতে সাঁতার কাটছি এর থেকে অর্থনীতিক বা সামাজিক

ঐতিহাসিকেরা বাদ যেতে পারে না। যথার্থ গবেষণাকে কখনোই জ্ঞানের অপব্যয়ে পর্যবসিত হতে দেওয়া উচিত নয়। সাধারণ পাঠকের কাছে দীর্ঘ গবেষণার ফল পৌঁছতে ৩০।৩৫ বৎসর লাগে। কিন্তু আমাদের সব সময়েই ইংরেজী ভাষায় লিখতে হবে কেন? আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত এক ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থ সম্পর্কে একজন ইংরেজ মন্তব্য করেছিলেন "আমরা এই দেশ জয় করলাম এবং আমাদের বক্তব্য বিশ্বের সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম। যাদের আমরা পরাভূত করলাম তারা মূক অথবা মৌন। আমরা গোলাপী আভায় আমাদের শৌর্য, নৈপুণ্য, কর্মক্ষমতা, ক্ষমাশীলতা, সততা এবং অন্য অনেক গুণ যা আমাদের স্বজাতীয়দের জন্য দাবী করি তার চিত্র আঁকি। ক্বচিৎ কখনো বিজিত পক্ষের বক্তব্য শোনা যায় এবং যদি বা একটু ক্ষীণ স্বর শোনা যায় সেটাও একটি অচেনা ভাষায়।" অসঙ্গত অলঙ্কারের মাধ্যমে ভারতীয় ইতিহাসকে ইংরেজী ভাষী পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছিল। গবেষণকর্ম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দুই অর্থেই সুপরিবেশিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনকে অবশ্য আমি অস্বীকার করছি না।

ঐতিহাসিকদের একটি মৌল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৪১ সালে গান্ধীজী লিখেছিলেন "খান আবদুল গফফর খান তাঁর অহিংসনীতিতে বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন কোরাণ থেকে; লণ্ডনের বিশপ হিংসায় বিশ্বাস করতে শিখেছেন বাইবেল থেকে। আমি অহিংসায় বিশ্বাস অর্জন করেছি গীতা থেকে যদিও অনেকে তার মধ্যে থেকেই হিংসার পাঠ নেন।" ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজের শেষ কয়েক বছরের কিছু সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমরা একাধিক দৃষ্টিকোণ লক্ষ্য করি—ব্রিটিশ দৃষ্টিকোণ, কংগ্রেসী দৃষ্টিকোণ জিন্না দৃষ্টিকোণ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে মূল্যায়িত ইতিহাসের এই অর্থভেদের উদাহরণ আমি আগের দিনের এক অধ্যায় থেকে দেখাব।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিচারকালে বার্ক তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন "এই "জেন্টু" বেনিয়ান ইহুদীদের চেয়েও এককাঠি বেশী নীচ, অর্থগৃধ্নু, জুলুমবাজ আর টাকা বিষয়ে সেয়ানা। লণ্ডনের হীনতম কোন অংশেও এমন কোন ইহুদী নেই যে এই "জেন্টু" দালালের চেয়েও সেয়ানা, কিংবা

কুশীদপারঙ্গম, কিংবা যে মূলধনকে এত দ্রুত মুনাফায় পরিণত করতে পারে।" কিন্তু আদালতের নীরস দলিলপত্রের মধ্যে দিয়ে কাশী অথবা বৃন্দাবনবাসী এক অবসরপ্রাপ্ত বেনিয়ানের হুবহু ছবি ফুটে ওঠে। তিনি তাঁর পারিবারিক বিগ্রহ এবং উত্তরাধিকারীদের কল্যাণার্থে সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি ত্যাগ করেছেন। উত্তর ভারতের কঠিন শীত থেকে তাঁর অনাবৃত শরীরকে রক্ষা করার জন্য একটি মাত্র—কৌপীন ও নামাবলী সম্বল করে তিনি মন্দির থেকে মন্দিরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর চোখে দেশবাসীদের প্রতি দরদ এবং সকল জীবের প্রতি প্রেমের আলো পরিস্ফুট। অপরূপ এই জীবন সন্ধ্যার কোমল বর্ণনার সঙ্গে বার্কের অতিরিক্ত রং চড়ানো আলেখ্যর তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে কী কারণে হিন্দুধর্ম বাংলাদেশে পুঁজিবাদের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মানুষের আচরণের ভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বক্ষেত্রে এক নয়। সেগুলি ঐতিহাসিক কারণে পরিবর্তনীয়। মানুষের আচরণের বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। ইতিহাসের দাবী তাই এত বিপুল যে আমরা কখনো তা পুরোপুরি মেটাতে পারি না। ইতিহাস কখনো বরাবরের মত লেখা হয়ে যায় না। স্টাব্‌স্ এর মতে তা নব নব মূল্যায়নের ও উন্মোচনের উচ্চ আদালত। সুশৃঙ্খল ইতিহাসের জন্মকাল সেই থুকিডিডিসের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস যুগপৎ তথ্যবিজ্ঞান এবং শিল্পকলারূপে সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে চলেছে। ভ্রমণ এবং কথোপকথনের মাধ্যমে উপকরণ সংগ্রহ করতে থুকিডিডিস এবং হেরোডোটাসকে অনেক শ্রমস্বীকার করতে হয়েছিল। সে যুগে খুব বেশী দলিল পাওয়া যেতনা কিন্তু তাঁদের রচনা অদ্যাবধি ক্লাসিক সাহিত্যরূপেই বেঁচে আছে।

এই পরিবর্তনশীল জগতে ইতিহাসের রূপান্তরিত অবস্থাটা কি ধরণের? ভলটেয়ার লিখেছিলেন—"মনে হয় চোদ্দশ বছর ধরে গলদেশে রাজা, মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছাড়া আর কেউ ছিল না।" ভারতের ইতিহাসেও এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্টই ছিল। প্রধানত "বেলভেডিয়ার সম্বন্ধে বাচালতা, লেডী চেম্বারস্ এর সৌন্দর্য, দ্বিতীয় মিসেস হেস্টিংসের লাবণ্য, কলকাতাবাসী কোন মেমসাহেবের দুর্দশা" ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ আমলের সামাজিক

ইতিহাস রচিত হ'ত। এমন কি ব্যবসায়ের ইতিহাসেও - যেমন মিঃ জি টাইসনের হাণ্ড্রেড ইয়ারস্ অফ্ ব্যাঙ্কিং ইন এশিয়া অ্যাণ্ড আফ্রিকা তে লেখক কলকাতার এই বর্ণনা দিয়েছেন। "তার অধিবাসীদের মধ্যে একদিকে ওয়ারেণ হেস্টিংস অন্যদিকে কার্জন, তাছাড়া চিত্রকর জোহান জোফানী, ঐতিহাসিক টমাস ব্যাবিংটন মেকলে, রোজ এলমার এবং ভাবী প্রিন্সেস তালেঁরা।" এখন আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়ের বিপুল পরিধি ও ঘটনার বৈচিত্র সম্পর্কে যথেষ্টে সচেতন। জাতীয়তাবাদ থেকে নয়, প্রসারমান ইতিহাসের দিগন্ত থেকে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী আমরা পেয়েছি যা অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত। ইতিহাসের নব নব প্রেক্ষাপট আজ আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। ইতিহাসের চাকায় লেনিন এক নতুন গতিবেগ সঞ্চার করে দিয়েছেন। কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্য, সুদৃঢ় বিশ্লেষণ নৈপুণ্য এবং সুদক্ষ রচনার স্থান এখনো সর্বাগ্রে।

হয়তো এখানে ইতিহাস এবং সমগোত্রীয় সমাজ বিজ্ঞানের (বিশেষত অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস) তুলনামূলক আলোচনা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার মনে হয় কম্পুটার এবং যান্ত্রিক সাহায্য ঐতিহাসিক গবেষণার কোন কোন শাখায় যাথার্থ্য লাভে সাহায্য করলেও তা কখনোই ইতিহাসচর্চায় বস্তুনিষ্ঠতা এনে দিতে পারেনা। অর্থনীতির ঐতিহাসিকদের অর্থনীতির পরিভাষা ও সংজ্ঞাগুলি খুব ভাল ভাবে জানা উচিৎ কিন্তু ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তা যেন আলঙ্কারিক শব্দোচ্ছ্বাস আমদানী না করে। অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যানের চেয়ে সাধারণ জ্ঞান সম্ভবত শ্রেয়। শোনা যায় লয়েড জর্জ পরিসংখ্যানকে বিশেষণের মত ব্যবহার করতেন। আমার অর্থ-নীতিজ্ঞ বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে দেখেছি—তাঁরা অনেক উপাদান সম্বন্ধে এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করেন যার কোন উত্তর তার থেকে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকেই শব্দাবলী সংগ্রহ করা উচিত। টনি তাঁর "বিজনেস্ অ্যাণ্ড পলিটিকস্ আণ্ডার জেমস দ্য ফষ্ট" এ লিখেছেন "বণিক সম্প্রদায় ও অর্থসচিবেরা তাঁদের কাজ করেন একটা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জাতীয় প্রতিষ্ঠান, জাতীয় শাসনতন্ত্র, রাজনৈতিক ধারণা আশা ও বিশ্বাসের কাঠামোর মধ্যে। এই সব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে

তাদের কার্যকলাপ ঠিক বুঝতে পারা যায় না।" অর্থনৈতিক তথ্যগুলির মর্মার্থ বিচ্ছিন্নভাবে অনুধাবন করা যায় না। এই কারণেই বৈদেশিক বাণিজ্যের অঙ্ককে অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখবার উপায় না থাকলে তা নিরর্থক হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক উপকরণ ব্যতিরেকেও বিভিন্ন ঘটনা সমাবেশ আলোচনার অন্তর্গত করতে হবে। বাংলা দেশে মূলধন সঞ্চয়ের পথে বিঘ্ন সম্পর্কে চর্চা করবার সময়ে আমাকে দেউলিয়া আইনের বিবর্তন সম্বন্ধেও কিছু কিছু জানতে হয়েছিল। অর্থনীতির ঐতিহাসিক এবং আইনের ইতিহাসবিদদের মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন। বাল্যকালে আমরা প্রায়ই অর্থনীতির অস্থিতির কথা শুনেছি. এ যুগে আবার অর্থনৈতিক বিকাশ বিষয়ে জানছি। কিন্তু আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস গবেষকেরা উদ্যমের অভাবে শুধু অনগ্রসরতার অর্থনীতি (উপেক্ষিত কৃষক ও সংগঠক শ্রেণী) নিয়েই নিবিষ্ট রয়েছেন। ১৯৬৬ সালে ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে আমি ভারতের বাণিজ্যিক ইতিহাসের উপর একটি রচনা পাঠ করেছিলাম। সেই প্রবন্ধে বলেছিলাম যে পুরাতন ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখতে পারিনি। সুতরাং আমি কলকাতার পুরাতন সুপ্রীম কোর্টের যাবতীয় বাণিজ্যসংক্রান্ত দলিলপত্রের পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করেছি। এগুলির মধ্যে পুরনো কারবারগুলির একজিবিট আকারে প্রদর্শিত অনেক প্রামাণ্য পত্রের প্রতিলিপি ছিল। খুব সম্ভব সেগুলোর কিছু কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই তার অনেকটাই অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন। এলোমেলো কিছু পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কাগজপত্র পাওয়া যায় মাত্র। অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গীতে একে যথার্থ বাণিজ্যিক ইতিহাস বলে গণ্য না হলেও ঐতিহাসিকের কাছে এই সাক্ষ্য খুবই মূল্যবান হওয়া উচিত কেননা তাদের সব সময়েই এরকম টুকরো টুকরো অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। তবে এসব টুকরো তথ্য জোড়া দেবার আগে আমাদের সে যুগের সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে খুব ভালভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু যদি কোন কারবারের পরিসংখ্যান এবং পত্রাবলী সম্পূর্ণ এবং ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া যায় তাহলে এই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক ইতিহাস

লেখার কাজ আমরা একজন অর্থনীতিজ্ঞের হাতেই ছেড়ে দেব। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিজ্ঞ ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কেএর ইতিহাস লিখছেন—এ কথা শুনে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হয়েছি। এ ধরণের লেখা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসে ভারতের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারাটি বুঝতে সাহায্য করবে। তাই আধুনিক যুগের অর্থনীতিক ঐতিহাসিকেরা এর দ্বারা খুবই উপকৃত হবেন অনুমান করা যায়।

ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশীদের ভূমিকার কথা নতুন নয়। এ সূত্রে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ঋণ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তবে তাঁরা বিশেষভাবে ব্রিটিশ অবদানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের পরবর্তী যুগেও অন্য কিছু চিন্তা করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উদ্যানে বসে একদিন এক ইংরেজ যুবক আমাকে বলেছিলেন যে ভারতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজের বিপুল অবদানের কথা চিন্তা করে তিনি চমৎকৃত হয়েছেন। এ ধরণের গর্ববোধ করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক ইংরেজ অধ্যাপক কলকাতায় এসে এই শহরের ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। নগর ইতিহাসে পারদর্শী. একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ অধ্যাপককে আমি তাঁকে সঙ্গ দান করতে বলি। তাঁর সঙ্গে সারাদিন সহরে ঘুরে সন্ধ্যাবেলা সেই যুবকটি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে ইংরেজ অধ্যাপকটি শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের নিদর্শন এবং স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া অন্য কিছু দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এ ঘটনায় তাঁর বিস্মিত হওয়া উচিত হয়নি কেননা খুব সম্ভব এটা সাম্রাজ্যবাদের পরবর্তী যুগের উপসর্গ। কিন্তু এমন ব্রিটিশ ঐতিহাসিকও আছেন যাঁরা সম্পূর্ণ অন্য ধারণা পোষণ করেন। ওল্ড ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত ব্রিটিশ যুগের সরকারী তথ্যাদি, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি আর নথিপত্র এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে রাশীকৃত বেসরকারী কাগজপত্রগুলি ভারতের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস ইংরেজ ঐতিহাসিকদের তাদের মনোমত ভাবে লিখতে এবং গবেষণা পরিচালনা করতে সাহায্য করেছে। এই কারণে ভারতের

অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, সামাজিক রূপান্তর, বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক ইতিহাস-এর কোনটাই ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের যথোচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। সম্প্রতি মার্কিন গবেষকেরা তাঁদের বিপুল সঙ্গতি নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের দিকে মন দিয়েছেন। আমাদের জীবনের উক্ত দিকগুলি সম্বন্ধে জানতে তাঁরা ইংল্যাণ্ডের সুধীবর্গের চাইতে অনেক বেশী আগ্রহী। কিন্তু আমেরিকায় ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ব্যাপারটা এখনো খুব বেশী গুরুত্ব পায়নি। হার্ভার্ডে পূর্বএশিয়া গবেষণা কেন্দ্রের মান অত্যন্ত উচ্চ। আমেরিকাতে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসচর্চার এরকম একটি উৎকৃষ্ট মানের কেন্দ্র স্থাপিত হোক এ আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের আশঙ্কা আছে।

ভারতীয় জীবনধারা সম্পর্কে মার্কিণী জ্ঞান অনেকক্ষেত্রেই ইংরেজদের থেকেও অগভীর। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সমাজের প্রকৃত সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন। কি কারণে প্রাচীন সংস্কৃতির শিকড় অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের সমাজে অনেক বেশী দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছে তা বোঝা কোন বিদেশীর পক্ষেই কি সম্ভব ? ভারতে অনেক মিশনারীরা দীর্ঘকাল বাস করেছেন। সহর থেকে দূরে-র সব গ্রামে ভারতীয়দের বহু কাছাকাছি আসার সুযোগ তাঁদের ঘটে-ছিল। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ববোধ এত বেশী (যা ছাড়া তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়) ছিল যে তাঁরা আমাদের জীবনের অন্তঃপ্রবাহের যথার্থ ভাবগ্রহণ করতে পারেন নি। এইসব বিদেশী মিশনারীরা ভারত এবং ভারতবাসীদের নিয়ে অনেক বই লিখে গেছেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অনেকগুলি তাক জুড়ে থাকা এই বইগুলোর বহুলাংশ স্মৃতিকথা। এসব বই এবং শ্রীরামপুর লাইব্রেরীর সঙ্কলন আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ইতিহাসের যথেষ্ট প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সরবরাহ করতে পারত কিন্তু এই লেখাগুলি বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের আকর নয়। অন্য সমাজের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব না করলে তাদের সম্বন্ধে সব কিছু জানা যায় না। তাই খুব বেশী শ্রেষ্ঠত্ববোধ নিয়ে একজন ঐতিহাসিক অন্য কোন সমাজের ইতিহাস লিখতে পারবেন না। ভগিনী নিবেদিতা রচিত স্বল্পায়তন রচনাবলী ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত

মিশনারীদের রচিত বিশালায়তন সাহিত্যের চাইতে সম্ভবত অনেক বেশী মূল্যবান।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন মনে জাগে। একজন বাঙালী কি পাঞ্জাবের ইতিহাস লেখার যোগ্য? একজন তামিল কি বাংলার উপর লিখতে সাহস করতে পারেন? কোন এক প্রদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে গেলে সেই প্রদেশের ভাষা জানা একান্তই প্রয়োজনীয়। এবং যদি কেউ সত্যিই আগ্রহী হয় তবে তার পক্ষে কোন প্রাদেশিক ভাষা শেখা খুব একটা সময় সাধ্য নয়। স্বর্গত ডঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর (এভল্যুশন অফ দ্য খালসা Evolution of the Khalsa) গ্রন্থে শিখধর্ম সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞান ও ঐ ধর্মের মূলতত্ত্ব অনুধাবনে যে পারদর্শিতার পরিচয় রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। বইটি পাঞ্জাবে খুবই সমাদৃত হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকারের 'শিবাজী' এবং সুরেন্দ্রনাথ সেনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম অফ দ্য মারাঠাস মারাঠা ইতিহাস বোঝার পক্ষে চিরস্থায়ী অবদান হয়ে রয়েছে। এই ভাবে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বোঝাপড়ার পথ সুগম করতে পারি।

সর্বভারতীয় সংহতির দিকে দৃষ্টি রেখে ইতিহাসের পুনর্লিখনের কথা এখন খুবই বলা হচ্ছে। ইতিহাসের একটি বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে তাকে বারবার প্রচলিত মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। ইতিহাসকে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বর্জিত একটি বিষয় হিসাবে দেখবেন না। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা যেন প্রধানত বিভেদপ্রবণতার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। ইংল্যাণ্ডের এক রাজনীতিজ্ঞ জনৈক ব্রিটিশ জেলা কর্মচারীকে বলেছিলেন "আপনারা ছোট ব্যাপারগুলোর হদিশ রাখেন কিন্তু আমরা বড় ব্যাপার গুলো জানি।" ভারত-ইতিহাস প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত আমরা বড় ব্যাপারগুলোর দিকেই দৃষ্টি রেখেছি, ছোট ব্যাপারগুলো কিন্তু খুঁটিয়ে জানতে পারিনি। কিন্তু ছোট ব্যাপারগুলোর উপরে জোর পড়লে ভারতীয় সঙ্কট পর্যায়গুলির অতিরঞ্জিত গুরুত্ব আর থাকবে না।

ভারতে ইংরেজ বিচারাধিকরণের ক্রমবিকাশ নিয়ে ইংরেজরা খুবই গর্ববোধ করে। ফৌজদারী বিচার পদ্ধতির বিকাশের দিক দিয়ে দেখতে

গেলে ইংরেজ শাসনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু দেওয়ানী বিচারের ক্ষেত্রেও কি তা প্রযোজ্য ? প্রাচ্যদেশীয়রা স্বভাবতই মামলা প্রিয়, এই বদ্ধমূল ধারণার স্বপক্ষে প্রমাণ কি আমরা ইংরেজ রাজত্বের আগে দেখতে পাই ? ব্রিটিশ শাসনের পূর্ববর্তী বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি একজন বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু আমি যদি বলি যে মোগল আমলে দেওয়ানী মামলাগুলি গ্রামের প্রধানেরা সহজেই এবং আপোষে সমাধান করতেন তবে বোধ হয় কেউ আমার কথার প্রতিবাদ করবেন না। সে আমলের ছোটখাট মামলা মকদ্দমা সম্বন্ধেই আমার এই কথা প্রযোজ্য। গুরুতর অপরাধের শাস্তি দেবার অধিকার একমাত্র সরকারেরই ছিল। এছাড়া সালিশীর ব্যবস্থা কলহের মূল কারণ দূর করার চেষ্টা করত এবং শত্রুতা যাতে না বাড়তে পারে বা চিরস্থায়ী না হতে পারে সে চেষ্টাও করত। পুণাতে স্থায়ী পঞ্চায়েত ছিল। নানাফড়নবিশের আমলে তারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। যাবতীয় দেওয়ানী মামলা প্রথমে সালিশের কাছে পাঠান হ'ত। কিভাবে সেখানে এই পদ্ধতিকে বিধ্বস্ত করা হল তা আমরা এখন দেখাতে পারি। গ্রামপ্রধানদের পঞ্চায়েৎকে মামলার সঠিক প্রকৃতি সম্বন্ধে ফাঁকি দেওয়া সহজ ছিল না। হায়দ্রাবাদ, বরোদা প্রভৃতি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে ঋণ আদায়ের জন্য মামলার হার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম ছিল। সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে মামলার তথ্যাদি, পাওনাদারের দাবী ও দেনাদারের পাওনা শোধের ক্ষমতা নিরূপণ করা হত। অত্যধিক সুদ গ্রহণের প্রথা পুরোপুরি বন্ধ করা না গেলেও বেশ সীমাবদ্ধ ছিল। এই সব মামলার নথিপত্রের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের নিম্নলিখিত নথির তুলনা করুন—সরকার পক্ষ এবং রামকলিয়ান মণ্ডল বনাম কালুমাঝি সাঁওতাল-অপরাধ—ফরিয়াদির পিতা নফর মণ্ডলের হত্যা—বীরভূমের সেশন জজের আদালতে বিচার (১৮৫৬)। রায়ে উল্লেখ করা হয় যে "অপরাধী নিজেকে হত্যাকারী বলে স্বীকার করেছে। বিচারকালে সে বলেছে যে তার পিতা নফরের কাছে চার আনা ধার করেছিল। সে কয়েক টাকা দিয়ে পরিশোধ করার চেষ্টা করে। সে নিজে এই কর্জের দরুণ বারো টাকা দিয়েছে এবং

নফর তার কাছে আরো তিন টাকা দাবী করায় সে তাকে হত্যা করেছে" এই কয়েদীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

ব্রিটিশেরা মহীশূরের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেবার পর দেখা যায় যে পঞ্চায়েৎগুলি সেখানে তখন পর্যন্ত সাধারণভাবে কার্যকরী রয়েছে। পাঞ্জাবে দেওয়ানী বিবাদগুলির সমাধান করার জন্যে একটি সহজ অলিখিত আইন ছিল। তবে এলফিনস্টোনের মতে দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের কুশাসনের আমলেও দাক্ষিণাত্যে সাধারণ দরিদ্র মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের বিচার করতেন। রেজা খাঁ বলেছিলেন যে সাধারণত হিন্দুরা মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী আদালতে না এসে তাদের বেশীরভাগ দেওয়ানী বিবাদগুলির সমাধান নিজেরাই করতেন। গ্রাম সংসদ এবং বর্ণপঞ্চায়েতদের জায়গা নিল ইংরাজের আদালত। মামলাবাজি করার স্পৃহা ও আনুসঙ্গিকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্যদান প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে বৃটিশ দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা সমাজবন্ধনের গ্রন্থিকে বিনষ্ট করে দিল। একজন অভিজ্ঞ রাজপুরুষ এক সময়ে লিখেছিলেন "উত্তর প্রদেশে বিচার করার সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে নেপালী সাক্ষীরা কখনোই মিথ্যা বলেনা; অযোধ্যার উত্তরাঞ্চল থেকে যে সব সাক্ষীরা আসে (যেখানে আদালত প্রায় নেই বললেই চলে)। তারা খুব কম মিথ্যা বলে, কিন্তু যারা উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বা তার কাছাকাছি জায়গা থেকে আসে এরকম সাক্ষীরা প্রায় কখনোই সত্যি বলে না। হোলকারের মন্ত্রী তাঁতিয়া যোগ একজন ইংরেজ রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেছিলেন — "তোমরা কি সত্যিই আদালতে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্যকেই সমানভাবে সত্য মনে কর? আমাদের মধ্যে এমন সব উপজাতি আছে যারা কখনোই মিথ্যে বলে না, আবার এমন উপজাতিও আছে যারা মিথ্যে ছাড়া সত্যি উচ্চারণ করে না।" ১৮৭৫ সালের পুনা এবং আমেদাবাদের দাঙ্গা কমিটির বিবরণীতে দেখান হয় যে বম্বে প্রদেশের নিম্ন আদালতে যে ৪২২,০৩৫টি বিভিন্ন স্তরের দেওয়ানী মামলার বিচার হয়েছিল তার মধ্যে ২৯৫, ৫৭৪টিই ২০ টাকার অনধিক পাওনার দরুণ। পুরাতন দেওয়ানী বিচারপদ্ধতিতে সহজেই স্থানীয় পঞ্চায়েৎ এবং সালিসীর মারফৎ এসব মোকদ্দমা গুলির নিষ্পত্তি হ'ত এবং তারফলে যে সামাজিক রেষারেষিরও উপশম হ'ত, এ

বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। বলা হয়েছে যে "গ্রামে কারো পক্ষে তার নিজের বাড়ী থেকে নিজের ক্ষেতে যেতে হলে কোন না কোন প্রতিবেশীর জমির মধ্যে দিয়ে না গিয়ে উপায় নেই। এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে গ্রামবাসীরা একই কুয়ো থেকে জল নিয়ে তাদের জমি সেচ করে, একই বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, একই বাজারে যায়, একত্রে তাদের গৃহপালিত পশুদের চরাতে নিয়ে যায়, একই কুমোর, নাপিত, ধোপা, কামার এবং ছুতোর নিয়োগ করে এবং একই মুদী ও মহাজনের কাছে তাদের যেতে হয়। স্বাচ্ছন্দ্যের দিনে একই সঙ্গে তারা আনন্দ করে এবং অভাব ও দুর্ভিক্ষে সবাই মিলে কষ্ট ভোগ করে।" গ্রামীণ জীবনে সামঞ্জস্য ছিল। গ্রামে ক্ষমতা সম্পন্ন স্থানীয় সংগঠন ছিল যা সর্বসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি মীমাংসা করত এবং দেওয়ানী মামলাগুলিরও বিচার করত। জাতিগত ও ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রায় অনেক মিল দেখা যায়। কিন্তু এসব বিষয়কে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বরং শুধুমাত্র একটি ভেঙে পড়া ব্যবস্থার উপরই আলোকপাত করা হয়েছে।

নগর ইতিহাস এবং সাধারণভাবে সামাজিক ইতিহাস বাস্তবিক পক্ষে অবহেলিত হয়েছে। প্রত্যেক বড় সহরের ক্রমবিকাশের ইতিহাসই অত্যন্ত জটিল। তার সমগ্র জটিলতা বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার এমন এক ইতিহাস লেখা হবে যার মধ্যে তার দুই অংশ (ব্রিটিশ এবং ভারতীয়), বাণিজ্য সম্প্রদায়, বড় বাজার এবং সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হবে। এভাবে বম্বে, মাদ্রাজ এবং ভারতের অন্যান্য বড় শহরের ইতিহাস রচনা এবং তাদের তুলনামূলক আলোচনা হয়ত প্রকাশিত হবে। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে সাংস্কৃতিক ইতিহাস শুধুমাত্র বাংলার নবজাগরণেরই কাহিনী। কেউ কেউ সংস্কৃতির ইতিহাসের এই দিকটির উপর এত জোর দিয়েছেন যে তা অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে। ভারতের প্রত্যেক বড় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রেরই নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। তাই ভারতের অন্যান্য স্থানের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অগ্রাহ্য করে শুধু বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে বলার কোন অর্থ নেই।

নিজের কিছু কথা বলে এবার আমি উপসংহারে আসছি। আমি সব

সময়েই সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর অধ্যাপনার ঘোর বিরোধী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় আমি ছাত্রাবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি। সে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে অধ্যাপকেরা আসতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকজীবনের শেষ দিকে আমার একান্ত কামনা ছিল আধুনিক ভারতের ইতিহাসের একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করি, যার কর্মক্ষেত্র হবে সুদূর প্রসারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের ভাষায় বলা যেতে পারে যে আমি একটি উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র গড়তে চেয়েছিলাম। আমার পক্ষে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চর্চার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে খুবই ঋণী কারণ একজন শিক্ষক ন্যায্যত যা কিছু আশা করতে পারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি তার সবই পেয়েছি। কিন্তু এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীমিত অর্থসঙ্গতিতে দীর্ঘদিন ধরে ঘাটতি পড়ছে। ফলে তার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তা ব্যতীত এ জাতীয় একটা কেন্দ্র স্থাপনের ভার নেওয়া অসম্ভব। বহু সক্রিয় চেষ্টা এবং আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও আমি মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাইনি। আমি দুবার কমিশনের সভাপতির কাছে এ বিষয়ে আবেদন করেছিলাম এবং তিনি সহৃদয়ভাবে আমাকে কয়েকটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ও দুবার বিস্তারিত পরিকল্পনা কমিশনকে পাঠিয়েছে। আমি নিজেও দুবার ভিজিটিং কমিটির সামনে উপস্থিত হয়েছি। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর যখন নয়াদিল্লীতে পেট্রোলিয়াম এবং রসায়নিকের মন্ত্রী ছিলেন তখন (১২ই মার্চ, ১৯৬৫) মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি তাঁকে লেখেন 'বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার একটি কেন্দ্র আছে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এবং তার কাজের উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কেন্দ্রটির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসকে তার অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নটি এখন কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে।" ভারতীয় মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা দাখিল করতে বলা হয়। কমিশনের সাধারণ সভার বিবেচনার জন্যে একটি সীমিত পরিকল্পনা পেশ করা হয়।

কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। মনে হয় শিক্ষক ও গবেষকের যোগ্যতা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের আরো কিছু ব্যাপারে পারদর্শী হওয়া উচিত—কিংবা হয়ত মনোযোগ আকর্ষণ করার মত আমি ততটা যোগ্য বা বিখ্যাত নই। মঞ্জুরী কমিশনের এই ঔদাসীন্যের সঙ্গে রকেফেলার ফাউণ্ডেশনের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈসাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সাল অবধি কলকাতায় ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয় গবেষণার ব্যবস্থা সুরু করবার জন্যে রকেফেলার ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছিলাম। তিন বছর ধরে চারজন গবেষক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে দুজন খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশ করে এখন তাঁরা ইতিহাস বিভাগেই অধ্যাপনা করছেন। এই বিদেশী প্রতিষ্ঠান থেকে যে টাকা আমরা পেয়েছিলাম তার অপচয় হয়নি। যখন কেউ ভারতবর্ষের প্রতিভাবান ব্যক্তির দেশত্যাগের কথা বলেন তখন আমি বিস্মিত হইনা। কিন্তু ভারতের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন এমন কোন গবেষকই ভারতবর্ষ থেকে দূরে গিয়ে দীর্ঘকাল বাস করতে পারেন না। উচ্চ শিক্ষা থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে গবেষণার ব্যবস্থাপক হিসাবে আমার অসাফল্যের কথা উপলব্ধি না করে পারিনি।

অনুবাদিকা
শ্রীমতী ছন্দা দাসগুপ্ত

পুস্তক পরিচয়

David Kopf: British Orientalism and the Bengal Renaissance Dynamics of Indian Modernization, 1773-1835. Calcutta-1969.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের প্রধান প্রেরণা কি পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাত না ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার? পাশ্চাত্যসভ্যতার ভাণ্ডার থেকে নিজেদের উন্নতির পাথেয় সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই। সেই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী, একটি সাংস্কৃতিক ভাবরূপ বাঙালীর মনে গড়ে ওঠে; নতুন যুগের পথ প্রদর্শক বলে তাকেও যথেষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয়টির তাৎপর্য ও স্থায়িত্ব ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে বেশী, এই কথা মেনে নিয়ে লেখক বুঝতে চেষ্টা করেছেন এই ভাবরূপ গড়ে উঠেছে কোন উপাদানের সহায়তায়। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ তথা শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের প্রাচ্যপন্থী নীতির বিশেষ ভূমিকার স্বরূপ ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেছেন।

বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে, আর এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে প্রাচ্যতত্ত্ব অনুশীলনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার অংশটি মনোজ্ঞ ও তথ্য সমৃদ্ধ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, শিক্ষাব্যবস্থা ও পরবর্তী কর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর মনন ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ। এঁরা যে বিশ্বজনীনতা ও অন্য সভ্যতা সম্বন্ধে যে সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে পরবর্তী যুগের শাসক সম্প্রদায়ের কিছু মৌল পার্থক্য লক্ষণীয়। তবে লেখক এই পার্থক্যকে প্রধানত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সাংস্কৃতিক পটভূমিকার দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, ইংল্যাণ্ডের পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন হিসাবে নয়।

সনাতন বাঙালী হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আধুনিক বুদ্ধিজীবীতে রূপান্তরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই রূপান্তরের প্রধান পন্থা professionalization—নতুন বৃত্তির সংস্থান। সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর ফার্সী শিক্ষিত ব্রাহ্মণেতর বাঙালী হিন্দুরা এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের প্রাচীন বৃত্তি ছাড়াও গদ্যরীতিবিদ, শব্দতত্ত্ববিদ, কম্পোজিটর, মুদ্রক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিক প্রমুখ উপজীবিকার সংস্পর্শে আসেন। প্রাকৃত বাংলাভাষার প্রতি নবজাগ্রত আনুগত্য ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁদের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সাক্ষ্য দেয়। পশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিযানের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার ও যুগোপযোগী সংস্কারের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার প্রচেষ্টা এই রূপান্তরের আরেকদিক। লেখক নানাভাবে দেখিয়েছেন যে সেদিক থেকে রামরাম বসুকে রামমোহনের পূর্বসূরী বলা খুব অসঙ্গত হবে না।

বাংলার নবজাগরণে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ তথা প্রাচ্যপন্থীদের অবদান বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথমত, জোন্স্, কোলব্রুক ও উইলসন প্রমুখ প্রাচ্যতত্ত্ববিদেরা গবেষণার মাধ্যমে প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা ও পৌরাণিক সংস্কৃতির দুই "স্বর্ণযুগকে" পুনরুজ্জীবিত করে তার মধ্যে ভারতীয় সমাজের তৎকালীন অবক্ষয় রোধের পথ নির্দেশ করেছেন। রামমোহন বৈদিক সভ্যতার আদি বিশুদ্ধির মধ্যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে পরিত্রাণের উপায় দেখেছিলেন। এখানেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী স্বর্ণযুগ সন্ধানীদের অধিকাংশ পৌরাণিক হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গেই বেশী একাত্মতা অনুভব করেছেন। বাঙালীর ইতিহাস এই যুগেই তার স্বাতন্ত্র্য অর্জন সুরু করে। আধুনিক বাঙালী হিন্দুসত্তা গঠনে এঁদের অবদান তাই উল্লেখযোগ্য। তবে এই ভাবধারার পরিণতি লেখক বিদ্যাসাগরের মধ্যে কেন এবং কোথায় তা দেখেছেন বোঝা গেল না।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, তথা প্রাচ্যপন্থী শাসকেরা তাই বলে বাস্তববিমুখ, অতীতাশ্রয়ী রক্ষণশীল বা পাশ্চাত্যজ্ঞানের সহায়তায় সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। লেখক বহু তথ্যসমাবেশ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে এই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে এঁদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে

ভাবতে সাহায্য করেছেন। তখনকার বাঙালী সমাজনেতাদের সঙ্গে একলক্ষ্য হয়ে তাঁরা ভারতীয় সমাজের ক্ষয় দূর করে তাকে ভিতর থেকে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি ও সংস্কৃত কলেজ প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ এবং দুই পক্ষের আন্তরিক ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা তার প্রমাণ। অতীত স্বর্ণযুগের দ্বিধাহীন পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা নির্বিচারে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের আরোপ এর কোন দিকেই না গিয়ে এঁরা পাশ্চাত্যজ্ঞান ও ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে যে সহানুভূতির পরিচয় ছিল তা সনাতনপন্থী রাধাকান্তদেব, রামকমল সেন বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তাই তাঁরা এই প্রচেষ্টাগুলিকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে লেখক সরকারের, বিশেষত হেষ্টিংসএর কৃতিত্ব সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় এই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত সরকারী উদ্যোগ ও আনুকূল্য পুষ্ট। সরকারী সাহায্যের যথেষ্ট মূল্য ছিল। কিন্তু এই উদ্যোগকে তাই বলেই "হেস্টিংস অনুপ্রাণিত গণ নবজাগরণ" বলে অভিহিত করা যেতে পারে কি?

আর একটি কথা: হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজকে উইলসন যে পরস্পরের পরিপূরক রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে একই বাড়ীতে স্থাপন থেকেই প্রমাণিত হয় না। একই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু "হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্তে" বলছেন "'হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা বাবু শ্রেণীর লোক ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা পণ্ডিত শ্রেণীর লোক, এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর স্বভাবতঃ বিদ্বেষ ভাব থাকা নিবন্ধন সর্বদা বিবাদের আশঙ্কা করিয়া তিনি প্রত্যেক কলেজের চতুর্দিকে শক্ত করিয়া রেল দিয়াছিলেন।"

এই কর্মব্যস্ত সৃষ্টিশীল অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবন ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার মধ্যে আধুনিক বাঙালী মননজীবীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমত, রামমোহন বনাম রাধাকান্ত দেব—সংস্কারক বনাম রক্ষণশীল, এই সরলীকৃত ছকের বিরুদ্ধে অধ্যাপক সুশোভন সরকার শ্রীসালাউদ্দীন আহমেদ, শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার প্রমুখ

গবেষকদের মত লেখকও নানা প্রশ্ন তুলেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে হয়েছে রামমোহনের সময় থেকেই বাঙালী বুদ্ধিজীবী নিজের প্রকৃত সত্তার সন্ধানে ব্যস্ত ও বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তির অন্যতম লক্ষণ, বিশ্বজনীনতা ও জাতীয়তাবোধের দ্বন্দ্ব মেটাতে এঁদের অক্ষমতা—এই দ্বন্দ্ব কালে ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান দুর্বলতা রূপে দেখা দেবে। নিজের স্বরূপ বা সত্তা সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা আরো প্রকট হয় পরবর্তীযুগে প্রাচ্যপন্থীদের সমন্বয় প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে পুরোপুরি পাশ্চাত্যধর্মী সমাধান খোঁজার দরুণ—যার প্রবর্তক ডিরোজিও, বেন্টিঙ্ক ও মেকলে, ও যার প্রথম সৃষ্টি নব্যবঙ্গ। কিন্তু তথাকথিত প্রাচ্যপন্থী পাশ্চাত্যপন্থী সংঘর্ষের প্রচলিত সাদাকালো নক্সার পিছনে যে জটিলতা ছিল, লেখক তাকে উপেক্ষা করেননি। দুপক্ষই সংস্কার চেয়েছেন, দুপক্ষই ভারতীয়দের আত্মোন্নতি সাধনের ক্ষমতায় বিশ্বাসী, এবং সেখানে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত। প্রাচ্যপন্থীরাও অন্য দলেরই মত—বর্তমান অবস্থা নিয়ে অখুসী এবং এই অর্থে বিপ্লবী। কিন্তু পাশ্চাত্যপন্থীরা সংস্কারের পথ দেখেছেন ভবিষ্যতের মধ্যে। তাঁদের প্রধান লক্ষণ হল ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা, অবজ্ঞা এবং উন্নতি ও পাশ্চাত্যব্যবস্থার সমীকরণ। এই অনমনীয় বিধানের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন মূল্যবোধ সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংশয় এই প্রথম অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিল। প্রাচ্যপন্থীরা যে সমাধানের ইঙ্গিত দেন, তাকে অগ্রাহ্য করে নব্যবঙ্গ নিজের পায়ের তলার মাটি হারাল। আর সাংস্কৃতিক অপকর্ষতার অভিযোগের উত্তরে বাকীরা নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়লেন। তার সংস্কার, তার দুষ্ট অংশের পরিবর্জনকে ভুলে তার সাফাই গাওয়া প্রধান হয়ে দাঁড়াল। ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন, তা দুপক্ষের প্রথম সংঘাতের প্রতিচ্ছবি। এই প্রসঙ্গে, ডিরোজিও নব্যবঙ্গকে প্রধানত দীক্ষা দেন পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে এবং তাও পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার কিছু বাহ্য রীতিনীতি অনুকরণের মাধ্যমে, লেখকের এ বিশ্লেষণ ডিরোজিওর প্রতি সুবিচার করে না। নিজের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করবার মধ্যে নব্যবঙ্গের স্বীয় সমাজের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ছিল।

প্রাচ্যপন্থীদের ভূমিকার স্বল্পজ্ঞাত দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করে লেখক আমাদের প্রচলিত ধারণা বদলাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কিন্তু

অতীতের পরিশীলিত ও নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংস্কার সাধনের সম্ভাবনা কতদূর ? হিন্দু কলেজের নামকরা ছাত্র, ইংরিজী ভাষায় প্রথম বাঙালী কবি কাশী প্রসাদ ঘোষ, যাঁর মিশের ইতিহাসের সমালোচনাকে লেখক প্রাচ্য পন্থীদের সার্থক শিক্ষার উদাহরণ হিসাবে দাখিল করেছেন, তিনিই পরবর্তী যুগে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে সমসাময়িক উদারপন্থীদের বিক্ষোভ ও নিন্দার পাত্র হ'ন। আধুনিকতার প্রতি প্রাচ্যপন্থীদের বিরাগ ছিল না মেনে নিলেও তাঁদের নির্ধারিত পন্থা বোধ হয় অতীতাশ্রয়ী সংরক্ষণশীলতাকেই বেশী পুষ্ট করেছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের প্রধান অবদান বৈদিক ও হিন্দুস্বর্ণযুগের পুনরুজ্জীবনকে লেখক বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক সত্তার উপাদান হিসাবে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। এরই দরুণ আমাদের আত্মপ্রত্যয় লাভ, সর্বভারতীয় একাত্মতা অনুভব করা ও তার থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অঙ্কুরোদ্গম। এই কৃতিত্বের প্রতি লেখকের পক্ষপাত বা সহানুভূতি স্পষ্ট, কিন্তু "হিন্দু ভারত" তথা "হিন্দু জাতীয়তাবাদে"র মর্মান্তিক পরিণতি সম্বন্ধে তিনি নীরব।

পরিশেষে, নবজাগরণের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনার অধ্যায়টি উল্লেখযোগ্য। অ-ইউরোপীয় দেশগুলিতে নবজাগরণের পাশ্চাত্য সংজ্ঞা প্রয়োগের অসার্থকতা প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে লেখক এই দেশগুলির পক্ষে প্রযোজ্য সংজ্ঞা নির্ধারণের পথ খুঁজেছেন এবং বাংলার নবজাগরণকে তার গণ্ডীর মধ্যে না রেখে বৃহত্তর পটভূমিকায় বোঝবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতীতের স্বর্ণযুগের সন্ধান ও পুনরুদ্ধার তাঁর মতে অ-ইউরোপীয় দেশগুলির নবজাগরণের একটি প্রধান অঙ্গ। অতএব বাংলার নবজাগরণ তাঁর মতে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে চেতনার পুনরুজ্জীবক "অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্বজনীনতা ও ভারতবর্ষের উপযোগী শাসক শ্রেণী গড়ে তোলার বাস্তবনীতি চালিত ব্রিটিশ নীতির সন্তান"। এই নবজাগরণের সাংস্কৃতিক স্বরূপকে এতখানি সীমিত ও তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা থেকে এতখানি বিশ্লিষ্ট করে দেখা কি সম্ভব ?

ইন্দ্রাণী রায়

"পত্র পত্রিকায় ইতিহাস"

দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাজনীতি

অমিত মুখোপাধ্যায়

[অন্টারিও-র ম্যাকমাষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক জেরী সিলভারম্যান রচিত এবং "কারেন্ট হিষ্ট্রি" (নিউইয়র্ক)-তে প্রকাশিত বর্তমান প্রবন্ধটি ভিয়েতনাম সমস্যা উপলব্ধির সহায়ক হতে পারে। প্রবন্ধটি ইন্দোচীনে বর্তমান ঘটনাবলী সূত্রপাতের পূর্বে রচিত।]

"যতই পরিবর্তন ঘটবে, অবস্থা ততই পূর্ববৎ থাকবে"—এই ফরাসী প্রবাদটির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে। ১৯৫৪ সালে অনেকে ভেবেছিলেন যে ফরাসী ও ভিয়েতনামীদের মধ্যে জেনিভায় যে চুক্তি সম্পাদিত হল তার দ্বারা ইন্দোচীন যুদ্ধের সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু আজ, এই যুদ্ধের (যাকে অনেকে এখন দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধ বলেন) আকৃতি মূল বিরোধকে ছাপিয়ে প্রচণ্ডভাবে বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৬৩ সালে কোন কোন পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করতেন যে দুর্নীতিপরায়ণ দিয়েম সরকার অপসারিত হলে, কম্যুনিস্টদের বিকল্প হিসাবে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার জনগণের হৃদয়-মন জয় করবে এবং অচিরেই সেখানে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। দিয়েম-সরকার অপসারিত হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ থামেনি। ১৯৬৫ সালে কম্যুনিষ্টরা যখন আপাত সাফল্যের দ্বারে উপনীত তখন কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ধিত সামরিক সরবরাহ "জাতীয় মুক্তি বাহিনী"কে ধ্বংস করবে। যদিও মার্কিন সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবু যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। ১৯৬৮ সালে জাতীয় মুক্তিবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রাম ও সহরগুলির বিরুদ্ধে এক সাধারণ আক্রমণাত্মক অভিযান (টেট অভিযান নামে খ্যাত) চালালে অনেকে ভেবেছিলেন যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু দারুণ রাজনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করতে হলেও দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার টিকে গিয়েছিল এবং যুদ্ধও

থেমে থাকেনি। ১৯৬৯ সালে অনেকেই আশা করেছিলেন যে উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণ বন্ধের ফলে এবং সংঘর্ষে লিপ্ত সমস্তপক্ষের মধ্যে প্যারিসে শান্তি আলোচনা সুরু হওয়ায় ভিয়েতনামে যুদ্ধ-বিরতি ঘটবে। কিন্তু যুদ্ধ এখনো চলেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল দক্ষিণ ভিয়েতনামের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা এবং তাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য অব্যবহিত ভবিষ্যতে কি হতে পারে তা অনুমান করা।

১৯৬৯ সালের সূর্যোদয় হয়েছিল বহু প্রতিক্ষিত প্যারিস শান্তি আলোচনার জন্য বসবার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এক বিরোধের মাধ্যমে। আপাত দৃষ্টিতে কৌতুকপূর্ণ মনে হলেও এই বিরোধ এই কথাই প্রমাণিত করে যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার এবং তার মার্কিন মিত্রদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। বাস্তুত এই বিরোধ ছিল একদিকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, অন্যদিকে উত্তর ভিয়েতনাম (হ্যানয়) ও জাতীয় মুক্তি বাহিনীর মধ্যে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে এই বিরোধের ঠিক আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের মধ্যে এক প্রকাশ্য বিতর্ক হয় যখন দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার প্যারিস শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল।

সুতরাং, বসবার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিরোধকে গভীরতর সমস্যার সম্প্রসারণ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। আসল কথা, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পক্ষে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা অপরিহার্য হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তা অপরিহার্য নয়, তবে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এই পার্থক্যের মৌলিক চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালের প্রাক্কালে মার্কিন সরকার এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের মতভেদের মধ্যে।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসের পরিস্থিতি সাধারণভাবে চারটি জিজ্ঞাসার অবতারণা করে। প্রথমত, মার্কিন সরকারের মনোভাবের আপাত পরিবর্তনের কারণ কি? দ্বিতীয়ত, জাতীয় মুক্তি বাহিনী এবং হ্যানয় নতুন পরিস্থিতির সুযোগ নেবার জন্য কি করেছে? তৃতীয়ত, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য কি দেওয়া-নেওয়া করছে? চতুর্থত, অব্যবহিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা কি?

মার্কিন সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের পশ্চাতে বহু বিষয় কাজ করেছে। তাদের অধিকাংশই আমেরিকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে কার্যরত বিভিন্ন মার্কিন সংস্থার ব্যক্তিগণ কর্তৃক পূর্বে গৃহীত মার্কিন নীতিসমূহের ক্রমবর্ধমান সমালোচনার সঙ্গে যুক্ত। অবশ্য সবচেয়ে বেশী মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল জাতীয় মুক্তি বাহিনীর টেট আক্রমণাত্মক অভিযান (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮)।

টেট অভিযান সপ্রমাণ করেছিল যে যদি মার্কিন সরকার এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তাদের অনুসৃত নীতি পূর্ববৎ চালিয়ে যায় তবে মার্কিন সরকারের কাছে খরচের তুলনায় দৃষ্টিগোচর ফলাফল গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য এ থেকে প্রমাণ হয় না যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ও মার্কিন সরকারের মিলিত লক্ষ্য কিছুটা চরিতার্থ হয়নি, অথবা দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের অগ্রগতি, যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে হতে পারত, তার তুলনায় মন্থরতর হয়েছে। যাইহোক, মার্কিন দৃষ্টিকোণ থেকে এক গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে, গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যের বিনিময়ে লক্ষ্যের দৃঢ় চরিতার্থ সাধন এখন নাগালের বাইরে। সুতরাং তর্কের খাতিরে যদিও বলা যায় যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার এবং মার্কিন সরকার "জিতছিল" তথাপি টেট অভিযান একথা প্রায় সকলের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে তাদের "জয়" যথেষ্ট দ্রুত ছিল না।

তারমানে এই নয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে তার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেছিল বরং সে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের এক সমাধান গ্রহণে প্রস্তুত ছিল যদিও তাতে শেষপর্যন্ত জাতীয় মুক্তি বাহিনীর কর্তৃত্বের যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল এবং সেইজন্যই দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। মার্কিন সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রাজি ছিল যাতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারকে কিছুটা নিরাপত্তা দান করা যায়। তবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার যতটা নিরাপত্তা চেয়েছিল বা আশা করেছিল ততটা নয়। সুতরাং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার সন্দেহ করতে আরম্ভ করে যে মার্কিন সরকার এমন একটা সমাধানে রাজী হবে যাতে করে জাতীয় মুক্তি বাহিনী এক অন্তবর্তীকালীন জাতীয় (ভিয়েতনামী) কোয়ালিশন সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার স্পষ্টতই ভয় পেয়েছিল কারণ এই ব্যবস্থার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মর্যাদার হানি না

করেই ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে আসতে পারত এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ধ্বংস হতে পারত।

আপাতদৃষ্টিতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার এই আলোকেই প্যারিস শান্তি আলোচনাকে দেখেছিল। সেইজন্য তাদের প্রতিনিধি বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তুকে রাজনৈতিক ও সামরিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। তারা আরও বলেছিল যে বিরোধের রাজনৈতিক বিষয়গুলির সমাধানে তাদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই চলমান ভিয়েৎনাম বিরোধে মার্কিন সরকার কতটা অংশগ্রহণ করবে তাও আলোচনায় বিবেচ্য ছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ১৯৬৯ সালের ঘটনাবলী প্রধানত আবর্তিত হয় দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িত রাখার দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের প্রচেষ্টা এবং জাতীয় মুক্তি বাহিনীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা।

যদি উপরিউক্ত ব্যাখ্যা ঠিক হয় তবে প্যারিস শান্তি আলোচনা প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি স্বল্প মেয়াদী ফলাফলের বিচারে সুপ্রযুক্ত হয়েছিল।

মার্কিন সরকার এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের মধ্যে আপাত মতভেদের সুযোগ নিতে জাতীয় মুক্তি বাহিনী দু'টি পরিপূরক নীতি গ্রহণ করেছিল। সামরিক ক্ষেত্রে চাপ অব্যাহত রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল যে যুদ্ধ চলতে থাকলে ব্যাপক অর্থে তার মূল্য অত্যন্ত বেশী হয়ে যাবে। অবশ্য এই কথা বোঝাবার জন্য জাতীয় মুক্তিবাহিনীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে বড় রকমের সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আর প্রয়োজন ছিল না। টেট্-অভিযানে সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনামএর গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল অভিমুখে জাতীয় মুক্তি বাহিনীর হাতে হায়রানির স্পষ্ট স্মৃতি তাদের সামরিক উপস্থিতি উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট। জাতীয় মুক্তিবাহিনীর নীতির এই দিকটা ও তার আগের নীতির মধ্যে বিশেষ মৌলিক পার্থক্য নেই। অবশ্য জাতীয় মুক্তি বাহিনীর চাপ অব্যাহত থাকার ফলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে ছেড়ে চলে আসতে চাইবে এরূপ চিন্তা করার বিশেষ কারণ নেই ; ১৯৬৫ সালের ঘটনাবলী তো এই কথাই বলে। সেইজন্য জাতীয় মুক্তি বাহিনী ইঙ্গিত দিয়েছে যে এটা একটা রাজনৈতিক

সমাধান, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ কোয়ালিশন সরকার,—এ রাজি আছে। ১৯৬৯ সালের ৮ই মে জাতীয় মুক্তিবাহিনী যুদ্ধাবসানের এক দশদফা "সর্বাত্মক-সমাধান" উপস্থাপিত করে। এর পরও পাঁচ নম্বর দফায় এক কোয়ালিশন সরকারের কথা বলা হয়েছে।

জাতীয় মুক্তিবাহিনী অবশ্যই জানে যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার জাতীয় ভিত্তিতে কোন কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে রাজী নয়, বিশেষ করে যদি তার অব্যবহিত পরে বা আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতির অবসান নির্দেশ করে। এইভাবে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি বাহিনী এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে উভয় দিক থেকেই ইহা লাভবান হতে পারত। যদি দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার কোয়ালিশনে সম্মত না হয় অথচ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি তাতে রাজি থাকে, তাহলে সায়গন ওয়াশিংটনের কাছে আরো বেশী আপোষ বিরোধী বলে বিবেচিত হত। এর ফলে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ পরিত্যাগ করে চলে আসতে পারত। অন্যদিকে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার যদি শেষ পর্যন্ত কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব মেনে নিত তাহলে বিবাদ সেই সরকারের মধ্যে অব্যাহত থাকত এবং তার ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের শক্তি হ্রাস পেয়ে খুব সম্ভবত জাতীয় মুক্তি বাহিনীর কর্তৃত্ব স্থাপিত হত।

কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য জাতীয় মুক্তি বাহিনীর প্রস্তুতির প্রাথমিক প্রমাণ হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েনামের সাময়িক বিপ্লবী সরকার গঠন (৮ই জুন, ১৯৬৯)। এই সাময়িক বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েছিল এক গণ প্রতিনিধি সম্মেলনের দ্বারা যা দক্ষিণ ভিয়েতনামের কোন এক জায়গায় ৬ই, ৭ই ও ৮ই জুন বসেছিল এবং যাতে ৮৮ জন প্রতিনিধি ও ৭২ জন 'অতিথি' যোগদান করেছিল। এই সম্মেলন আহ্বানের পশ্চাতে ছিল জাতীয় মুক্তিবাহিনী, এবং ভিয়েতনামী জাতীয় গণতান্ত্রিক ও শান্তি শক্তিসমূহের মৈত্রী (যা টেট্ অভিযানের সূচনায় গঠিত হয়েছিল)। এ ছাড়াও তিনটি রাজনৈতিক দল (ভিয়েতনাম পিপলস্ রেভলুশানরি পার্টি, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ডেমোক্রাটিক পার্টি, এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম র‍্যাডিক্যাল সোসালিস্ট পার্টি) এবং ছটি গণ সংস্থা (দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তির জন্য যুব, ছাত্র, মহিলা, লেখক, শিল্পী, বার্তাজীবি, ও শিক্ষক ইউনিয়ন সমূহ, এবং শ্রমিক সংস্থা) এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। যদিও সাময়িক

বিপ্লবী সরকার, জাতীয় মুক্তি বাহিনীর এক বর্ধিতরূপ মাত্র তথাপি এর তাৎপর্য উড়িয়ে দেবার নয়। বিপ্লবী সরকার সৃষ্টির ফলে বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেগুলি কোয়ালিশন সরকারের ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগতে পারত যেমন দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের কাছে ১৯৬৭ সালের সংবিধান বিবেচিত হয়ে থাকে।

সাময়িক বিপ্লবী সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য যে একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বাবস্থা সৃষ্টি করা তা দক্ষিণ ভিয়েতনামে গণ-প্রতিনিধি সম্মেলনে গৃহীত মৌলিক প্রস্তাবের পাঁচ নম্বর ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। উত্তর ভিয়েতনাম সরকারের এক বিবৃতিতেও এই কথা প্রতিধ্বনিত হয়।

জাতীয় স্তরে সংগঠন ছাড়াও সাময়িক বিপ্লবী সরকার এবং জাতীয় মুক্তি বাহিনী দাবি করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ১২৯০টি গ্রামে, ১৪৬টি জেলায়, ৩৭টি প্রদেশে (দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের আওতায় ৪৪টি প্রদেশ আছে) এবং ৫টি নগরে বিপ্লবী গণ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাময়িক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জাতীয় মুক্তি বাহিনী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসহ এক পুরোদস্তুর সরকার হিসাবে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে সাময়িক বিপ্লবী সরকার প্রজাতান্ত্রিক দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার হিসাবে ১৩টি বিদেশী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দাবী করতে পারত।

১৯৬৯ সালের আলোচনায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পক্ষে এক মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে যে ইহা জাতীয় মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে আলোচনায় স্বীকৃত হয়েছে। এটা খুব পরিষ্কার যে মার্কিন সরকার এই রকমই আশা করেছিল। অবশ্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার বারংবার বলে এসেছে যে প্যারিস শান্তি আলোচনা হচ্ছে দুই পক্ষের আক্রমণকারী ও আত্মরক্ষাকারীর মধ্যে এক বৈঠক। সুতরাং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার জাতীয় মুক্তি বাহিনী অথবা সাময়িক বিপ্লবী সরকারকে কোনরূপ আইনগত স্বীকৃতি দান করতে অস্বীকার করে চলেছে।

অবশ্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার একাধিকবার ইঙ্গিত দিয়েছে যে জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে সে গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠকে মিলিত হতে প্রস্তুত আছে। অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার এখন আলোচনায় নরমপন্থা গ্রহণ করেছে।

এর স্পষ্ট প্রকাশ। ঘোষণা পাওয়া যায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট থিউ কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক টেলিভিসন বক্তৃতায় (১১ই জুলাই ১৯৬৯)। এই বক্তৃতায় তিনি এক ছয় দফা প্রস্তাব রাখেন যার মূল কথা হল হিংসা ত্যাগ করে জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য জাতীয় মুক্তি বাহিনীর প্রতি আহ্বান। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের ৮ই এপ্রিলের (১৯৬৯) ছয় দফা প্রস্তাবের সঙ্গে ১১ই জুলাইয়ের এই ছয় দফা প্রস্তাবের উপর-উপর তুলনা করলেও দেখা যাবে যে তার সুর কত নরম হয়েছে। নিচে প্রস্তাব দু'টি পাশাপাশি তুলে ধরা হল।

৮ই এপ্রিল, ১৯৬৯	১১ই জুলাই, ১৯৬৯
১। কম্যুনিস্টরা অবশ্যই তাদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে।	১। সমস্ত রাজনৈতিক দল অবশ্যই হিংসা পরিত্যাগ করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে।
২। কম্যুনিস্টরা অবশ্যই দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে তাদের সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করে নেবে।	২। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত নির্বাচন কমিটি অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে।
৩। কম্যুনিস্টরা লাওস ও কাম্বডিয়াকে অবশ্যই তাদের সামরিক আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করবে না।	৩। নির্বাচনের জন্য অবশ্যই আন্তর্জাতিক তদারকির ব্যবস্থা থাকবে।
৪। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার তার জাতীয় পুনর্মিলনের নীতিকে কার্যকরী করবে।	৪। নির্বাচনের সময়-সূচী ও পদ্ধতি আলোচনার দ্বারা নির্ধারিত হতে পারবে।
৫। উভয় ভিয়েতনামের পুনঃ সংযুক্ত করণ অবশ্যই স্বাধীন নির্বাচনের দ্বারা রূপায়িত হবে।	৫। নির্বাচন-উত্তরকালে কোন রূপ প্রতিশোধ গ্রহণ বা তারতম্য করা চলবে না।
৬। নতুন করে কম্যুনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্যারান্টির জন্য এক কার্যকর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।	৬। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার নির্বাচনের ফলাফল মান্য করবে।

সাময়িক বিপ্লবী সরকারের দশ-দফা "সর্বাত্মক-সমাধান" এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের ১১ই জুলাইয়ের ছয়-দফা প্রস্তাবের বাহ্য সাদৃশ্য থেকে মনে হয় উভয় পক্ষের অবস্থা একই রকম। অবশ্য উভয়ের মধ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে প্রস্তাবিত নির্বাচনের সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব। জাতীয় মুক্তি বাহিনী চায় সাময়িক বিপ্লবী সরকার অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসাবে কাজ করুক এবং তারপর এই সরকারই এক গণপ্রতিনিধি সভা কর্তৃক রচিত সংবিধানের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপায় উদ্ভাবন করবে। অপর দিকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের অনড় বক্তব্য হচ্ছে যে তার (১৯৬৭ সালের) সংবিধানে যে নির্বাচন ব্যবস্থা ও সময়সূচী আছে তার ভিত্তিতেই জাতীয় মুক্তি বাহিনী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের এরূপ দাবির ফলে এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে ; ১৯৭১ সালের পূর্বে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন হতে পারবে না (১৯৬৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী)। উপরন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের মতে এই সরকারের কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, এবং আইনসভার (সিনেট ও জাতীয় সভা) সদস্যগণ নির্বাচিত হন, আর প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর ক্যাবিনেট (অর্থাৎ আসলে সরকার বলতে যা বোঝায়) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। সুতরাং কোন কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হলে তা নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি থিউ। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত এবং তারপর তাঁর উত্তরাধিকার। তার মানে জাতীয় মুক্তি বাহিনী বা সাময়িক বিপ্লবী সরকারকে আহ্বান জানান হচ্ছে ১৯৬৯ সালের স্থানীয় গ্রাম ও পল্লী নির্বাচনে এবং ১৯৭০ সালে প্রদেশ প্রধানদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে। অবশ্য দেশব্যাপী ব্যাপক সরকারী যন্ত্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের হাতে থাকায় জাতীয় মুক্তি বাহিনী বা সাময়িক বিপ্লবী সরকার এই স্থানীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না।

বস্তুত যুদ্ধরত উভয়পক্ষের মধ্যে এখনো পার্থক্য বিস্তর। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য হল মার্কিন সরকারের কাছ থেকে সময় খরিদ করার এক আপাত প্রচেষ্টা যাতে এক ব্যাপকতর জনপ্রিয়

ভিত্তি এবং এক দক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব যন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য অর্জন করা যায়।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার সহরাঞ্চলের জনগণের মধ্যে নিজের সমর্থন ব্যাপকতর করার জন্য এক "সামাজিক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী মোর্চা" গঠন করেছে, এবং গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মন জয় করার জন্য এক গ্রাম উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার, এবং কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়িত করেছে।

জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য এক উন্মুক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবেই রাষ্ট্রপতি থিউ এই সামাজিক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী মোর্চা গঠন করেছিলেন। ৭ই এপ্রিল (১৯৬৯) জাতীয় সভার যুগ্ম অধিবেশনের নিকট বাণীতে তিনি এই কথা সবিস্তারে বলেন। এর পরই দশটি রাজনৈতিক দল ঘোষণা করে যে মে মাসে জাতীয় পর্যায় এক সভায় তারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার-পন্থী এক মৈত্রী গঠন করবে। কিন্তু বৌদ্ধ ও উদারপন্থী গোষ্ঠী যোগদান না করায় শেষ পর্যন্ত এই মৈত্রী ব্যর্থ হয়েছিল।

গ্রামাঞ্চলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে পূর্ববৎ বিপ্লবী উন্নয়ন কর্মসূচীর সম্প্রসারণ মাত্র। ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি থিউ দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের প্রধান চারটি লক্ষ্যের কথা বলেন: (১) শান্তকরণ কর্মসূচী ত্বরান্বিত করা যাতে শতকরা ১০০ ভাগ জনসাধারণকে আয়ত্বে আনা যায়; (২) গ্রাম ও পল্লী শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন; (৩) গ্রাম ও পল্লী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; এবং (৪) ভূমি সংস্কার এবং কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন বাস্তবে রূপায়িত করা। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে।

এর ফলে, জাতীয় মুক্তি বাহিনী তথা সামরিক বিপ্লবী সরকার ১৯৬৮ সালের টেট-অভিযান লব্ধ তার রাজনৈতিক (যা সামরিক থেকে স্পষ্ট পৃথক) অবস্থা অক্ষুন্ন রেখেছে; দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার উপলব্ধি করেছে আরো স্বাধীন মনোভাব গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে মার্কিন সরকারকে

দৃঢ়ভাবে বোঝান যে তার উচিত দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের প্রতি পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন অব্যাহত রাখা ; সর্বোপরি মার্কিন সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক ও অ-সামরিক ব্যক্তিদের সংখ্যা কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা হচ্ছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের মার্কিনীকরণ প্রচেষ্টা. যা ১৯৬৫ সালে সুরু হয়েছিল, বদলে যেলে তাকে ভিয়েতনামীকরণ করতে হবে।

১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব মেলভিন লেয়ার্ড বলেন—ভিয়েতনামীকরণ কর্মসূচী অব্যাহত থাকবেই। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হ্যানয় এবং জাতীয় মুক্তি বাহিনী তথা সাময়িক বিপ্লবী সরকারকে বোঝান যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে এবং যত সময় চলে যাচ্ছে তত জাতীয় মুক্তি বাহিনী তথা সাময়িক বিপ্লবী সরকার আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের মুখপাত্রগণ একাধিকবার বলেছেন যে তারা ক্রমশই যুদ্ধের বেশীর ভাগ দায়িত্ব কাঁধে নিতে প্রস্তুত। উপরাষ্ট্রপতি কাও কাই যুক্তি দেখিয়েছেন যে ১৯৬৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন সরকার তার সামরিক বাহিনীর উপর অত্যধিক মনোনিবেশ করে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হন নি। অর্থাৎ উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম থাকলে দক্ষিণ ভিয়েতনামীগণ আরো ভাল করতে পারত। যাইহোক, রাষ্ট্রপতি থিউ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার অচিরেই মার্কিন সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করতে প্রস্তুত নয়।

সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রধান সমস্যা হচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার থেকে পর্যাপ্ত হারে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া যাতে জাতীয় মুক্তি বাহিনী তথা সাময়িক বিপ্লবী সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার যাতে দ্রুত উন্নতি সাধন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপসারিত হবার পথ সুগম করে দেয়। অবশ্য সেই সঙ্গে মার্কিন অপসারণ যেন খুব দ্রুত না হয় যাতে মনে হতে পারে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার

পতনের মুখে। যদি মনে হয় দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার পতনের দ্বারে উপনীত তাহলে এক আত্ম-সফল ভবিষ্যত বাণীর সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭০ সাল সম্ভবত ১৯৬৯ সালেরই অনুরূপ একটি ছবি তুলে ধরবে। যতদিন দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার এবং জাতীয় মুক্তি বাহিনী তথা সাময়িক বিপ্লবী সরকারের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের পদ্ধতি ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে মৌলিক মতবিরোধ থাকবে, এবং যতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফা ভাবে সরে না যাবে ততদিন বোঝাপড়া অসম্ভব। এবং বোঝাপড়া না হলে, যুদ্ধ চলবে।

Calcutta Historical Society Publications

Little's House of Jagatseth
Edited with introduction by
Dr. N. K. Sinha — Rs. 15·00

Bengal Past & Present
(A Journal of Modern Indian & Asian History.)
Annual Subscription — Rs. 20·00

33/1, AMHERST STREET,
CALCUTTA —9

With best compliments from

UNIVERSAL EMPORIUM
KHAGOL-PATNA

(LEADING DEPARTMENTAL STORE)

With Compliments of

EAST INDIA RUBBER WORKS (P) LTD.

162, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA-7

DAS GUPTA & CO.

PRIVATE LIMITED

BOOKSELLERS SINCE 1886

54 3, College Street, Calcutta-12

PHONE :- 343875 & 346547

STUDENTS BOOK SUPPLY

15, COLLEGE SQUARE,

CALCUTTA-12

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত সংশোধিত সিলেবাস No. Sy II PN/21/61 dated 9.5.68 অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি আপনার মনোনয়ন প্রার্থী।

1. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ১ম ভাগ—ডঃ এন, রায় for VI
2. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ৪র্থ ভাগ—ডঃ এন, রায় for IX.X
3. ভারত কথা—অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় (for H. S. or S. F.)
4. প্রাথমিক অর্থ শাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ for IX, X or XI, (H.S)
5. প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ for IX, X (S.F)
6. বাণিজ্যিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ ও অধ্যাপক ভবেশ ভট্টাচার্য্য (H.S. Com)
7. অর্থনৈতিক ভূগোলের ভূমিকা—অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী (H.S.Com)
8. বাণিজ্যিক ভূগোলের ভূমিকা—অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী (S.F. Com.)

ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড | ভাদ্র-অগ্রহায়ণ | ২য় সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

(৩৯)

এবার ঢাকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলব। ১৯২১ সালে কলকাতা থেকে একটি চাকর ও ঠাকুর সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় যাই। চাকরকে বাজারে পাঠিয়েছিলাম সে যা মাছ নিয়ে এল তা ছ'সাত জন লোকের খাওয়ার মত। তাকে বললাম, "এত মাছ এনেছিস কেন?" সে বলল, "এই-ই তো চার আনার মাছ। আর কত কম আনব।" ক্রমে দেখলাম যে ঢাকায় সব রকম খাবার জিনিস কলকাতার তুলনায় আশ্চর্য্য সস্তা। বড় বড় রুই মাছের পেটি—সের খানেকের বেশী হবে—সাত আট আনা দাম। মাংসের সের পাঁচ আনা। ঢাকার মিঠাইএরও নাম খুব। এদের মধ্যে অমৃতি, প্রাণহরা সন্দেশ খুবই প্রসিদ্ধ। ঢাকার আর একটি প্রিয় জিনিস বাখরখানি। অনেকটা পরোটার মত; দামেও খুব সস্তা। তখন পাঁটি ঘি পাওয়া যেত। দাম যতদূর মনে পড়ে ২/৩ টাকা পাকি সের। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা অনেকটা এখন গল্পের মতো শোনাবে। আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয় কলকাতায়। কিন্তু বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে খুব বড়গোছের একটা ভোজের আয়োজন করলাম। তাতে অন্ততঃ ছ'সাতশ

জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটার সত্যপ্রসন্ন ঘোষকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে দেখলাম সেখানে আর একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। নিমন্ত্রণ পত্রখানা সত্যপ্রসন্নবাবুর হাতে দিলে তিনি পড়ে বললেন এ নিমন্ত্রণে মাছের ব্যবস্থা কিছু করেছেন নাকি। বললাম, এখনও তো আটদশ দিন বাকী আছে। কাজের দিন বাজার থেকে কেনার ব্যবস্থা করব। তিনি তখন ঐ উপস্থিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ঢাকার কাছে একটি জায়গার পুলিশের সাব-ইন্‌সপেক্টর। বললেন, জায়গাটি মাছের জন্য প্রসিদ্ধ। আপনি যদি চান আমি ওঁকে দিয়ে আপনার মাছের ব্যবস্থা করতে পারি। আমি বললাম, সে তো খুব ভাল কথা। সেই ভদ্রলোকও আনন্দের সঙ্গে রাজী হলেন। স্থির হল যে নিমন্ত্রণের আগের দিন সন্ধ্যার সময় আমি একজন লোক পাঠিয়ে দেব। সে ট্রেনে যাবে এবং রাত বারটা একটা নাগাদ মাছ নিয়ে ফিরবে। ব্যবস্থামত ঠিক সময়েই মাছ এল। দেখি কুড়ি পঁচিশটি বড় বড় রুই মাছ এবং মাথা পিছু একটি হিসাবে ৮' সাতশ চিংড়ি মাছ সদ্য পুকুর থেকে ধরে এনেছে। যাক্, প্রচুর পরিমাণে মাছ তো খাওয়া হল। কাজ মিটে গেলে দামের কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম। তিনি বললেন মাছের দাম সতের টাকা আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। শেষে শুনলাম ওখানকার রীতি হচ্ছে প্রথমে দু'তিন জন জেলেকে ঠিক করতে হয়। তারা এক একবার পাতা জাল টানলে যত মাছ উঠবে তার জন্য একটাকা করে দিতে হয়। সতের বার টানার পরে আমার প্রয়োজন মত মাছ হয়ে যায়; সুতরাং আমায় মাত্র সতের টাকা দিতে হবে। পরে এ গল্প বহুজনের কাছে করেছি। জীবনে এত সস্তা মাছ দেখি তো নাই, শুনিও নাই।

খুব ভাল চালের মণ ছিল সাত আট টাকা। সাধারণ ভাল চাল যা ভদ্রলোকমাত্রই খান তার দাম ছিল চার-পাঁচ টাকা মণ। আমি একবার বাজারে খুব ভাল মিহি চাল দেখে আট ন' টাকা মণ দরে কিনি। তাতে আমার সহযোগীরা খুব ঠাট্টা করতেন। তখন তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি একদিন ৬০।৭০ টাকা মণ দরে মোটা চাল কিনে খেতে হবে।

ঢাকায় তখন মোটর গাড়ীর চল হয়নি। ছ্যাকড়া গাড়ীতে যাতায়াত

করতে হত। আমাদের বাড়ী থেকে শহরে যেতে হলে চার আনা ভাড়াই যথেষ্ট ছিল। ঢাকার গাড়োয়ানরা সকলেই মুসলমান—এদের বলা হত কুট্টি মুসলমান। এদের নিয়ে অনেক গল্প চলিত আছে। কিছুদিন আগে দেখে-ছিলাম কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি এদের নিয়ে বেশ সরস গল্প ও কাহিনী রচনা করেছেন। দু' একটি চলিত কাহিনীর নমুনা দিচ্ছি। যাত্রীরা জিজ্ঞাসা করলেন অমুক জায়গায় যেতে কত নিবি। গাড়োয়ান বলল, বারো আনা। যাত্রী বললেন, চার আনা। এমন সময় ঘোড়াটি চিঁ হিঁ হিঁ করে উঠল। গাড়োয়ান বলল, ঐ স্থাখেন কর্তা। আপনার কথা শুনে ঘোড়াটাও হাসবার লাগছে। আর একটি কাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের খুব সম্ভবতঃ এটি সত্য। দু'জন সাহেব স্টেশন থেকে একটি ভালো ফার্স্ট ক্লাশ গাড়ী করে রমণায় এসেছে। গাড়োয়ান এক টাকা ভাড়া চেয়েছে। তারা আট আনা দিয়ে চলে গেল। গাড়োয়ান বলল, আচ্ছা রহেন কর্তারা, হটলার সাহেব (Hitler) তো আইবার লাগছে। দেখে নিমু তখন কত ভাড়া দেন।

ভাড়া ঠিক করার সময় গাড়োয়ানরা প্রায়ই বলে নিত, কর্তা, স্থাখছেন কি, এ পক্ষীরাজ ঘোড়া, একেবারে উড়াইয়া লইয়া যাইব, ইত্যাদি। এই গাড়োয়ানদের সৎ বলে খ্যাতি ছিল। আমার ধারণা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অনেক সুযোগ পেয়েও এরা হিন্দু যাত্রীদের উপর অত্যাচার করেনি।

(৪০)

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ পরিভ্রমণের কথা পূর্বেই বলেছি। বাংলাদেশের মধ্যেই দুইবার সুদীর্ঘ নৌকাযাত্রাও আমার জীবনের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ঢাকায় একরকম বড় নৌকা পাওয়া যায়—তাদের বলে গ্রীণ বোট বা হাউস বোট। এর মাঝখানে দুটি শোবার ঘর এবং বাথরুম। ভিতরে দাঁড়ালে ছাদে মাথা ঠেকে না। ছাদের উপরে বসার জায়গা। রাত্রে ত্রিপল খাটিয়ে মাঝি বা চাকররা সেখানে শুতে পারে। আমার বাড়ী ফরিদপুর জেলা শহর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে একটি ছোট গ্রামে। একবার পূজার সময় আমি সপরিবারে এই রকম একটি নৌকায় ঢাকা থেকে দেশে যাত্রা করলাম। স্থির

ছিল যে পদ্মা নদীতে গিয়ে পড়বার পর আমরা ষ্টীমারে পদ্মা পার হব। খালি নৌকা নদী পেরিয়ে ওপারে গেলে আবার তাতে উঠব। কারণ পূজার সময় ঝড়ের সম্ভাবনা থাকে, সে সময় পদ্মার মতো বিশাল নদী নৌকায় পার হতে ভরসা হল না। পদ্মায় যখন পৌঁছলাম দিন পরিষ্কার ; আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। মাঝিরা সাহস দিল। শেষ পর্য্যন্ত নৌকাতেই পদ্মা পার হলাম। প্রায় দু' ঘণ্টা লেগেছিল। কিন্তু সর্বদাই ভয়ে ভয়ে ছিলাম।

খাল বা ছোট নদী দিয়ে যাবার সময় মাঝে মাঝে জেলেদের নৌকা থেকে তাজা ইলিশ বা অন্য মাছ কেনা হত। গ্রামে নৌকা লাগিয়ে অন্য খাবার জিনিস-পত্রও কেনা হত। আমাদের সঙ্গে একটা গ্রামোফোন ছিল গ্রামে নৌকা লাগিয়ে গ্রামোফোন বাজাতে আরম্ভ করলেই অনেক লোক আসত। তখন তাদের বলে দুধ তরিতরকারি প্রভৃতি কেনার সুবিধা হত গান বন্ধ হলেই রেকর্ডখানা দেখিয়ে ওরা বলত, কর্তা, থালাখানা আর একবার ঘুরাইয়া দ্যান। শহরের হাওয়া তখনও এই সব ছোট গ্রামে পৌঁছয়নি। এরা গ্রামোফোন তখনও চোখে দেখেনি। এদের সরল গ্রাম্য স্বভাব খুবই ভাল লাগত।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের শ্যামল শোভা যে কত সুন্দর তা এবারে এই নৌকাভ্রমণে মনের মধ্যে যেমন উপলব্ধি করেছি তা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। তিন চার রাত্রি জলপথে কাটিয়েছি ; এই সব গ্রামে নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষীদেরই বাস ; কখনও কোন গোলমাল হয়নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর আর এভাবে নৌকা যাত্রার কথা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। যে চার পাঁচদিন বাড়ীতে ছিলাম তখন ঐ নৌকাতেই রাত্রে থাকতাম। আবার ঐ নৌকা করেই ঢাকায় ফিরে এলাম। মোট প্রায় ১৪।১৫ দিন নৌকাবাস হয়।

আর একবার ঢাকার নিকটবর্তী নারায়ণগঞ্জের কাছে শীতলক্ষা নদীতে নৌকা করে প্রায় ২৫।৩০ মাইল ঘুরে এসেছিলাম। নদীটি ছোট ; দু'ধারে গ্রামের পর গ্রাম। একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম মুড়াপাড়া। নৌকা থেকেই জমিদারের বাড়ী ও বাগান চোখে পড়ল। সে-যাত্রা ৭।৮ দিন বেড়িয়ে ঢাকায় ফিরে আসি।

এই রকম আর একবার জলপথে একটি মাল বোঝাই ষ্টীমারে গোয়ালন্দ থেকে কলকাতায় এসেছিলাম। ষ্টীমারে দুটি ফার্স্ট ক্লাস কেবিন ছিল ; আমরা ছাড়া আর যাত্রী কেউ ছিল না।

প্রকাণ্ড ডেকের উপর বেড়াতাম। এই পথে সুন্দরবনের কাছ দিয়ে আসতে হয়। সুন্দরবনের দৃশ্য খুবই মনোহর। সুন্দরবনে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ যে কত সস্তা তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মাত্র তিন-চার পয়সার মাছে আমাদের সকলের চলে যেত। দু'চার পয়সা বকশিস দিলে মাঝিরা আপত্তি করত—জেলেরা পাছে পরে বেশী দাম চায়। সুন্দরবনে অপরিসর খাতে নৌকা যেত। দু'পাশে নিবিড় অরণ্য; সেখানে বাঘ থাকে। তবে আমরা ছিলাম স্টীমারে; তার উপর দিনের বেলায় চলেছি। কাজেই বাঘের ভয় তেমন ছিল না। নদীপথে সুন্দরবনের এই অপরূপ শোভা আর দেখার সম্ভাবনা নেই। এই তিনটি জলপথে ভ্রমণ আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

(৪২)

আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেই ঢাকার প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রথমটি হল অভয় আশ্রম। অভয় আশ্রম সে সময়ের একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ, অম্বদা চৌধুরী ও সুরেশ বানার্জী। এঁরা সকলেই নিষ্ঠাবান গান্ধীপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে এঁদের খুব সদ্ভাব ছিল। আমরা এঁদের অনেক সময় অর্থ সাহায্য করেছি। আমার সন্দেহ ছিল এবং এখনও আছে যে এঁরা সকলেই যে অহিংসা পন্থী ছিলেন তা নয়। গভর্ণমেণ্ট বরাবরই এঁদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। সুতরাং প্রকাশ্যে এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বেশ বিপজ্জনক ছিল। মাঝে মাঝে টাকার দরকার হলে তাঁরা জ্ঞান ঘোষ কিম্বা আমাকে বলতেন। আমরা অন্যান্য শিক্ষকদের বলতাম, "ভাই, আমাদের কিছু সাহায্য করবেন; দশ বিশ টাকা যা হয়। সৎকাজেই লাগবে। তবে কাকে দেব সেকথা জিজ্ঞাসা করবেন না।" সকলেই বুঝতেন, তবে কেউ কোন কথা বলতেন না। আমাদের সঙ্গে অভয় আশ্রমের কর্তাব্যক্তিদের পরিচয় আছে একথা যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে সে বিষয়ে তাঁরা সতর্ক থাকতেন। একবার প্রায় মাঝরাতে এগারটা বারটা

আন্দাজ সুরেশবাবু আমার বাড়ীতে এসে হাজির। বললেন, "আজই কিছু টাকা বিশেষ দরকার। অনেকক্ষণ যাবৎ বাড়ীর ভিতরে আসার চেষ্টা করছি, আপনার বাড়ীতে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এতক্ষণে ঢুকতে পেরেছি।" তার চোখমুখ দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল তিনি অভুক্ত আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, খাওয়া দাওয়া কিছু হয়েছে। বললেন, "সকালে চা খেয়েছিলাম। আর কিছু খাওয়ার সময় বা সুবিধা করে উঠতে পারিনি।" তখন তাঁকে বসিয়ে তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। এইভাবে কষ্ট সহ্য করে তাঁরা এই আশ্রম চালিয়ে গেছেন।

ঢাকায় থাকার সময় আর একটি খুব চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল। সেটি হল ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা। তখনকার দিনে এ কাহিনী সকলেরই জানা ছিল। আজ বোধহয় অনেকের মনে নেই। সুতরাং এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর সামান্য বিবরণ দেওয়া দরকার মনে করি। ঢাকা থেকে দশ বার মাইল দূরে জয়দেবপুর নামে একটি রেল স্টেশন আছে। এখানকার জমিদারেরা খুব প্রসিদ্ধ। যে সময়কার কথা বলছি তখন তিনটি পুত্র রেখে জমিদার মারা গেছেন। এদের মধ্যে মধ্যমকুমার জমিদার হন। এই মধ্যমকুমার দার্জিলিংএ মারা গেছেন এই কথাই সকলে জানত। কনিষ্ঠপুত্র আগেই মারা গিয়েছিলেন; সুতরাং জমিদারী কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে চলে যায়।

এই ঘটনার ১৯১৩ বছর পরে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। দীর্ঘ গৌরবর্ণ, সুন্দর চেহারা, বেশ স্বাস্থ্যবান। দেখে সম্ভ্রান্ত বলে মনে হয়। কিন্তু মুখের কথা গ্রাম্য ধরনের। ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে এই সন্ন্যাসী কে তা নিয়ে নানারকম গুজব রটে। কিন্তু সন্ন্যাসী নিজের কোন পরিচয় দেন না। আমি তখন রমণায় একটি বাড়ীতে থাকি। এই বাড়ির সামনে বড় রাস্তা দিয়ে সন্ন্যাসী প্রত্যেকদিন একটি বড় টমটম হাঁকিয়ে যেতেন। তিনি নিজেই তেজী ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরে অবলীলায় গাড়ী চালিয়ে যেতেন। তাতে লোকের মনে সন্দেহ হয় সন্ন্যাসী হলেও আসলে উনি কোন বড়লোকের ছেলে। কিছুদিন পরে গুজব রটল যে উনিই নাকি ভাওয়ালের মধ্যম রাজকুমার। প্রথমে সকলেরই বেশ আশ্চর্য বোধ হল।

পূর্বের ঘটনা যা শোনা গেল তা হল এই যে মধ্যমকুমার যখন দার্জিলিংএ ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও এক শ্যালক ছিলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন শোনা গেল তিনি মারা গেছেন। শবদেহ নিয়ে যেতে অনেক লোক জড়ো হল। দার্জিলিংএর শ্মশানঘাট ছিল একটি দুর্গম জায়গায়। পাহাড়ের নীচে অনেকটা নেমে যেতে হয়। শবযাত্রীরা যখন শ্মশানে পৌঁছয় তখন বৃষ্টি নেমেছে। শব শ্মশানঘাটে নামিয়ে রেখে তারা পাশের চালাঘরে আশ্রয় নেয়। এ পর্যন্ত গল্পে কোন গোঁজামিল নেই। কিন্তু পরের ঘটনা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটা প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বৃষ্টি থামলে লোকেরা বাইরে এসে দেখল যে কুমারের শবদেহ নেই একথা বাইরে প্রকাশ পেলে নিন্দা রটবে সেজন্য কুমারের শ্যালক তখনই হাসপাতাল থেকে একটি মড়া এনে পোড়াবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শ্যালক অবশ্য একথা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন যে এটা মিথ্যা। কুমারের শব ঠিকই ছিল; আমরা সেই শবই দাহ করেছি। কিন্তু পূর্বোক্ত গুজব ১০।১২ বছর ধরে অর্থাৎ তখনও প্রচলিত ছিল।

কিছুদিনের মধ্যে এই সন্ন্যাসী গভর্ণমেণ্টের কাছে একটি আবেদন করলেন। তাতে তিনি লিখলেন যে তিনিই ভাওয়ালের মধ্যমকুমার। জ্ঞান হয়ে তিনি দেখেন যে দার্জিলিং শহরের শ্মশানঘাটের নীচে এক সাধুর গুহায় শুয়ে আছেন। সাধু তাঁকে বলেন যে তাঁকে মৃত মনে করে শ্মশানে নিয়ে এসেছিল। বৃষ্টি হওয়ায় লোকেরা দূরে আশ্রয় নেয়। তখন ঐ সাধুটি কাছে এসে দেখেন যে তিনি মরেন নি। বৃষ্টির জল গায়ে লেগে তাঁর জ্ঞান ফিরছে নাড়ী পরীক্ষা করে দেখেন যে সত্যসত্যই তিনি বেঁচে আছেন। কোন বিষাক্ত জিনিস খাইয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে; সুতরাং এখনই ফিরে গেলে আবার হত্যার চেষ্টা হবে। এই শুনে তিনি সাধুর সঙ্গে চলে যান এবং নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এতকাল পরে তাঁর আবার সংসার আশ্রমে ফেরার ইচ্ছে হয়েছে। তাই তিনি ফিরে এসেছেন। ভাওয়ালের সম্পত্তি তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসএ। তাঁরা এই বিবরণ বিশ্বাস করল না। সুতরাং সন্ন্যাসীর তরফ থেকে আদালতে মামলা রুজু হল।

বলা বাহুল্য যে এই ব্যাপারে সমস্ত শহরে বিষম চাঞ্চল্য দেখা দিল যেমন সচরাচর হয়ে থাকে। অনেক বৃদ্ধ—যাঁরা কুমারকে চিনতেন—বললেন যে হ্যাঁ, এই কুমার। কেউ কেউ বললেন, না, কুমার নয়। মামলা আরম্ভ হল। বহুদিন এ মামলা চলেছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে কলকাতার বড় বড় ব্যারিস্টার এলেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে শ্রীযুত শশাঙ্ক ঘোষ মামলা চালালেন। পান্নালাল বসু ছিলেন বিচারক। দুই পক্ষেই কয়েকশ' লোক সাক্ষ্য দিলেন। এই মামলার সওয়াল জবাব মাঝে মাঝে খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। পান্নালালবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। সুতরাং দু'একদিন কোর্টে তাঁর পাশে বসে কুমারের শ্যালকের সাক্ষীর জবানবন্দী শুনেছিলাম।

লোকের সঙ্গে আলাপ করে যতদূর বুঝেছি তাতে মনে হয় ঢাকার অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস ছিল এই সাধুই বর্ধমানকুমার। এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দুটি কাহিনী বলছি। এই সময় ঢাকায় একজন বড় জ্যোতিষী আসেন। আমার যে শীঘ্রই পদোন্নতি হবে—একথা তিনি বলেছিলেন। সে-কথা পূর্বেই বলেছি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আপনি তো কুষ্টি ঠিকুজি বা হাতের রেখা দেখে সব বলতে পারেন। কুমারের তো ঠিকুজি কোষ্টি আছে আপনি তাঁর হাতের রেখাও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তা একবার মিলিয়ে দেখুন না কেন। তিনি একটু হেসে বললেন, তা কি আর বাকী আছে। আমি সব দেখেছি। আমি বললাম, দেখে আপনার কি মনে হল? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন উনিই যে কুমার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন আমি তাঁকে একটি কথা বললাম। সেটা বোঝবার জন্য একটু পূর্বের প্রসঙ্গ বলা দরকার। এই মামলায় গোড়া থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে শ্যালকই এই সন্ন্যাসী যে কুমার নন—এ প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কুমারের কোন সাদৃশ্য নেই—এটাই তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। বলাবাহুল্য সব চেয়ে বড় সাক্ষী হলেন রাণীমা অর্থাৎ কুমারের স্ত্রী। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অম্লানবদনে বললেন যে ইনি আমার স্বামী নন। বিচারক তখন বললেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে

যা কোন তৃতীয় ব্যক্তির জানা সম্ভব নয়—আপনি এই রকম দু'একটি প্রশ্ন করে দেখুন না। রাণী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, না, ইনি আমার স্বামী নন। আমি কোন প্রশ্নই করতে চাই না।

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে আমি জ্যোতিষীকে বললাম যে রাণীমা তো এরকম বলছেন। আপনি একবার রাণীকে বলুন না আপনি কি মনে করছেন। জ্যোতিষী বললেন, আমি রাণীমার কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে বললাম, মা, ইনি যে আপনার স্বামী তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং আপনিও তা জানেন। তবে সেকথা স্বীকার করছেন না কেন? আমি সন্ন্যাসীর কোষ্ঠী ঠিকুজী এবং হাতের লেখা দেখে বেশ বুঝতে পারছি ইনিই আপনার স্বামী। একটু চুপ করে থেকে রাণীমা বললেন যে অনেকদূর এগিয়েছি; এখন আর ফেরা যায় না।

দ্বিতীয় ঘটনাটির কথা এবার বলি। এই মামলা যখন চলছে তখন জয়দেবপুর স্কুলের কর্তৃপক্ষ প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষ্যে আমায় আমন্ত্রণ করেন। রাজবাড়ীতেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। দুপুরে একটি বড় ঘরে খেতে বসেছি, একজন বৃদ্ধ রাজকর্মচারী আমার আহার তদারক করার জন্য বসে আছেন। খেতে খেতে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল দেয়ালে একটি বড় অয়েল পেন্টিং ছবি টাঙ্গান আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এই ছবিটি কার? তিনি হেসে বললেন, যাকে নিয়ে দেশ তোলপাড় হচ্ছে এটি সেই মধ্যমকুমারের ছবি। তখন আমি হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আপনাদের কি বিশ্বাস এই সন্ন্যাসীই মধ্যমকুমার? বৃদ্ধ ভদ্রলোক দরজার দিকে চেয়ে ভাল করে দেখে নিলেন আর কেউ আছে কি না। কাউকে না দেখে আস্তে আস্তে বললেন উনি যে মধ্যমকুমার তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের হুকুম সেকথা বলা যাবে না। আপনি দয়া করে একথা যেন কাউকে বলবেন না, তা হলে আমার চাকরী যাবে। আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে তাঁর বিশ্বাস রাজবাড়ীর সকলেই এ কথা জানেন।

মামলার সুদীর্ঘ শুনানী শেষ হল। পরের দিন জজ রায় দেবেন। বেলা এগারটা আন্দাজ খেতে বসেছি, এমন সময় হঠাৎ তোপ দাগার মতো

আওয়াজ। তখনই বুঝলাম জজের রায় অনুসারে সন্ন্যাসীই কুমার সাব্যস্ত হয়েছেন। তা নইলে এমন আনন্দধ্বনি উঠত না। এর কয়েকদিন পরে আমি, পান্নালালবাবু, পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট এবং আরও দু'একজন ট্রেনে ঢাকার কাছে একটি জায়গায় এক সভা উপলক্ষ্যে যাচ্ছিলাম। পান্নালালবাবু গল্প করছিলেন কি রকম সাবধানে তিনি তাঁর রায় গোপন করে রেখেছিলেন যাতে কেউ না টের পায়। পুলিশ সাহেব হেসে বললেন, আমি কিন্তু আগেই টের পেয়েছিলাম সন্ন্যাসীকেই আপনি কুমার বলে সাব্যস্ত করেছেন। পান্নালালবাবু খুব আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, আপনি কি করে টের পেলেন? পুলিশ সাহেব বললেন, আপনার হয়তো মনে আছে যে রায় দেবার আগের দিন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রায় দেবার দিন আদালতে স্পেশাল পুলিশ মোতায়েন করব কি না। তাতে আপনি বললেন—না, তার কোন দরকার নেই। তখনই বুঝলাম যে সন্ন্যাসীই জিতবেন। তা না হলে একটা গোলমালের আশঙ্কা সবাই করেছিলেন।

রায় বেরবার পরে সন্ন্যাসীকুমার আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। মামলার সময় বিপক্ষের উকিল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে সন্ন্যাসী ভাল বাংলা বলতে পারেন না। আমি কিন্তু দেখলাম যে বাংলা তিনি বেশ ভালই বলতে পারেন; তবে তাঁর কথার মধ্যে ঢাকার নিম্নশ্রেণীর লোকের কথা মেশান আছে। শুনেছি ভাওয়ালের জমিদার বাড়ীর ছেলেরা লেখাপড়া তেমন শেখেন না, নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে মানুষ হন। সুতরাং তাদের মুখের কথা বলা এঁদের পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক নয়। তবে কুমারের কথার মধ্যে ঈষৎ জড়তা বোধহয় ছিল। সন্ন্যাসী বললেন যে তাঁকে বিষ খাইয়েছিল। তার ফলে তাঁর জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সন্ন্যাসী এবং তাঁর দলের লোকদের বিশ্বাস যে মধ্যমকুমারের শ্যালক ওঁকে বিষ দিয়ে মারতে চেয়েছিল যাতে তিনিই বোনের জমিদারীর আসল কর্ত্তা হতে পারেন। কুমারের স্ত্রী প্রথমে না জানলেও পরে এ সবই জানতেন। তবে ভাইএর বিপক্ষে কিছু বলতে চাননি। মোটের উপর এ এক অদ্ভুত কাহিনী; গল্প উপন্যাসের চেয়েও বেশী রোমাঞ্চকর।

গভর্ণমেণ্ট এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রথমে হাইকোর্ট এবং পরে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেছিলেন। তবে দুই জায়গাতেই ঢাকার বিচারক পান্নালালবাবুর রায় বহাল থাকে অর্থাৎ সন্ন্যাসীই কুমার বলে সাব্যস্ত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেদিন এই খবর এসে দেশে পৌঁছল সেইদিন বা তার পরের দিন সন্ন্যাসী মারা গেলেন। এইভাবে এই অদ্ভুত কাহিনীর উপর যবনিকা পতন হয়।

আমিও আমার ঢাকার কাহিনীর উপর এখানেই যবনিকাপাত করলাম।

(ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক আমীর খসরু

গৌতম ভদ্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

ইতিহাসবেত্তা আমীর খসরু

তাঁর গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করে আমরা আমীর খসরুর ঐতিহাসিক সত্তা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে পারি। প্রথমেই বলতে হয় যে অতীতকে বিশ্লেষণ করার নিছক তাগিদে গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা কবির ছিল না। রাজার অনুরোধ, পুরস্কারের আশা বা যশের মোহ—এই তিনটিই তাঁর কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। "এই কবিতা রচনার সময় আমি তিনটি কথাই মনে রেখেছি। সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, কীর্তি স্থাপন ও সুলতানের মহৎ নামের সাথে যুক্ত হয়ে নিজে বিখ্যাত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য।"৩৭ আবার, "আমার জীবন অনন্ত হলেও সুলতানের যশ কীর্তনই আমার একমাত্র উপযুক্ত কাজ হত।"৩৮ অপরাপর গ্রন্থগুলিও প্রচুর পুরস্কারের আশায় রাজাদেশে তিনি রচনা করেন। বস্তুত, ইতিহাসের প্রতি কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ আমীর খসরুর ছিল না। কাব্যলক্ষ্মীর সাধক ছিলেন তিনি। এই জন্য তাঁর রচনায় কোন ইতিহাস-দর্শন নেই। এই গ্রন্থ কয়টিও এক সূত্রে গ্রথিত নয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত। বিভিন্ন গ্রন্থের বিচিত্র সুর তাঁর মানসচেতনায় ঐকতানে রূপান্তরিত হয় নি। ইতিহাস রচনা তাঁর কাছে আকস্মিক; কাব্য রচনাই তাঁর সহজাত ধর্ম। কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শনের অভাব আমীর খসরুর ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিকে খণ্ডিত করেছে।

ইতিহাসরচনায় আমীর খসরু সৌন্দর্যই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক রচনার প্রারম্ভেই তিনি নিজেকে কবি বলে বর্ণনা করেছেন, তুলনা করেছেন নিজামী ও গাজীর সাথে. বারবার তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির মধ্যে বিচিত্র কাব্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। সুলতানও তাকে কাব্যই রচনা করতে আদেশ দিয়েছেন। আর প্রশস্তি-রচনায় নিয়োজিত হয়ে শ্রেষ্ঠ কবি শ্রেষ্ঠ

প্রশস্তি লেখাতেই বদ্ধপরিকর হন। তাঁর রচনার সুর উচ্চ তারে সব সময় বাঁধা—কারণ ইতিহাসের সত্য এবং কাব্যের সত্য এক নয়। তিনি নিজের কাব্য প্রতিভারই জয়গান করেছেন, ইতিহাস রচনার কোন দাবিই করেন নি। ইতিহাস লেখা এক অনুপম কাব্যসৃষ্টির উপায় মাত্র ছিল কাব্যরসিক আমীর খসরুর কাছে।

বরণীর চেয়ে খসরু নিষ্ঠাবান সুফী ছিলেন এবং ধর্মে তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল। "আমি বিশ্বাস করি ধর্মশাস্ত্র রচনাই লেখনীর চরম দায়িত্ব। অন্য বিষয়ে আত্মনিয়োগ করা শিশুর মূঢ়তা মাত্র।"৩৯ তথাপি ইতিহাস তার কাছে শিক্ষাপ্রদ নয়। ইতিহাসের মাধ্যমে ধর্মমত প্রচার করা সম্পর্কে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। বরণীর মত তিনি ইতিহাস বর্ণনায় কোন ধর্মমতের পরিপ্রেক্ষিতে সুলতানের উত্থান বা পতন বর্ণনা করেন নি। মধ্যযুগীয় রচনা বলে ধর্মের প্রলেপ তাঁর লেখা ইতিহাসে আছে। কিন্তু সেটা আস্তরণ মাত্র, সারবস্তু নয়।

ইতিহাসের নায়ক চরিত্রগুলি আমীর খসরুর কাছে একই ছাঁচে ঢালা। সবাই মহৎ, কোন অন্যায় করে না। সবাই দেবতা, মানুষ কেউ নয়। তাঁর অবাধ কবি-কল্পনায় আলাউদ্দীনের সাথে কায়কোবাদের কোন পার্থক্যই নেই। মৃত্যুর পরে কখনো কখনো পূর্ব নৃপতিরা সমালোচনাভাজন হয়েছেন। কিন্তু জীবিত থাকাকালীন সবাই আমীর খসরুর অবিমিশ্র প্রশংসাই লাভ করেছেন। রাজানুগ্রহে পুষ্ট কবি অপ্রীতিকর কথা গোপন করার প্রয়াস করেছেন। পিতৃব্য হত্যা বা মোঙ্গলদের হাতে আলাউদ্দীনের হেনস্তার কথা তাই তাঁর গ্রন্থে নেই। সন্ত নিজামুদ্দীনের সাথে দিল্লীর সুলতানদের বিবাদ প্রসঙ্গে তিনি নীরব। "কুররান-উস্-সাদিন" এবং 'নো সিপিহরে' আমীর খসরু নিছক প্রশস্তিকার। কায়কোবাদ বা মুবারক শাহ যেন প্রদর্শনীর পুতুল, সাজানো গোছানো অথচ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি।

ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ক আমীর খসরুর দৃষ্টিগোচর হয় নি। তাঁর কাছে মানুষের চরিত্র ঘটনার দ্বারা শুধু ব্যক্ত হয় মাত্র, কিন্তু চরিত্র ঘটনা সৃষ্টি করে না বা ঘটনার দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। পরিবেশের সাথে মানুষের নিত্য সংগ্রাম ইতিহাসের উপজীব্য নয়। ইতিহাস হল ঈশ্বর বা

ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত। পার্থিব মানুষের ক্রিয়াকলাপ আমীর খসরুর বোধগম্য নয়। এক বিপুল ইচ্ছাশক্তির পুতুল মাত্র মানুষ। কোন ঘটনাই বুদ্ধিতে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যেমন "পশ্চিমে যে ভাবে এক ধ্রুবতারা (আইবক) উঠল, পূর্বে সে ভাবে ধর্মের আলো (ইলতুৎমিস) জ্বলল।...যখন সেই আলো অন্ধকারে নির্বাপিত হল তখন ফিরুজ শাহের ভাগ্য প্রসন্ন হল। ছয় মাসের মধ্যেই অষ্টম মাসে জাত শিশুর মতই তার রাজ্য বিনষ্ট হল। যোগ্য সন্তানের অভাবহেতু সুধীরা রিজিয়াকে নির্বাচিত করলেন।"৪১ শুধু রাজা মহারাজার আগমন ও নিষ্ক্রমণ বলা হল কিন্তু তাদের উত্থান-পতনের কারণ সম্পর্কে কোন কিছু আলোকপাত করা হল না। টেলিফোন ডাইরেক-টরীর মত পারস্পরিক সম্পর্কহীন একরাশ নাম সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে কে,এই প্রশ্নের উত্তর আছে কিন্তু কি বা কেন এই প্রশ্নের জবাব নেই। তাই সিওয়ানা জয়ের কারণ সুলতানের আলস্য এবং গুজরাট জয়ের কারণ সমুদ্রে সুলতানের স্নান করার ইচ্ছা।

একমাত্র 'তুগলক নামায়' এই সাধারণ নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। মানুষই কোন কোন কাজের জন্য দায়ী। মুবারক শাহের পতন যে শুধু ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত ছিল না, নিজের স্বভাবজনিত ছিল তার প্রমাণ আছে এই কয়টি ছত্রে "রাজা হলেন ভগবানসৃষ্ট প্রজাপুঞ্জের সদারক্ষক।...তাঁর পক্ষে মদ্যপানে উন্মত্ত হওয়া সাজে না। যাঁর হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত থাকে তাঁর পক্ষে নিদ্রায় মগ্ন থাকা অন্যায়।" আবার খসরু খাঁন বলেছেন "যদি আমার প্রতি অবিচার না করা হত তা হলে আমি এই কাজ করতাম না, এই বিশ্বাসঘাতকতায় নিয়োজিত হতাম না।" কবি খসরু খাঁনের এই উক্তির মধ্য দিয়ে নীচবর্ণের হিন্দুদের উপর উচ্চবর্ণের মুসলিমদের অত্যাচারকে অভ্যুত্থানের কারণ বলে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন এবং বিদ্রোহটির পেছনে এক মানবিক পটভূমি রচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

সুতরাং হয়ত আমীর খসরু জীবনের শেষ ভাগে—ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি—এই বোধ অনুভব করেছিলেন। কিংবা হয়ত এই বোধ তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল। কিন্তু এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাস লিখলে অপ্রীতিকর

সমালোচনা করতে হবে—সেইজন্যই তিনি ইতিহাসে কার্য-কারণের সূত্র স্থাপিত করেন নি।

এই খানে আমীর খসরুর রচনায় একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমীর খসরুর মধ্যে এক দ্বৈত সত্তা ছিল। যেহেতু সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থ রাজাজ্ঞায় রচিত হয়েছে এবং যেহেতু ইতিহাসের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল না সেহেতু তাঁর সমস্ত চিন্তার পূর্ণ পরিচয় আমরা ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে পাব না। সেখানে তিনি যেন প্রয়োজনের তাগিদেই নিজের মনোভাবকে গোপন রেখেছেন। কিন্তু যে সব গ্রন্থে তিনি রাজদরবারের আদেশ পালন করেন নি, প্রাণের তাগিদেই রচনা করেছেন সেখানে তিনি অনেক অকপট। ঐতিহাসিক আমীর খসরুর মূল্যায়ন প্রধানত তাঁর ছয়টি গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের সমালোচনা সামগ্রিক নয়। যেহেতু আমীর খসরু কবি এবং যেহেতু ইতিহাস ভিন্ন অন্য শ্রেণীর রচনায় তিনি অনেক বেশী দিল্ খোলা, তাঁকে বোঝার জন্য আমাদের অন্য গ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে। শুধু তাঁকে বোঝার জন্যই নয়, ভারতের ইতিহাস রচনাতেও তাঁর অন্য গ্রন্থগুলি অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। এ ভাবে আমীর খসরুকে বিচার না করলে আমরা বিচ্ছিন্নতার দায়ে অভিযুক্ত হব।

এই নূতন বিশ্লেষণে বলতে হয় যে আমীর খসরুর রাজতন্ত্র সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর এই ধারণা শরিয়ৎ অনুমোদিত।

তিনি বলেছেন "যদি তুমি রাজ্যের স্থায়িত্ব কামনা করো, জনগণের শুভেচ্ছা কামনা করো, মনকে সদাজাগ্রত রেখো এবং তলোয়ারকে নিষ্ক্রিয় রেখো না।... বিদ্রোহীদের দমন করো। অহঙ্কারী হয়ো না।"৪১

'নো সিপিহর'-এ তিনি বলেছেন "সুলতানের সর্বদা ঈশ্বরে আস্থাশীল হওয়া উচিত। শরিয়তের নিয়ম পালন করা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য। তাঁরা সদুপদেশ শুনাবেন, বিপদে স্থির থাকবেন ও মানুষের উপকারে সতত নিরত থাকবেন।"৪২

মাৎলা-উল-আনওয়ারের ত্রয়োদশ মুকালাতে'ও এই উপদেশসমূহের প্রতিধ্বনি আছে।

আমীর খসরু অবশ্যই রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সুলতানের স্নেহচ্ছায়াতেই প্রজাপুঞ্জের বৃদ্ধি ও সুলতানের অভাব মানেই যে মাৎস্য-ন্যায় এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। ইজাজ-ই-খসরুয়ি-তে তিনি বলেছেন—

"ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করো, তার পুত্রকে স্বীকার করো এবং কর্তৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের আদেশ পালন করো।" তিনি বারংবার এই প্রবাদ-বাক্যকে উদ্ধৃত করেছেন "যদি কোন সুলতান না থাকত তবে প্রবল দুর্বলকে আত্মসাৎ করত।" কিন্তু সুলতানের সর্বময় ক্ষমতার সমর্থক হলেও জনগণের কথা আমীর খসরুর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বিশেষত কৃষকের মঙ্গল তাঁর অনুধ্যান ছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল চালিকাশক্তি যে তারা, সমাজে সুলতানের চাইতে তাদের স্থান যে কোন অংশে হেয় নয়—একথাও তিনি স্বীকার করতেন। "রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে রায়তের সমৃদ্ধির উপর। যদি কৃষকরা বিনষ্ট হয়—রাজা-ও বিনষ্ট হবে।...সুলতানরা মানুষের চেয়ে অন্য কোন মূল্যবান পদার্থে সৃষ্ট নন; সুখ সুলতানদের একচ্ছত্র সম্পত্তি নয়। আমরা একই খনিজাত মুক্তা। আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে কেন?" মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে কৃষকদের গুরুত্ব স্বীকার করা এবং সমানাধিকার দাবি করা একজন সভাকবির পক্ষে যথেষ্ট প্রগতিশীলতার পরিচায়ক।

সুলতানদের ক্রিয়াকলাপে তিনি হয়ত শেষ-জীবনে বীতশ্রদ্ধ হন। তিনি বলেছেন "রাজার অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা উচিত নয়। সূর্যের মতই আলো দিয়ে তাঁরা আবার অস্তগামী হন।"[৩৩] রাজানুগ্রহে লালিত ব্যক্তির মুখে একথা শুনলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হৃদয়ের গভীরে রাজশক্তির প্রতি কবি ক্ষুব্ধ ছিলেন। কবি সমালোচনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না; কিন্তু রাজকবি বলেই রাজাজ্ঞায় রচিত ইতিহাসে তিনি কোন সমালোচনা করেন নি। তাই শক্তির অভাব নয়, শক্তির যথাযথ প্রয়োগ না করাই আমীর খসরুর ত্রুটি।

কিন্তু বিচার বা বিশ্লেষণ করার প্রতি আমীর খসরু পূর্ণ অচেতন ছিলেন না। রাজাজ্ঞায় যে গ্রন্থগুলি তিনি রচনা করেন নি, সেখানে তিনি

সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। "ইজাজ-ই-খসরুয়ির" পাতায় পাতায় সমালোচনা ছড়িয়ে আছে। কাজীর বিচার সম্পর্কে বলা হয়েছে "কাজীরা কঠোর মনোভাবসম্পন্ন ও যুক্তির অধীন নয়।...উৎকোচ নিয়ে তারা প্রাসাদ তৈরী করেছে।"[৪৫] জোতদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তিনি মুখর হয়েছেন এই ছত্র কয়টিতে "শস্য বাজারে পাওয়া যায় না ..অথচ সর্বত্র শস্য আছে। জোতদাররা ইহুদীদের মত কৃপণ। এদের কেউ কি শস্যের গোলায় ফেলে দিতে পারে না?"[৪৬] আর কৃষকদের উপর অনন্ত শোষণের সেই সংহত অথচ অর্থবাহী উক্তি মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার শ্রেণী সম্পর্ককে এক লহমায় উদ্ভাসিত করে: "রাজ-মুকুটের প্রতিটি মণি দরিদ্র কৃষকদের জমাটবাঁধা চোখের জল ও রক্ত।"[৪৭]

তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমীর খসরু স্থান-কাল-পাত্রভেদে সরব। প্রজা-পীড়নের ক্ষেত্রে তিনি সর্বত্র নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতিশীল। সাহিত্য প্রকাশের আনন্দ বলে মানুষের স্বপক্ষে ছিলেন কবি। তিনি বুদ্ধিজীবী; তাই নিজের বুদ্ধি ও হৃদয়ে তিনি তত্ত্বগত ভাবে বিবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারকে বিনাপ্রতিবাদে স্বীকার করেন নি। আর শোষণই যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার মৌল ভিত্তি একথাও তিনি ভেবেছিলেন। জনমানসের চিন্তা তাঁর মাথায় ছিল—তুর্ক-আফগান যুগে একথা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

কিন্তু তার সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে আমীর খসরু হলেন সেই পরান্নভোজী বুদ্ধিজীবী যাদের মাও-সে-তুং যে কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে চিহ্নিত করেছেন 'দোদুল্যমান চিত্তের অধিকারী' বলে। কৃষকদের উপর অভিজাত শ্রেণীর শোষণের কথা বললেও আমীর খসরু নিজের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শোষকশ্রেণীর পরে নির্ভরশীল ছিলেন। আমীর খসরুর দ্বৈতসত্তা শুধুমাত্র সুফীমতবাদ নিষিক্ত নয়, সমাজে শ্রেণীগত অবস্থানজাত-ও বটে। তাই সবরকম প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও আমীর খসরু এক বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। কৃষক-বন্ধনের কথা বললেও কৃষক-মুক্তির কথা তিনি বলতে পারেন নি। অত্যাচারের প্রতিকাররূপে তিনি ফের ঘুরে ফিরে রাজ-

ছত্রছায়ায় প্রজার কল্যাণবৃদ্ধির কামনা জানিয়েছেন, প্রজার কল্যাণের জন্য রাজার দায়িত্বের কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রজার মুক্তি যে প্রজার হাতেই, সব বন্ধনের অবসান হয় একমাত্র শিকল-ভাঙ্গাতেই—এই চেতনাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর রচনায় আমরা প্রতিবাদ পাই, কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজে পাই না, শ্রেণী-শোষণের কথা পাই কিন্তু শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা পাই না। সেখানে তিনি সেই যুগের শোষক শ্রেণী ও তার শ্রেণীস্বার্থের মুখপাত্র।

নৈতিকতার কথাও তিনি ভেবেছেন। "মাৎলা-উল-আনওয়ার" প্রকৃতপক্ষে একটি নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কি ধরণের আচরণ করতে হবে—সেটারই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সে যুগেও মদ্যপানকে আধ্যাত্মিকতার প্রতিবন্ধক বলে মনে করতেন। ভণ্ড শিক্ষক এবং অসৎ কর্মচারীদের তিনি ১৪শ মুকালায় তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। ২০শ এবং ২১শ মুকালায় তিনি নারীজাতির কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। ২১শ মুকালায় এবং হস্ত-বিহিস্ত-এর সূচনায় তিনি নারীজাতির অবিশ্বস্ততা সম্পর্কে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। "মাৎলা-উল-আনওয়ার"-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমীর খসরু তৎকালীন সমাজব্যবস্থার নীতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমীর খসরু সমালোচনা করতে জানতেন কিন্তু তার প্রয়োগ করতেন স্থান বুঝে।

আমীর খসরুর এই দ্বৈত সত্তার প্রকাশ আরো দেখা যায়। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের কথাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি শান্তির সমর্থকই ছিলেন। সুলতানী আমলের সাম্রাজ্যবাদ ও তার বিপুল ধ্বংসলীলা তাঁর সুফী ধর্মমতে দীক্ষিত মনের কাছে এক বিপুল অপচয় বলে মনে হয়েছে। আলাউদ্দীনের প্রতি শোকগাথায় তিনি প্রশ্ন করেছেন :

"মৃত্যুর পরে তিনহাতের বেশী জমি পেলে না। তাহলে এত রাজ্যজয়, এত লোকক্ষয় করে কি লাভ হল?"[৪৮] সোমনাথের মন্দির ধ্বংস হবার বর্ণনায় বিজয়ীর উল্লাসের চেয়ে সুন্দরের বিনাশে ক্ষোভের ধ্বনিই উচ্চারিত হয়েছে।

"সোমনাথের মন্দির প্রথমে ভাঙ্গা হল ও জলে ফেলে দেওয়া হল। মন্দির যেন তার শেষ প্রার্থনা সমাপ্ত করে সমুদ্রে অবগাহন করল।"[৪৯]

অথবা বরমতপুরীর মন্দির ধ্বংসের চিত্র "যেখানে একসময় স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ছিল সেখানে দেখা গেল তরবারির ঝলসানি। যেখানে গোলাপগন্ধ ও কস্তুরি সুরভিত ফোয়ারা ছিল সেখানে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। গেরুয়াবর্ণের দরজাগুলো ব্রোনজের হলুদবর্ণে রূপান্তরিত হলো। হস্তিদন্তে সজ্জিত মেঝেগুলি রক্তে পূতিগন্ধময় হল। সেই গন্ধে বিশ্বাসীরা হলো উন্মাদ আর অবিশ্বাসীরা হল ধ্বংস।"[৫০] এ যেন বিশাল কিছু ধ্বংস হবার সময়ে স্বভাবকবির সংবেদনশীল মন আর্তনাদ করে উঠেছে। মালিক কাফুরের দাক্ষিণাত্য অভিযানে যে ধর্মের প্রচারের চেয়ে অর্থের মোহই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্টভাবে খিলজী সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসপ্রিয়তা ও অর্থগৃধ্নুতার কথা না বলতে পেরে 'রৌজাতুস সাফা'র রচয়িতা মীর খোন্দ্-এর মতানুযায়ী ধ্বংসের বর্ণনায় বিষাদের সুর ধ্বনিত করে ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদ রেখে গেছেন। শান্তির প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক দিকের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার আভাস—তাঁকে তুর্ক-আফগান যুগের ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে নিশ্চয় অনন্য মর্যাদা প্রদান করবে।

তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল—ভারতের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ প্রেম। "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"—এই ভাব আমীর খসরুর ঐতিহাসিক চেতনায় ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। এই দেশের জল, হাওয়া, মাটি, মানুষ সমস্তই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তিনি একান্তভাবেই ভারতীয় এবং সেদিক থেকে বোধ হয় মুসলিম ভারতের প্রথম জাতীয় (কথাটা অবশ্য হাল্কাভাবে নিতে হবে) ঐতিহাসিক। "নো সিপিহরে" তিনি ভারতের জয়গান গেয়ে বলেছেন—

"ভারত হল পৃথিবীর স্বর্গ···এখানে সকল বিদ্যা ও জ্ঞান গণনাতীত ভাবে সঞ্চিত আছে।" তাঁর অসংখ্য গজলেও এই সুর পাওয়া যায়। ভারতের সবই খসরুর কাছে মহৎ এবং সমস্তই তিনি তাঁর সাহিত্যে অমর করে রাখতে চেয়েছেন এই স্বদেশ-এষণা আমীর খসরুর মানসিকতার একটি মহৎ দিক।

আমীর খসরুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল হিন্দুদের প্রতি তাঁর মনোভাব। তিনি মুসলিম যুগের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। তিনি রাজকবি। সুতরাং বিজয়ী সুলভ উচ্চমন্যতা তাঁর ছিল। তিনি বলেছেন "বস্তুত অতি

প্রাচীন কাল থেকেই এটা একটা সাধারণ সত্যের মত হয়ে গেছে যে হিন্দু সব সময়ই তুর্কদের শিকার হবে।"৫১ হিন্দু কর্মচারীদের নিয়োগ সম্পর্কে তাঁর উক্তি হল "ভগবান করুন, সুলতানের রাজ্য যেন কৃষ্ণবর্ণ হিন্দুদের কুক্ষিগত না হয়।"৫২ কিন্তু উচ্চমন্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি হিন্দুদের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। বারাণী বা আফিফের মত তিনি হিন্দু অর্থই খারাপ—একথা মনে করেন নি। হিন্দুদের মধ্যেও যে শেখার মত ও অনুকরণ-যোগ্য গুণ আছে তা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—

"যদিও তারা আমাদের ধর্মে বিশ্বাস করে না, তবু তাদের অনেক আচার আমাদেরই মত।"৫৩

আরেক জায়গায় লিখেছেন—"বিশ্বাসের জন্য তরবারিতে বা আগুনের মুখে হিন্দুদের প্রাণদান···কতই না মহৎ।"৫৪

হিন্দুদের বীরত্ব সম্পর্কেও তাঁর শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। "খসরুর অনুচরেরা ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দশমুণ্ড বিশিষ্ট দানবের মত যুদ্ধ করত।"৫৫ এদের আক্রমণে যে গিয়াসউদ্দীনের সৈন্যদল প্রথমে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল—"তুঘলক নামায়" সে কথা স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। সুতরাং তিনি যে হিন্দুদের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং অন্ধবিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন না, সে যুগের ধর্মীয় গোঁড়ামীর পরিপ্রেক্ষিতে সে কথা নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমীর খসরুর মানসের ভিন্ন ভিন্ন দিক আলোচনা করে তাঁর রচনাবলী ভারতীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে কতটুকু দরকারী—তা বিচার করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উপাদানের প্রতি তাঁর অনুরক্তির কথা বিচার করা দরকার। সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমীর খসরু রাজদরবারের অতি নিকটে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং সকল ঘটনাই তাঁর জ্ঞাত ছিল। এ ছাড়া তিনি সমসাময়িক যুগেরই ইতিহাস রচনা করেছেন। এদিক থেকে তাঁর আখ্যানভাগ নিশ্চয় নির্ভরযোগ্য। এ ছাড়া তিনি কয়েকবার নিজেও অভিযানে গিয়েছেন। কায়কোবাদের সঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ও আলাউদ্দীনের সাথে

তিনি মেবার জয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি কিছু কিছু যুদ্ধ নিজের চোখে দেখেছেন। তিনি নিজে যা দেখেছেন তাই লিখেছেন—"এই রকম বিপদ ও দুর্দশা যা আমি পূর্বে শুনেছিলাম, এখন নিজের চোখে দেখলাম।"[৫৬] আবার বিপর্যয়ের "একজন প্রত্যক্ষদর্শী গভীর দুঃখের সাথে এই সব কথা লিখল।"[৫৭]

তিনি শুধু নিজের পরে নির্ভর করেননি। আমীর খসরু "আশিকা" রচনা করেছিলেন খিজির খাঁনের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে। অন্য ক্ষেত্রেও তিনি অপরাপরের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন।

"ঘটনার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে অবহিত একজন লোক আমাকে জানিয়েছিল যে সরস্বতীর তীরে খসরু খাঁনের অগ্রগমনের খবর পেয়ে গিয়াসুদ্দিন ভয় না পেয়ে আনন্দিতই হয়েছিলেন।"[৫৮]

নো সিপিহর-এও তিনি অনুরূপ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদদাতার উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া আমীর খসরু সব গ্রন্থই রাজাদেশে রচনা করেছেন। সুতরাং সুলতানরা যে নিজেদের রাজ্যের তথ্য সংগ্রহ করতে তাঁকে সর্ববিধ সাহায্য করবেন—এটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

এখন একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তথ্যাদি সম্পর্কে খসরু যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞাত হলেও তাঁর গ্রন্থে তিনি কতদূর সেগুলিকে পরিবেশন করতে পেরেছিলেন? প্রথমত, যেহেতু তিনি রাজকবি সেহেতু তিনি তথ্য বা মতামত প্রকাশে যথেচ্ছ স্বাধীনতার অবকাশ পাননি। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস তার কাছে সৌন্দর্য সৃষ্টির উপায় হওয়ার দরুণ তিনি অনেক সময়ে বর্ণনা বা উপমার দিকেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তথ্যের দিকে নয়। কোন সন্দেহ নেই যে এই দুইটি অসুবিধা তাঁর ঐতিহাসিকের মর্যাদা লাভের পথে প্রধান দুটি অন্তরায়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে আমীর খসরু রাজ-সভাসদের সাথে সাথে একজন সুফী ভক্তও ছিলেন। সত্যের প্রতি অনুরাগ সুফীদের ধর্ম এবং মিকতা-উল-ফুতুতে আমীর খসরু তা স্বীকার করেছেন। ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রিয় কথা বলা, সত্য কথা বলা। কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা তিনি গোপন করেছেন। তা বলে তিনি কোন মিথ্যা কথা বলেছেন তার কোন প্রমাণ নেই। বিতর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কেও তিনি

নীরব ; তাদের খণ্ডনও করেন নি বা সমর্থনও করেন নি। পুরো সত্য তিনি বলেন নি কিন্তু যেটুকু স্পষ্ট করে বলেছেন সেটুকু মিথ্যে নয়।

তৃতীয়ত, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, অতিরঞ্জন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের ইতিহাস-সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রাসঙ্গিকতার মাপকাঠি দিয়ে মাপলে অনেককেই বাদ দিতে হয়। এসব সত্ত্বেও আমীর খসরু যে সময় সময় বাগসংযম করতেন তার প্রমাণ "আশিকায়" পূর্ববর্তী সুলতানদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়াবলী। তাঁর বিবরণের নির্ভরযোগ্যতার বড় প্রমাণ হল যে তাঁর কাহিনী অন্যান্য ঐতিহাসিক দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। যেমন খাজাইন-উল-ফুতুতে মালিক কাফুরের সম্বর্ধনায় যে দরবারের বিবরণ আছে তার সাথে ইবন বতুতা যে দরবারের বিবরণ দিয়েছেন তা হুবহু মিলে যায়। তিনিও খসরু খাঁনের অনুচরদের বীরত্বের উল্লেখ করেছেন। বরণীও আমীর খসরুর কথা তাঁর গ্রন্থে তথা পরিবেশনে স্মরণ করেছেন। অনেক সময় বরণী যে বিষয় সম্পর্কে সামান্য আলোক সম্পাত করেছেন আমীর খসরুর গ্রন্থে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে। যেমন গিয়াসউদ্দীনের প্রথম জীবন সম্পর্কে বরণী কিছুই বিশেষ বলেননি। কিন্তু আমীর খসরু তাঁর পূর্ব জীবন সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং আমীর খসরুর বিবরণ যে সকল উপমা ও অলঙ্কারের অন্তরালেও তথ্যনিষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ তাঁর পরিপূরক ও সমর্থক এবং তাঁর গ্রন্থ অন্যান্য ঐতিহাসিকদের পরিপূরক ও সমর্থক - এটাই তাঁর তথ্যনিষ্ঠার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

শুধু রাজনৈতিক অবস্থা ছাড়াও আমীর খসরুর রচনাবলী ভারতীয় ইতিহাসের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। প্রথমেই বলতে হয় ভৌগোলিক ক্ষেত্রে তাঁর রচনার মূল্যের কথা। তিনি মূলত যুদ্ধাভিযানের গ্রন্থই রচনা করেছেন এবং ঐ সৈন্যবাহিনীর যাত্রাপথের একটি বিস্তৃত বিবরণ সমস্ত ক্ষেত্রেই দিয়েছেন। দিল্লী থেকে অযোধ্যা (কুররান-উস-সাদিন), দিপালপুর থেকে দিল্লী (তুঘলকনামা) দিল্লী থেকে মাবার (খাজাইন-উল-ফুতু) পথের বিবরণ

সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি অগ্রগমনের সাথে সাথে দেওয়া আছে। 'তুঘলকনামা'য় আলমপুর, হান্‌সী, মাদিনা, রোহতগ, মানদেলিপালাম—প্রতিটি স্থানই সুচিন্তিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দক্ষিণভারতেও তিনি যে নদী ও পথগুলির বর্ণনা দিয়েছেন সেটা আজও মালিক কাফুরের অভিযানের গতিপথ বর্ণনার প্রধান উপকরণ। যদি কোন কিছু চিহ্নিত না করা যায় তার কারণ ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তন।

এছাড়াও যেহেতু আমীর খসরু প্রধানত নাগরিক কবি, দিল্লী, মূলতান, অযোধ্যা, দেবগিরি প্রভৃতি শহরের বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন গজল ও গাথায় তিনি এই বর্ণনা ছড়িয়ে রেখেছেন। দিল্লীর হর্মরাজি ও সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে 'খাজাইন-উল-ফুতুর প্রারম্ভেই। 'নিহাৎ-উল-কামিলে' মহম্মদ তুঘলকের প্রতি উৎসর্গীকৃত কবিতায় দেবগিরির সৌন্দর্যের বর্ণনা করে এক কবিতা লেখা আছে। হয়ত পরবর্তীকালে দেবগিরিতে আরেকটি রাজধানী স্থাপনের মূলে এই কবিতার কোন ভূমিকা ছিল। ঘুরাৎ-উল-কামিলে তাজউদ্দীন জাহিরকে লিখিত একটি চিঠিতে অযোধ্যার চমৎকার বিবরণ আছে। সুতরাং তৎকালীন যুগের ভারতবর্ষের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক ও নগরের সংস্থানের ইতিহাস রচনায় আমীর খসরুর বিবরণ অপরিহার্য।

মধ্যযুগের যুদ্ধরীতি সম্পর্কে আমীর খসরুর রচনাবলী প্রণিধান-যোগ্য। এক হিসাবে তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি যুদ্ধ বিগ্রহে পূর্ণ এবং সেই বিবরণগুলি তিনি বিস্তৃতভাবেই প্রদান করেছেন। যুদ্ধের আক্রমণ পদ্ধতি, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও অপরাধ নীতি সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থগুলি প্রচুর তথ্যের খনি মাত্র। যেমন রণথম্ভরের যুদ্ধবর্ণনায় "তারা দুর্গপ্রাকারের গম্বুজে গম্বুজে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল যাতে করে আলাউদ্দীন প্রাকার উল্লঙ্ঘন করতে অসমর্থ হন। অন্যদিকে নবমুসলমানরা আক্রমনকারীদের উপর ঘন ঘন তীর বর্ষণ করল; তুলায় মাখানো জ্বলন্ত শর প্রায়ই ব্যবহৃত হত...অবরোধকারীরা তখন বালির বস্তা দিয়ে পরিখাকে পূর্ণ করল"।[৫৯]

এই বর্ণনা থেকে তখনকার দিনের যুদ্ধে আগুনের ব্যবহার এবং পরিখা অতিক্রম করার পদ্ধতি জানা যায়। আবার বরঙ্গল জয়ের বর্ণনায়:—

"নগরটি একটি প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। প্রাকারটি মৃত্তিকানির্মিত হলেও এত শক্ত ছিল যে একটি বর্শা পর্যন্ত ভেদ করতে পারত না··· সৈন্যবাহিনীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে এক চক্রাকৃতি ক্ষেত্রকে বেষ্টন করা হল। যার পরিমাপ ১২৫৪৬ গজ। প্রত্যেক বাহিনী ১২শ গজ করে স্থান দখল করল। তারপরে তারা প্রাকারকে ঘিরে একটি কাঠের বেষ্টনী রচনা করল।"[৬০] এই বর্ণনা থেকে আমরা ব্যূহ রচনার পদ্ধতি ও ও অবরোধ করার রীতি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাই। এই ভাবে তাঁর রচনাপাঠে মধ্যযুগের যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব।

তৎকালীন সামাজিক রীতি, নীতি আইন সম্পর্কে আমীর খসরুর বিবিধ তথ্য আছে। "মাৎলা-উল্-আনওয়ার"-এ তৎকালীন সমাজের নীতি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। "ইজাজ-ই-খসরুয়িতে" আছে তৎকালীন আইন ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য। অন্যান্য গ্রন্থেও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে আলোকসম্পাত করা হয়েছে। যেমন তুঘলক নামায় উল্লিখিত হয়েছে "যুবকের গণ্ডদেশে প্রথম শ্মশ্রু উৎসবের লক্ষণ।"[৬১]

অর্থাৎ তখনকারদিনে গুম্ফ দেখা দিলেই একটি উৎসবের আয়োজন করা হত। আবার—

"এই কামনাপূর্ণ শহরে বহু স্ত্রীই বোরখা পরিধান করে ভ্রমণ করত।"[৮০] সুতরাং আমীর খসরুর গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা যে কোন সামাজিক ঐতিহাসিকের কর্তব্য।

ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস রচনায় আমীর খসরুর গ্রন্থাবলী সবিশেষ মূল্যবান। তিনি নিজে কবি এবং তৎকালীন সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রমণি। সুতরাং সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ স্পন্দন তাঁর রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন ভাষা সম্পর্কে নো-সিপিহর এ বলেছেন :

"ভারতবর্ষে তিনটি প্রধান ভাষা আছে—আরবি, ফারসি-ই-দারি অর্থাৎ শুদ্ধ ফারসী ও তুর্কী-ফারসী অর্থ মিশ্র ফারসী—এছাড়া প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব ভাষা আছে যেমন সিন্ধী, কাশ্মীরী, বাঙ্গলা ইত্যাদি···এছাড়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্যবহৃত ও জনগণের অজ্ঞাত একটি ভাষা আছে যার নাম সংস্কৃত।"[৬৩] সঙ্গীত

সম্পর্কেও তিনি গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন কারণ তিনি নিজেই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীতের বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সুর সম্পর্কে বহু তথ্য তাঁর সামগ্রিক রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে আছে। তিনি নিজে ছিলেন সুফী এবং সুফীদের জীবন ও ধর্ম নিয়ে রচনা করেছেন "আফদল-উল-ফৈয়াদ"। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার বাণী জানার জন্য এই গ্রন্থপাঠ অপরিহার্য।

আমীর খসরুর গ্রন্থাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তারিখের নিভুর্ল প্রয়োগ। তিনি সময়গুলি একটি ধাঁধার মত করে ভাষার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যেমন "যখন অর্ধচন্দ্রের নৌকা মেঘের ঝর্ণার মধ্যে প্রবেশ করল।" এখানে মেঘ বা আবরের প্রথম অক্ষর "আলেফ" ফারসী বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। অতএব সময়টা মাসের প্রথম তারিখ। এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। এই পদ্ধতি খুব সহজ নয় এবং আমীর খসরু এই জাতীয় শব্দাবলীর পরেই তারিখটিও তাই সাধারণভাবেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই পদ্ধতির ফলে অনুলিপির সময় ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিটি সহজেই সাধারণভাবে উল্লিখিত সময়ের যথার্থ্য নিরূপণে সহায়তা করে। বস্তুত সালতামামি সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে আমীর খসরু পরম নির্ভরযোগ্য।

সর্বশেষে আমীর খসরুর আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করতে হয়। আমীর খসরু আঙ্গিকের সবচেয়ে বড়কথা হল তাঁর বৈচিত্র্য। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ বিচিত্র ছন্দে রচনা করেছেন আবার কোন সময় একই গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রীতির অবতারণা করেছেন। অবশ্য অনেক সময়ই এর ফলে গ্রন্থের সাবলীলতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু সময় সময় ইতিহাসের চরিত্র ও ঘটনা জীবন্ত হয়েছে। ইতিহাসের কঙ্কালের মধ্যে তিনি তাঁর ভাষারীতির দ্বারা প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তালওয়ারা টিকা, চন্দন প্রভৃতি ভারতীয় শব্দের বিশেষ প্রচার দেখা যায়। তিনি নিজে একজন ভারতীয় ছিলেন—তার একটি প্রমাণ হল তাঁর আঙ্গিক। তৃতীয়তঃ, তাঁর আঙ্গিকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাস্যরস লুকিয়ে আছে এবং এই কারণে তিনি প্রচুর শ্লেষাত্মক উপমা ব্যবহার করেছেন।

আমীর খসরুর সর্বাত্মক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলতে হয় যে আধুনিক মানদণ্ডে নিজের বিশিষ্ট কোন দর্শন না থাকায় ঐতিহাসিকের শিরোপা তিনি পেতে পারেন না। কিন্তু মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার বর্ণনায় ও তথ্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যায় তিনি নিশ্চয়ই ইতিহাস রচয়িতা। এছাড়া বার্নিয়ার প্রসঙ্গে এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি স্মরণীয়।৩৪ ইতিহাস হল সমাজ, সংস্কৃতি ও উৎপাদনের কাহিনী। বার্ণিয়ারের ভ্রমণকাহিনীতে মুঘল যুগের সমাজের একটি প্রতিফলন পাওয়া যায় এবং সেজন্য তিনি যে কোন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীর শ্রদ্ধার যোগ্য। অনুরূপভাবে যখন ভারতবর্ষের নতুন যুগে পুরাতন ইতিহাসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা লেখা হবে তখন তুর্ক-আফগান যুগের 'ভারত-জনকথার' ক্ষীণ পরিচয় আমীর খসরুর গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হবে। সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সীমার মধ্যে থেকেও জনমানসের সাথে, শোষিত মানুষের সাথে, একটি সহানুভূতির যোগসূত্র স্থাপন করার সামান্য প্রয়াস পেয়েছিলেন বলেই আমীর খসরু অনন্য, মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি-ঐতিহাসিক।

সূত্র নির্দেশ

৩৭। বিফতা-উল্-ফুতু
৩৮। খাজাইন-উল্ ফুতু।
৩৯। বাকিয়া নাকিয়া।
৪০। আশিকা। পৃ: ৫৭।
৪১। ঐ।
৪২। নো-সিপিহর পৃ: ২২৬-২৪৩।
৪৩। আশিকা। পৃ: ২৩-২৫।
৪৪। ইজাজ-ই-খসরবি। চতুর্থ রিসালা। ২৩৫ নং খৎ।

৪৫। ঐ।
৪৬। ঐ।
৪৭। কুলিয়াৎ-ই-আমীর খসরু। পৃঃ ২০৪-২০৫।
৪৮। আলাউদ্দীনের পরে রচিত শোকগাথা। বাকিয়া নাকিয়া।
৪৯। খাজাইন-উল-ফুতু।
৫০। ঐ।
৫১। নো সিপিহর।
৫২। মাৎলা-উল্-আনওয়ার।
৫৩। নো সিপিহর।
৫৪। খাজাইন-উল-ফুতু।
৫৫। তুঘলক নামা।
৫৬ ঐ। পৃঃ ১৬।
৫৭। ঐ। পৃঃ ২৩২।
৫৮। তুঘলকনামা পৃঃ ৮৩-৮৪।
৫৯। খাজাইন-উল্-ফুতু।
৬০। ঐ।
৬১। তুঘলকনামা পৃঃ ২৫।
৬২। ঐ। পৃঃ ৮৩
৬৩। নো সিপিহর।
৬৪। ২২নং চিঠি—সিলেক্‌টেড করেস্‌পন্‌ডেন্‌স্ অব্ মার্কস এণ্ড এঙ্গেলস্—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। ১৯৪৭ সংস্করণ।

গ্রন্থপঞ্জী

মূল গ্রন্থগুলি ছাড়াও এই সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে
১। লাইফ এণ্ড ওয়ার্কস অব আমীর খসরু—ওয়াহিদ মীর্জা।
২। আমীর খসরু অব দেহলী—মহম্মদ হাবিব।
৩। হিস্টরীয়ানস্ অব মেডিয়াভাল ইণ্ডিয়া-পিটার হার্ডি
৪। ঐ—মোহিবুল হাসান সম্পাদিত।
৫। ষ্টাডিজ ইন মেডিয়াভাল হিস্ট্রী—কে এ নিজামী।
৬। নো সিপিহর—ওয়াহিদ মীর্জা সম্পাদিত ও মূল্যবান ভূমিকা সমন্বিত।
৭। খাজাইন-উল্ ফুতু—ঐ।

৮। ঐ—মহম্মদ হাবিব্ সম্পাদিত ও মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত।
৯। বায়োবিবলিওগ্রাফি অব্ পারসিয়ান লিটারেচার—রিচার্ড স্টোরি।
১০। হিস্ট্রী অব্ দি কুরাণা তুর্কস-ইশ্বরী প্রসাদ।
১১। হিস্ট্রী অব্ দি খিলজিস—লাল।
১২। তুঘলক্ ডাইনাস্টি—মাহাদী হোসেন।
১৩। লাইফ্ এণ্ড কন্ডিশন্ অব্ দি পিপল অব্ হিন্দুস্থান—কুনোয়ার মহম্মদ আসরফ।
১৪। দি হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া-এলিয়ট ও ডসন (৩য়খণ্ড)।
১৫। ফতোয়া-ই-জাঁহাদারি—সালিম আফসর উমর খান সম্পাদিত ও অনূদিত।
১৬। কুররাণ-উস-সাদিন্ অব্ আমীর খসরু—কাওয়েল। জার্ণাল অব্ এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল ১৮৬০।
১৭। আশিকা অব্ আমীর খসরু—বি. পি. সাকসেনা। প্রসিডিং অব্ ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল কংগ্রেস। ৬ষ্ঠতম খণ্ড।
১৮। হিষ্টরিকাল ন্যাটারস্ ইন্ ইজাজ-ই-খসরুয়ি—আসকারি। ঐ। রাঁচী অধিবেশন। ১৯৬৪
১৯। পলিটিকাল এণ্ড ইকোনমিক ফ্রাগমেণ্টস ইন্ রসিল্ উল্-ইজাজ—আসকারি। জার্ণাল অব বিহার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। জানুয়ারী টু ডিসেম্বর। ১৯৬৭।

সিরাজদৌল্লার মহিষী

—শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনার পরিপূর্ণ উদ্ভব। এই নবজাগরণের প্রকাশ কাব্যে ও সাহিত্যে। পরাধীনতার কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেশের নেতারা জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করলেন। সাহিত্যিকরা তুলে ধরলেন অতীত গৌরবের চিত্র। প্রতাপসিংহ, রাজসিংহ, শিবাজী স্বাধীনতাকাঙ্খী সংগ্রামী ভারতবাসীর প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ালেন। রানা প্রতাপের প্রভায় বাংলার প্রতাপাদিত্য ও বারভূইঞাগণ সমাদৃত হলেন। এমন কি নবাব সিরাজদৌল্লা রাষ্ট্রনায়কের সম্মানে ভূষিত হলেন। পলাশীর পরাজয় এবং সিরাজের নৃশংস হত্যা তার জীবনের বিফলতাকে উপন্যাসের উপজীব্য করে তুলল। ইতিহাস সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নবাব সিরাজদৌল্লা সাহিত্যিক-নাট্যকারদের দয়ায় গত অর্ধশতাব্দী কাল ধরে বাঙ্গালীর নয়নের মণি। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কবি নবীন চন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধে" সিরাজের অভিযান সুরু—অদ্যাবধি জনচিত্তে তাঁর সম্মান ও আবেদন অটুট। এ বিষয়ে আমি ইতিহাস পত্রিকায় (সিরাজদৌল্লা সাহিত্যে ইতিহাসে, প্রথমসংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৬) বিশদ ভাবে আলোচনা করেছি, সুতরাং সে প্রবন্ধের বক্তব্যের পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজন। তবে উল্লেখ করা চলতে পারে যে সিরাজের সম্পর্কে ভাবপ্রবণতা কেবল সাহিত্যিক নয় কোন কোন ইতিহাস লেখককেও প্রায়ই কর্তব্যচ্যুত করেছে। সিরাজদৌল্লা নামের উল্লেখমাত্র অনেকের লেখনী উচ্ছসিত এবং দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। বর্তমানে যে সব গবেষক সিরাজদৌল্লার ঐতিহাসিক চরিত্র আলোচনা করছেন তাদেরকে তাই সাবধানে এবং সযত্নে অগ্রসর হতে হয়। কল্পিত সিরাজ সত্যকার সিরাজের থেকে বহুগুণে লোক-রঞ্জক হয়ে গিয়েছেন।

এই দীর্ঘ ভূমিকার কারণ এই যে নির্মম চরিত্র সিরাজদৌল্লা যখন মহাননেতার পদে অধিষ্ঠিত তখন সিরাজ মহিষী সম্পর্কে আলোচনার কোন

অবকাশ আছে কিনা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। সিরাজের চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায় কিন্তু বেগমদের সম্পর্কে সংবাদ অত্যন্ত সামান্য এবং প্রায়ই পরস্পর বিরোধী। সুতরাং এই ক্ষীণ সূত্রধরে সিরাজ মহিষী বা মহিষীগণ সম্পর্কে কোন আলোচনা কষ্টসাধ্য এবং বিপজ্জনক। উপরন্তু কাব্যের সুষমায় সিরাজ মহিষীর চরিত্র মহিমান্বিত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কবি নবীনচন্দ্র নবাব মহিষীর যে অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন পরবর্তী কালের সাহিত্যিক-গণ তারই অনুসরণ করেছেন। স্বামীর প্রতি অচলাভক্তিসম্পন্না মহিমময়ী, বিদুষী ও কর্তব্যপরায়ণা রূপে তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র যখন সিরাজদৌল্লা নাটক প্রকাশ করলেন তখন সযত্নে ঐতিহাসিক তথ্য চয়ন করেছেন। জাতীয়তাবাদী সিরাজ-চরিত্র সৃষ্টি করতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য গিরিশচন্দ্র পরিবেশন করেছেন। কিন্তু সিরাজ মহিষীর চরিত্র চিত্রনে নবীনচন্দ্র প্রদর্শিত পথ ও মতই অবলম্বন করেছেন। বাঙ্গালী নারীর প্রতিভূ হয়েছেন সিরাজ বন্দিতা—তাঁর ত্যাগ ও সতীত্বের মহিমায় দর্শকের মন উদ্বেলিত হয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সিরাজদৌল্লার মহিষীর আমরা নাম করি নাই। নবীনচন্দ্রও করেন নাই। উদাহরণ দেওয়া যাক, 'মূর্চ্ছাপন্ন একাকিনী ইষ্টক শয্যায়! রাজরাণী পরে হায়! ভিখারিনী মত' 'শোকে সতী নিবিড় আঁধারে··· 'পড়িল ভূতলে স্বর্ণ প্রতিমার মত' 'লোহার অর্গল খুলিলনা রমণীর করুণ রোদনে' 'বৃথাশ্রমে বিষাদিনী অবসন্ন মনে বসিল ভূতলে'। নবীনচন্দ্র কি সিরাজ মহিষীর নাম সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন নাই? তাই নাম ব্যবহার করতে দ্বিধা করেছেন? কিন্তু সিরাজের সম্পর্কে তার কোন দ্বিধা নাই।

এই কি সিরাজদৌল্লা? এই সে নবাব
যার নামে বঙ্গবাসী কাপে থর থর?
যার এই বঙ্গে ছিল প্রচণ্ড প্রভাব,
সেই কি পতিত আজি ধরার উপরে?
কোথায় সে সিংহাসন? পারিষদগণ?
কোথায় সিরাজ তব মহিষী মণ্ডল?
কোথায় সে রাজদণ্ড? খচিত ভূষণ?

কেন আজি অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল ?
এ যে মহম্মদি বেগ তব অনুচর
তুমি কেন পড়ে তার চরণ উপর ?　(১)

প্রথম প্রশ্ন তাহলে যে সিরাজ মহিষীর কি নাম ছিল। সাহিত্যিকগণ যেমন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নিশিকান্ত বসু রায়, শচীন সেনগুপ্ত, বঙ্কিম দাসগুপ্ত প্রভৃতি নির্দ্বিধায় সিরাজ মহিষীর নাম লুৎফা বা লুৎফন্নিসা ঘোষণা করেছেন।(২) বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ যেমন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সন্তর্পণে লিখেছেন 'প্রিয় সহচরী লুৎফউন্নিসা বেগমকে সঙ্গে করিয়া···' (৩) অন্যত্র লিখেছেন 'একজন মাত্র পুরাতন প্রতিহারী এবং চিরসহচরী লুৎফউন্নিসা বেগম ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিল।' (সিরাজদৌল্লার পলায়ন) (৪) যদি 'বেগম' কথাটি স্ত্রী বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে মৈত্রেয় মহাশয় লুৎফউন্নিসাকে সিরাজের মহিষীর মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সন্দর্ভের কোন স্থানে এ বিষয়ে উল্লেখ না থাকায় সন্দেহ হয় যে উনি 'বেগম' শব্দটিকে নাম বাচক অর্থে ব্যবহার করেছেন যেমন 'অমুক দেবী' বা 'তমুক দাসী' লেখা হয়ে থাকে। Beveridge এর মতামত ফুটনোটে উদ্ধৃতিকেও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়—'He was accompanied in his flight by his favourite concubine Latafunnissa. I am informed that this lady was originally a Hindu and none other than the sister of Mohan Lall'. ১৩০৪ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে মৈত্রেয় মহাশয়ের লেখা প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের শ্রাবণ মাসে নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনীর মধ্যে 'লুৎফউন্নেসা' প্রবন্ধে দেখা যায়'···এবং তিনিই (লুৎফউন্নেসা) সিরাজের প্রিয়তমা মহিষী বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখিত হইয়া থাকেন'। (৫) রায় মহাশয় নামের সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন যে লুৎফ মানে ভালবাসা ও নেসা মানে স্ত্রী। সুতরাং লুৎফউন্নিসার মানে 'প্রিয়তমা স্ত্রী'। (৬) কিন্তুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু রায় মহাশয় অন্য কথা বলেছেন 'প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলিয়া রাখি, লুৎফ-উন্নেসা অথবা ফৈজী কেহই সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রী নহেন। সিরাজের

বিবাহিতা স্ত্রীর নাম ওমদাৎ উন্নেসা'। (৭) পাদটীকায় রায় মহাশয় আবার লিখেছেন—'সিরাজের কয়টি স্ত্রী ছিলেন তাহা স্থির করা যায় না। কেবল তিন বা চারিজনেরই উল্লেখ পাওয়া যায়, (১) ওমদাৎ উন্নেসা, ইনি বিবাহিতা পত্নী (ইরাজ খাঁর কন্যা); (২) লুৎফউন্নেসা; (৩) ফৈজী; (৪) মোহনলালের ভগিনী।'(৮)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৯ সালে বা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার বেগম পুস্তকে 'লুৎফুন্নিসা' প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ লুৎফুন্নিসা প্রবন্ধে নানা দিক হতে নিখিলনাথ রায়ের অনুগামী। বারবার উদ্ধৃতি ও পাদটীকায় 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। নিখিলনাথকে অনুরনন করে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ঐতিহাসিকরা একবাক্যে লুৎফুন্নিসাকেই সিরাজ বণিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।' (৯) সুতরাং সর্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন যে কোন ঐতিহাসিকগণ লুৎফউন্নেসাকে সিরাজ পত্নী বলে বর্ণনা করেছেন। এইবার খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে কারণ উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকগণ লুৎফউন্নেসাকে সিরাজের মহিষী বলেন নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের অনেকে যেমন Stewart, Beveridge, Hunter, Orme প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিগণ প্রায়ই নবাবমহিষীর উল্লেখ করেন নাই অথবা লুৎফউন্নেসাকে concubine বা রক্ষিতা বলেছেন। ফরাসী ঐতিহাসিকগণ এবিষয়ে নীরব। সমসাময়িক লেখক সৈয়দ গোলাম হোসেন সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণে ১৭০৭ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। মুতাক্ষরীনে লুৎফউন্নেসাকে 'জারিয়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (১০) জারিয়া—অর্থাৎ ক্রীতদাসী। মুতাক্ষরীনের অনুবাদেও 'Bond-maid' বলা হয়েছে। (১১) সুতরাং দেখা যাচ্ছে লুৎফউন্নেসাকে কোনক্রমেই সিরাজ মহিষীর সম্মান দেওয়া যায় না। উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে দেখা যাবে যে স্বয়ং নিখিলনাথ বা ব্রজেন্দ্রনাথও এবিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল ছিলেন। তবুও সম্ভবত একজন জারিয়াকে প্রবন্ধের মূল চরিত্র করতে তাঁদের দ্বিধা ছিল, তাই তাঁরা 'অনেক ঐতিহাসিক' এর বকলমে লুৎফউন্নেসাকে সিরাজ বণিতা বলার চেষ্টা করেছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ সিরাজদৌল্লার স্ত্রীগণের তালিকায় সামান্য রদবদল করেছেন। তিনি লিখেছেন —'১। তাঁহার বিবাহিতা পত্নী (ইরাজ খাঁর কন্যা); ২। লুৎফুন্নিসা; ৩। ফৈজী (মোহন লালের ভগ্নী)'। (১২) ব্রজেন্দ্র বাবু ফৈজীকে মোহনলালের ভগ্নী বলেই কল্পনা করেছেন। মুতাক্ষরীন লেখক ফৈজী সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি করেছেন। তিনি লিখেছেন ফৈজী দিল্লীর এক নর্ত্তকী (বাইজী বলা যায় সম্ভবত)। তাকে একলক্ষ টাকায় সিরাজদৌল্লা ক্রয় করেন। (১৩) ফৈজীর রূপ-লাবণ্যের বিবরণ, সিরাজের ভগ্নিপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রণয় এবং অবশেষে প্রতিহিংসাপরায়ন সিরাজের ক্রোধে ফৈজীর নৃসংশ হত্যা মুতাক্ষরীন অনুসরনে নিখিল নাথ রায় বিবৃত করেছেন। (১৪) সুতরাং ফৈজীকে সিরাজদৌল্লার পত্নী বলে আখ্যাত করা সত্যের অপলাপ।

মুতাক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাফা নামধারী ফরাসী পণ্ডিত পাদটীকায় মোহনলালের ভগ্নীর কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বলা হয়েছে 'যে মোহন লালের ভগ্নীর অপরূপ রূপ লাবণ্যের কথা সিরাজদৌল্লার নিকট অধিকদিন লুক্কায়িত রহিল না। তখন সেই রূপ রাশি সিরাজদৌল্লার অন্তঃপুরে আসিয়া উপনীত হইল।' (১৫) কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনেকেই মনে করতেন মোহন লাল বাঙ্গালী। বর্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন মোহনলাল কাশ্মিরের অধিবাসী, যুদ্ধ ব্যবসায়ী। ভাগ্য অন্বেষণে তিনি সুবা বাংলায় উপনীত হন এবং ভাবী নবাব নির্জ্জামহম্মদ সিরাজদৌল্লার পারিষদ শ্রেণীভুক্ত হন। ক্রমে তার পদোন্নতি হয় এবং সিরাজের নবাবীর প্রথম মাসেই অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রায়দুর্লভ রায়ের পদচ্যুতির পর মোহনলাল নবাবের মন্ত্রী বা দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। বলাবাহুল্য এই পদটিই তখন সকলের কাম্য ছিল। বাংলার নবাবের অধীনে এই পদই ছিল সর্বোচ্চ। সিরাজদৌল্লার পলায়নের পর যখন মীরজাফর খাঁ বাংলার নবাব হলেন তখন মহারাজ নন্দকুমার এই পদে সমাসীন হলেন। রাজা মোহনলালের বীরত্বের কথা বহু আলোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিদেশী এক অজ্ঞাত কুলশীলের এই দ্রুত উন্নতির মূলে ভগ্নিদানের ইতিহাস থাকা তাই অস্বাভাবিক মনে হয় না। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় একথা

স্বীকার করেন। (১৬) কাশ্মিরী রমণীর সৌন্দর্য সম্পর্কে সকলেই অবহিত। সুতরাং কামিনী অভিজ্ঞ নবাব যে মোহনলালের ভগ্নিতে মোহিত হবেন এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। পরবর্তিকালে এই মহিলার উল্লেখ কি ভাবে হয়েছে একথা স্বভাবতই মনে আসে। বেভারীজ সাহেব বলেছেন মোহনলালের ভগ্নীই লুৎফউন্নেসা। দুটি কারণে এই উক্তি সত্য বলে মনে করা যেতে পারে। প্রথম কারণ লুৎফউন্নেসার নাম। প্রিয়তমা স্ত্রী বা পণ্যের সহচরী বা প্রেমের আধার (বিভিন্ন ভাবে অনুবাদে) নাম হিসাবে বড়ই অস্বাভাবিক মনে হয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মোহনলালের ভগ্নিনী সিরাজের অঙ্কশায়িনী হলেন—তাঁর জারিয়া হলেন। তারপর নবাব তাঁর হিন্দুনাম বাতিল করে দিয়ে লুৎফউন্নেসা নামকরণ করলেন। দ্বিতীয় কারণ মোহনলালের দ্রুত ও অস্বাভাবিক উন্নতি। মোহনলালের উন্নতির পেছনে কেবল বীরত্ব ও প্রভুভক্তি নয় সম্ভবত ভগ্নীর অদৃশ্য হস্ত কাজ করেছে। এবার বিভিন্ন ঘটনার মাঝে ক্রমবিবর্তন ও যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন যে মুর্শিদাবাদের পরলোকগত নবাববাহাদুরের দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুরও বিশ্বাস করতেন যে লুৎফউন্নেসাই মোহনলালের ভগিনী (১৭)

কালীকিঙ্কর দত্ত ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দ সিরাজের জন্মের বছর নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে পাটনায় পাঠান বিদ্রোহের সময় ৩০শে জানুয়ারী ১৭৪৮। নবাব আলীবর্দি পাঠান বিদ্রোহ দমন করেন। সিরাজের পিতা ও পিতামহ পাঠানদের হাতে নিহত হন। জামাতার পদাভিষিক্ত হলেন নবাব দৌহিত্র সিরাজ। তখন তাঁর বয়স মাত্র পঞ্চদশ বৎসর। সিরাজদৌল্লা বিহারের নাম মাত্র শাসনকর্তা হলেন এবং রাজা জানকীরামের হাতেই শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকল।(১৮) এই পাটনা যাত্রাকালে প্রথম লুৎফউন্নেসার উল্লেখ দেখা যায়। মুতাক্ষরীনে লিখিত আছে 'সিরাজদৌল্লা তাঁহার সহচরী লুৎফউন্নেসাকে সঙ্গে করিয়া গো শকটে আরোহন করিয়া প্রস্থান করেন'।(১৯) লুৎফউন্নেসাকে মোহনলালের ভগিনী ধরে নিলে এই সময় থেকেই মোহনলালের সঙ্গে সিরাজের সখ্য সৃষ্টি হয়েছে মনে করা চলতে পারে। আট বছরের মধ্যে মহারাজ মোহনলাল "had full power in every branch of administration" (২০) অর্থাৎ শাসনযন্ত্রের সকল বিভাগেই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।

সিরাজদৌল্লার সম্ভাব্য মহিষীদের নাম সুতরাং সীমাবদ্ধ হচ্ছে ইরাজ খাঁর কন্যা ওমদাৎ উন্নিসা ও লুৎফউন্নেসার মধ্যে। মুতাক্ষরীণে সিরাজের বিবাহের উল্লেখ একবারই মাত্র পাওয়া যায়। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সিরাজের ১৩ বছর বয়সে মীর্জা ইরাজ খাঁর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ প্রচণ্ড জাঁকজমকে সম্পন্ন হয়।(২১) সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ওমদাৎ উন্নেসাই সিরাজদৌল্লার একমাত্র বিবাহিত মহিষী ও মোহনলালের ভগ্নী লুৎফউন্নেসা তাঁর প্রিয় সহচরী। ওমদাৎ উন্নিসা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। লুৎফউন্নেসা সিরাজের সঙ্গিনী হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন। লুৎফউন্নিসা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি এবার কালানুক্রমিক সাজান যাক।

ক। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে মোহনলালের সিরাজদৌল্লাকে ভগ্নি-দান অথবা বিক্রয় (জারিয়া)।

খ। ১৭৪৮ খৃঃ সিরাজের সহিত শকটারোহনে পাটনা যাত্রা।

গ। ১৭৫৬ খৃঃ ওয়াটস সাহেবের মুক্তির জন্য ওয়াটসের স্ত্রীর অনুরোধে সিরাজদৌল্লাকে আবেদন ও ওয়াটসের মুক্তির প্রচলিত গল্প

ঘ। ১৭৫৭ খৃঃ ২৪শে জুন পলাশীর যুদ্ধের পর কেবল মাত্র একজন বিশ্বস্ত প্রহরী সহ নবাবের সঙ্গে পলায়ন।

—৩০ শে জুন সিরাজ তাঁর সঙ্গী ও সঙ্গিনী সহ ধৃত ও বন্দী।

মীরকাশিম কর্তৃক লুৎফউন্নেসার ধনরত্ন ও অর্থাদি অপহরণ।

—২রা জুলাই গুপ্ত ঘাতকের হাতে সিরাজের মৃত্যু।

—৩রা জুলাই হস্তিপৃষ্ঠে মৃতদেহের নগর ভ্রমণ ও সমাধি।

মঞ্জঃফর নামায় লিখিত আছে যে বেগমদের নিকট জীবিত পাত্র নির্বাচন করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলে লুৎফউন্নেসা সগর্বে উত্তর দিয়াছিলেন—'হস্তিপৃষ্ঠে আরোহনে অভ্যস্ত লোক কোথায় গর্দভবাহন বাঞ্ছা করে?'

—আগষ্ট ঢাকা যাত্রা কন্যা সহ।

ঙ। ১৭৮২ খৃঃ খোসবাগে সিরাজের সমাধি তত্ত্বাবধানে রত। Forester।(২২)

চ। ১৭৮৯ খৃঃ মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি। মুতাক্ষরীণ (২৩)

লুৎফউন্নেসা সম্পর্কে এই সংবাদ গুলির উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন প্রবন্ধের অবতারণা হয়েছে। উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগে ইতিহাসকে উপন্যাসের

মতো মধুর করা হয়েছে।

ওমদাৎ বা উমদাৎ উন্নেসা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ নীরব। সম্প্রতি Calcutta Committee of Revenue এর Proceedings এ উমদাৎ উন্নেসা সম্পর্কে প্রাচীন তথ্য পাওয়া গেছে। দেখা যাচ্ছে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন Board of Directors (Supreme Board) এক পত্রে জানিয়েছেন যে সিরাজদৌল্লার মহিষী ও মীর্জামহম্মদ ইরাজ খাঁর (লেখা হয়েছে আরিজি খাঁ) কন্যা যশোহরের জায়গীর এবং তাঁর স্বামী যে মাসহারা পেতেন তা দাবী করেছেন। কলিকাতা কমিটির মতামত চাওয়া হয়েছে। ১৫ জুন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। Supreme Board এর ১লা আগষ্ট ১৭৮০-র পত্র ৭ই আগষ্টের সভায় লিপিবদ্ধ হয়। এই পত্রে জানান হয়েছে যে উমদাৎ উন্নেসা এবং তার ভগ্নী ইমারী খানুমকে যশোহরে তাদের মৃত পিতা নবাব মহম্মদ ইরিচ খাঁর জায়গীর ভোগ করার অধিকার দেওয়া হল। একমাত্র প্রশ্ন থাকছে ওই "স্বামীর মাসহারা" কথায়। তবে কি উমদাৎউন্নেসা সিরাজদৌল্লার মৃত্যুর পর অন্য কাউকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন? Calcutt Review তে ১৮৯২ খৃঃ বেভারীজ সাহেব শেষ সংবাদ দিচ্ছেন উমদাৎ সম্পর্কে। বেভারীজের মতে উমদাৎউন্নেসা ১০ই নভেম্বর ১৭৯৪ খৃঃ দেহরক্ষা করেন (২৪)।

রাজস্ব দপ্তরের কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে লুৎফউন্নেসা এবং সিরাজদৌল্লার বংশধরদের খবর পাওয়া গেল। দেখা যায় ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল এবং পরিচালক সমিতির সভাপতি (President, Board of Directors) থাকা কালে লুৎফউন্নেসা বেগম তাঁর কাছে এক আর্জি পেশ করেছেন। এই আবেদন করা হয়েছে ঢাকা থেকে। তারিখ ১৪ই জুন, ১৭৭৪ খৃঃ। সম্ভবত পলাশীর যুদ্ধের পর হতে এই সময় পর্যন্ত লুৎফউন্নেসা কন্যা সহ ঢাকাতেই ছিলেন। এই আবেদনের মাধ্যমে অনেকগুলি নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। নাম লেখা হয়েছে লুৎফ-উল-উন্নিসা, সম্ভবত ভুলক্রমে। লুৎফ-উল-উন্নিসা জানাচ্ছেন যে, 'তিনি এবং মৃত নবাব সিরাজদৌল্লার কন্যা এযাবৎ ঢাকার রাজস্ব বিভাগ হতে মাসিক ছয়শত টাকা করে পেতেন। সম্প্রতি চার মাস আগে, মৃত নবাব সিরাজদৌল্লার কন্যা চারিটি শিশুকন্যা রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

ঢাকার রাজস্ব বিভাগ মাসহারা বন্ধ করে দিয়ে জানিয়েছেন যে, যেহেতু অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে (অর্থাৎ নবাব কন্যার মৃত্যু হয়েছে) সুতরাং নূতন আদেশ না আসা পর্য্যন্ত তাঁদের পক্ষে মাসহারা দেওয়া সম্ভব নয়। লুৎফ-উল-উন্নিসার আবেদন যে এই ছয়শত টাকা মাসহারা এই শিশুকন্যাগণের ভরণ পোষণের জন্য তাঁকে নিয়মিত দেবার আদেশ দেওয়া হোক।' ওয়ারেন হেস্টিংস সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার তৎকালীন অধিকর্তা বারওয়েল সাহেবকে লিখেছেন যে কাল-বিলম্ব না করে লুৎফ-উল-নিসা বেগমকে ছয়শত টাকা মাসহারা যেন দেওয়া হয়। এই আদেশ লুৎফউন্নেসার জীবদ্দশায় বহাল ছিল (২৫)। যে চারমাস বাদ গেছে সেই চার মাসের মাসাহরা দেবার জন্যেও হেষ্টিংস ঢাকায় হুকুমনামা পাঠালেন। এই আবেদন থেকে আমরা প্রথম জানতে পারছি যে ঢাকায় সিরাজ কন্যার বিবাহ হয়েছিল এবং তাঁর চারিটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করে। সিরাজ বংশধরদের খুঁজে বার করবার দায়িত্ব ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের ওপর ন্যস্ত করছি। দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল লুৎফউন্নেসা নিজেকে সিরাজদৌল্লার বিধবা বলে পরিচয় দিচ্ছেন না। আবেদনের চেহারা এই রকম 'I and the daughter of Nabob Siraj-ud-daulah used to receive ..' (২৬)মহিমময়ী লুৎফা কি তবে সরকারী আবেদনেও নিজেকে সিরাজ বিধবার মর্যাদা দিতে চাইছেন না ?

এই আর্জির দ্বিতীয় আবেদন এই যে সিরাজের পিতা নবাব জৈনুউদ্দিনের সমাধি পাটনায় অবস্থিত। এই সমাধির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুইটি গ্রামের রাজস্ব দেওয়া হয়েছিল। নবাব সরকার এই দুটি গ্রাম থেকে কোন রাজস্ব আদায় করতেন না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে পুনরায় রাজস্ব আদায় হওয়াতে জৈনুদ্দিনের কবরের রক্ষণাবেক্ষণ বিঘ্নিত হচ্ছে। লুৎফউন্নেসার আবেদন এই যে নবাব জৈনুউদ্দিনের কবরের জন্য গ্রাম দুটিকে পুনরায় রাজস্ব বহীন করা হোক। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তৎক্ষণাৎ পাটনার অধিকর্তা টমাস লেনকে আদেশ দিলেন যে নবাব জৈনুউদ্দিনের সমাধির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রাম দুটিকে যেন রাজস্ব মুক্ত করা হয়। (২৭)

লুৎফউন্নেসা কিভাবে পাটনার খবর পেলেন জানা যায় না। সিরাজের মৃত্যুর পর তিনি কখনও পাটনায় গিয়েছিলেন এমন প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই আবেদন থেকে লুৎফউন্নেসার বিশেষ এক পরিচয় পাওয়া যায়। সেটি হল তাঁর কল্যাণী রূপ। সিরাজদৌল্লার কন্যার সন্তানদের রক্ষা করার আগ্রহ এবং জৈনুউদ্দিনের সমাধি রক্ষার কর্তব্যবোধ এবং তার জন্য স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংসকে পত্র লেখা তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট প্রকাশ। খোসবাগে সিরাজদৌল্লার সমাধির উপরে তাঁর মৃত্যু আপাতদৃষ্টিতে অতিনাটকীয় এবং প্রমাণ সাপেক্ষ তবে লুৎফউন্নেসা বেগমের চরিত্র অনুযায়ী একেবারে অসম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনে লুৎফউন্নিসা নবাবের পত্নী ছিলেন না। নবাব সিরাজদৌল্লাও কখনও তাঁকে বিবাহ করে সম্মানের আসন দেন নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিরাজদৌল্লা মহিষীর সব কর্তব্যই তিনি আমৃত্যু পালন করেছেন। হতভাগ্য সিরাজের জীবনে লুৎফউন্নেসা একমাত্র শান্তির প্রলেপ। বিশেষ ওমদাৎ উন্নেসা ইতিহাসে প্রায় অজ্ঞাত, স্বভাবতই সেই শূন্য স্থান লুৎফউন্নেসা পূর্ণ করেছেন। বস্তুত পরবর্তি যুগের অনেক ঐতিহাসিক বিনা বিচারে স্বাভাবিক নিয়ম অন্তর্গত মনে করে লুৎফউন্নেসাকেই সিরাজের স্ত্রীর সম্মানে ভূষিত করেছেন।

এই দুই মহিলার তুলনামূলক সমালোচনা করে এই প্রবন্ধের ছেদ টানব। ওমদাৎউন্নেসা সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রী। অভিজাত সমাজে তাঁর জন্ম। নবাবের আদরের দৌহিত্রবধূ অতি যত্নে ও আদরে লালিত কল্পনা করা যায়। বিবাহের সময় সিরাজদৌল্লার বয়স তের বছর সুতরাং সমবয়স্ক হলেও ধরে নেওয়া যায় যে অনধিক চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। পিতা ইরাজ খাঁ যশোহরের জায়গীদার ছিলেন। অর্থে ও সম্মানে ওমদাৎ উন্নিসার কিছুই অভাব ছিল না। অভাব ছিল স্বামীর প্রণয়ের। সিরাজ কখনই ওমদাৎ উন্নেসার প্রণয়াবদ্ধ ছিলেন না। বিবাহের তিন বছরের মধ্যে প্রিয় সহচরী লুৎফউন্নেসাকে নিয়ে প্রকাশ্যে পাটনা যাত্রা সেটা স্পষ্টই প্রমাণ করে। ওমদাৎ উন্নেসা সিরাজের মৃত্যুর পর প্রথমে যশোহরে ও পরে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করেন। তিনি পুনরায় বিবাহ করে ছিলেন কিনা জানা যায় না। অন্যদিকে লুৎফউন্নেসা কাশ্মিরী রমণীর অপূর্ব দেহ সৌন্দর্যের অধিকারী। ভাগ্য অন্বেষণে যুদ্ধ ব্যবসায়ী ভ্রাতা মোহনলালের সঙ্গে ১৭৮৪ খৃঃ কিছু পূর্বে বাংলা দেশে

উপনীত হন। নবাব দৌহিত্র সিরাজ তাকে 'ক্রয়' করেন, তাই তিনি 'জারিয়া' হন। এসময় তাঁর কত বয়স ছিল অনুমান করা যায় মাত্র। কাশ্মির থেকে বাংলায় আসার পথে জীবন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লুৎফউন্নেসার হয়েছিল তা পরবর্তী জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। দুঃখের সময় তাকে সংযত থাকতে দেখে তাই অবাক হতে হয়। নবাব সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করা যায় কিন্তু তাঁর মধ্যে ভাবপ্রবণতা ছিল একথা কেউ বলবেন না। সুতরাং একদা হিন্দুকন্যা লুৎফউন্নেসা নবাবের প্রিয়সহচরী হলেও তাঁকে কখনও বিবাহ করে ভার্যার মর্যাদা দেওয়ার কথা চিন্তা করেন নাই। লুৎফউন্নেসা সিরাজের মৃত্যুর সময় হতে ১৭৭৫ খৃঃ পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন এটা স্পষ্ট। পরবর্তী কোন সময়ে মুর্শিদাবাদে তথা খোসবাগে আসেন জানা যায় না। মুতাক্ষরীণে গোলাম হোসেন ১৭৮৯ খৃঃ তার মুর্শিদাবাদ (খোসবাগে) অবস্থিতির কথা লিখেছেন। নবাব পরিবারের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে লুৎফউন্নেসার মন যে কতো সজাগ ছিল তা তাঁর খোসবাগে অবস্থিতি আর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আর্জিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে এই আর্জি খানি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'Petition of Lutfulnissa Begum (Tr.) :—

I and the daughter of Nabob Sorajul Dowlah deceased used to receive six hundred rupees from Dacca. Four months ago the daughter of the Nabob died, and left four little daughters, from that time the mulsuddies have refused to pay the allowance and insisted upon a new order. They have likewise taken away the villages which were given rent free as a burial place of Nabob Zien ud Deen Ahmed Khan at Patna. I pray that an order may be issud to the mulsuddies of Dacca to renew the allowance and another to the mulsuddies of Patna that they may enjoy the villages formerly' (২৮)।

নিঃসন্দেহে বলা চলে লুৎফউন্নেসা সিরাজদৌল্লার মহিষী নন, প্রিয়সহচরী মাত্র। ওমদাৎ উন্নেসাই সিরাজদৌল্লার একমাত্র বিবাহিতা পত্নী।

সূত্র নির্দেশ

১। পলাশীর যুদ্ধ—নবীন চন্দ্র সেন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)
২। সিরাজদৌল্লা—গিরিশ চন্দ্র ঘোষ
বঙ্গে বর্গী— নিশিকান্ত বসু রায়
সিরাজদৌল্লা—শচীন সেনগুপ্ত
সিরাজের স্বপ্ন—বঙ্কিম দাসগুপ্ত
৩। সিরাজদৌল্লা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় পাতা ৪৫
৪। ঐ ঐ পাতা ৩৭৮
৫। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিল নাথ রায় পাতা ১৯৭
৬। ঐ ঐ পাতা ১৮৭
৭। ঐ ঐ পাতা ১৯৪
৮। ঐ ঐ ঐ
৯। বাংলার বেগম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাতা ৩
১০। মূল মুতাক্ষরীণ (সিয়ার উল মুতাক্ষরীণ) সৈয়দ গোলাম হোসেন পাতা ১৮২
১১। সিয়ার উল-মুতাক্ষরীণ (ইংরাজী অনুবাদ) প্রথম খণ্ড পাতা ৬১৪
১২। বাংলার বেগম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাতা ৩
১৩। সিয়ার উল মুতাক্ষরীণ (ইংরাজী অনুবাদ) প্রথম খণ্ড পাতা ৬১৪
১৪। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিল নাথ রায় পাতা ১৯১-১৯৪
১৫। সিরাজদৌল্লা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় পাতা ৭০
১৬। ঐ ঐ পাতা ৭১
১৭। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিল নাথ রায় পাতা ১৮৭
১৮। বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট সংখ্যা ১৬২, জুলাই ডিসেম্বর ১৯৬৭ পাতা ১৪২-১৪৪
১৯। সিরাজদৌল্লা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় পাতা ৪৫
২০। সূত্র (১৮) পাতা ১৪৬
২১। সূত্র (১৩) দ্বিতীয় খণ্ড পাতা ১৭
২২। **Journey from Bengal to England 1781 vol I p 12**
Indian Records series Bengal vol I p CC VIII
২৩। সূত্র (১৩) প্রথম খণ্ড পাতা ৬১৪
২৪। **Calcutta Reveiew 1892 p 204**
২৫। **Proceedings of the Revenue Board of the Whole Council Series I vol III. 14th June 1774 Entry No RBP 5247-8**
২৬। ঐ
২৭। ঐ
২৮। ঐ

বিপিনচন্দ্র পাল ও মহম্মদ আলি ঃ মতান্তর ও তিক্ততা

অমলেন্দু দে

'দি ইংলিশম্যান' ও 'দি কমরেড' পত্রিকার পুরাণো ফাইল থেকে বিপিন চন্দ্র পাল ও মহম্মদ আলির যে-সব প্রবন্ধ আমি সংগ্রহ করেছি, তা থেকে এই দুই নেতার মতান্তর ও তিক্ততার কারণ এখানে আলোচনা করা হল। এই বিষয়ে কোন আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসর শহরে কংগ্রেস অধিবেশনে এই দুই নেতার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। মহম্মদ আলি ও শৌকত আলি বেতুল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা এই অধিবেশনে আসেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ মহম্মদ আলির রচনায় পাওয়া যায়। ভারতীয় সমস্যা নিয়ে চিন্তাশীল রচনার জন্য ও একজন প্রথম শ্রেণীর বক্তারূপে বিপিন চন্দ্র পালের নাম অনেকদিন থেকেই মহম্মদ আলির কাছে পরিচিত ছিল। আর মহম্মদ আলিও একজন প্রভাবশালী নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত। বিপিন পাল অমৃতসরে তাঁকে দেখে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। সেখানে দুজনে একসাথে চলেন মহাত্মা গান্ধীর সংগে লোকমান্য তিলক ও দেশবন্ধু দাসের যোগসূত্ররূপে তাঁরা দুজনে সক্রিয় ভাবে এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন।[১] এই সময়ে মহম্মদ আলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বিপিন পালের 'মুসলিম-বিরোধী' প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। মহম্মদ আলির মনে হয়েছে যে, বিপিন পালের মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যাঁর ইউরোপ ও সেখানকার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, কি করে Super-nationalism of Islam সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের মতই বিকৃত ব্যাখ্যা করেন।[২] এই প্রশ্নে বিপিন পাল বেশ বিব্রত হন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন না করে বলেন, ভুল বোঝাবুঝির ফলেই এই ধরণের মতামত তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাই এই বিষয় নিয়ে মহম্মদ আলিকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে

না। অবশ্য মহম্মদ আলি এই উত্তরে সন্তুষ্ট হন নি।[২] আর তাঁদের মধ্যে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি। এক মাসের মধ্যেই মহম্মদ আলি ভারতীয় খিলাফত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা করেন। তুর্কি সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি পরিবর্তনের জন্য লয়েড জর্জের কাছে এই প্রতিনিধিবৃন্দ দাবী-পত্র পেশ করেন। অবশ্য তাতে ইংরেজ সরকারের মনোভাব পরিবর্তিত হয় নি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের স্পেশ্যাল অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এবং মৌলানা শৌকত আলি ও খিলাফত কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় 'অসহযোগ' বিষয়ক বিখ্যাত প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন মহাত্মা গান্ধীর যাঁরা বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু দাস, বিপিন পাল, অ্যানি বেসান্ত, মালবিয়া, জিন্না ও আরও অনেকে। এই অধিবেশনের পরেই মহম্মদ আলি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন।[৩]

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের নিয়মিত অধিবেশন বসে। এখানেই কলকাতার স্পেশ্যাল অধিবেশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে হয়। দেশবন্ধু দাস মত পরিবর্তন করে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যোগ দেন। তাই নাগপুর অধিবেশনে এই সব প্রস্তাব সহজেই গৃহীত হয়। হঠাৎ দেশবন্ধু দাসের এই সিদ্ধান্তে অনেকেই হতভম্ব হয়ে পড়েন। মহম্মদ আলির প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, এই সময়ে গান্ধী-দাস মৈত্রীর পেছনে তাঁরও কিছুটা অবদান ছিল। উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় তাঁকে বিশেষ দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।[৪] যে কয়জন মুষ্টিমেয় সদস্য নাগপুর অধিবেশনে 'অসহযোগ' সম্পর্কীয় প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মালবিয়া, অ্যানি বেসান্ত, জিন্না ও বিপিন পাল। মহাত্মা গান্ধীকে সমর্থন করায় দেশবন্ধু দাসের বিরুদ্ধে বিপিন চন্দ্র পাল ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তিনি একটানা কয়েকবছর ধরে (১৯২০-২৫) অনেক প্রবন্ধে দেশবন্ধু দাসের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করেন। তখন থেকেই দেশবন্ধু দাস ও বিপিন পাল ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। দেশবন্ধু দাসের বিরুদ্ধে বিপিন পালের রচনা 'ইংলিশম্যান' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৫] এই কাগজটি সরকার পক্ষের মুখপত্র ও কংগ্রেস-বিরোধী ছিল। কলকাতার ৯নং হেয়ার স্ট্রীট থেকে এই দৈনিক কাগজ প্রকাশিত হত। এই কাগজে প্রকাশিত রচনাবলী থেকে

বিপিন পালের তৎকালীন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা যায়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর বিপিন পাল যে-সব মন্তব্য করেন তাতেই মহম্মদ আলির সঙ্গে তাঁর বিতর্ক ও তিক্ততার সূত্রপাত হয়। তাই প্রথমেই বিপিন পালের বক্তব্য বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। তিনি 'ইংলিশম্যান' কাগজে 'ভারতীয়ের চোখে' (Through Indian Eyes) এই শিরোনামায় প্রবন্ধ লেখেন। দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর খবরে মহাত্মা গান্ধী গভীর বেদনা অনুভব করেন। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন, দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুতে বাংলা দেশ বিধবার রূপ ধারণ করেছে। দেশবন্ধুকে তিনি অনেক যুদ্ধের বীর বলে সম্মানিত করেন। তাঁর মৃত্যুতে মহাত্মা গান্ধী নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গবোধ করেন।[৬] এই শোকবার্তায় গভীর বেদনার প্রকাশ থাকলেও বিপিন পাল তাতে খুশি হতে পারেন নি। তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে জাতীয় আন্দোলনে দেশবন্ধু দাস ও মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা আলোচনা করেন।[৭] এই প্রবন্ধে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। বিপিন পাল লেখেন, দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তৎপর হন। অন্য প্রদেশে একাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলেও বাংলা দেশ দেশবন্ধুর শূন্য আসনে মহাত্মা গান্ধীকে বসাতে সম্মত হবে না। তিনি একজন ঋষি হতে পারেন। হয়তো বহুলোকের কাছে তাঁর প্রভাব ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহের কোন কারণ নেই তবুও সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে দেশবন্ধু দাস মহাত্মা গান্ধী থেকে শুধু পৃথক নন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর তুলনায় অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ। মহাত্মার মত 'নিষ্প্রভ' ব্যক্তির পক্ষে বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবিদের উৎসাহিত করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি দেশবন্ধু দাসের মত আত্মত্যাগীও নন। এই মহান আত্মত্যাগের জন্যই দেশবন্ধুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রতি বাঙ্গালীরা এতটা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। আবেগ-প্রবণ বাঙ্গালীর কাছে এই 'নিরুত্তাপ ঋষি' কোনই সাড়া জাগাতে পারবেন না। কেবলমাত্র দেশবন্ধুর জন্যই মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনে স্থান পেয়েছেন। আর বাংলাদেশে গান্ধী আরাধনার প্রবর্তকও ছিলেন তিনি। দেশবন্ধুর বিদ্রোহের সংগে সংগে 'অসহযোগ আন্দোলনে' বাংলাদেশের

সমর্থন লাভে মহাত্মা গান্ধী বঞ্চিত হন। তারপর তিনি দেশবন্ধুকে অবলম্বন করেই এখানে তাঁর প্রভাব বজায় রাখতে তৎপর হন। দেশবন্ধুর অবর্তমানে স্বরাজ্যদলের সদস্যরা যদি নিজেদের অসহায় মনে করেন এবং মহাত্মার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করেন, তবে এই দলের পুনর্জীবন ও পুনর্গঠন তো হবেই না, তাঁদের ধ্বংস অনিবার্য।[৮]

তারপর বিপিন পাল বলেন, বাংলা দেশ কখনই গান্ধী মতবাদকে গ্রহণ করেনি। পুরানো ও পরিচিত 'বয়কট' আন্দোলনরূপেই অসহযোগ আন্দোলনকে বাঙ্গালীরা মনে করেন। একেবারেই প্রতিরোধ না করার নীতি বেশীরভাগ বাঙ্গালীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মনোভাবের সংগে খাপ খায় না। আত্মা সম্পর্কে গীতার তত্ত্বকে ভিত্তি করেই বাংলাদেশে 'বোমা' ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করা হয়। আত্মা যেমন কাউকে বধ করতে পারে না, তেমনি আত্মার বিনাশও নেই। গীতার মূল কথাই হল তাই। মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত অহিংসা নীতির সংগে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের কোনই যোগ নেই। ঈশ্বর কি তাঁর জীবকে হত্যা করেন না? কিন্তু কোন ক্রোধ বা ঘৃণার বশে ঈশ্বর বিনাশ করেন না, ভালোবাসার বশে, ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে নয়, রক্ষার জন্য। হিন্দুধর্মে মানবাকারে আবির্ভাবের তত্ত্বে একথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দুদের বিশ্বাস, যারা প্রতিশোধকামী ঈশ্বরের হাতে নিহত হয় তারা সোজা চিরশান্তির রাজ্যে চলে যায়।[৯]

কেন বাঙ্গালীরা অহিংসা নীতির বিরোধী তা ব্যাখ্যা করে বিপিন পাল মন্তব্য করেন, সার্বজনীন হিন্দু-বিশ্বাসের সংগে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার কোনই মিল নেই। তাঁর মতবাদ সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিরোধী। বাংলার বিপ্লবীরা এই নীতিকে মেনে নেননি। এমন কি বাংলার মডারেটরাও রাজনৈতিক কারণে সম্পূর্ণভাবে অহিংসানীতিকে গ্রহণ করেননি। হিংসা পাপ, কারণ এর সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। বিপ্লবের মতই, ব্যর্থ বিপ্লবী চিন্তাধারা অপরাধ বলে গণ্য হয়। কিন্তু যদি তা সফল হয়, তবে তা আর অপরাধ হবে না, গুণরূপে গৃহীত হবে।

বাংলার মডারেটরা বিপ্লবীদের নিন্দা করলেও একথা স্বীকার করেন যে, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যাকারীরাই মিণ্টো-মর্লে সংস্কারের পথ সুগম করেন।

সুতরাং বাংলা দেশের রাজনীতিবিদেরা—মডারেট ও চরমপন্থী—মনোভাবের দিক থেকে মহাত্মাগান্ধীর অহিংসা নীতির বিরোধী ছিলেন। যদি মহাত্মা গান্ধী 'দেশবন্ধুর গদি' দখল করতে সফলকাম হন তবে নতুন জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই বাংলা দেশের কর্তব্য হল সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে বাংলার রাজনীতিতে 'আসন্ন বিদেশী আক্রমণ' প্রতিরোধ করা।১০ এখানে 'বিদেশী আক্রমণ' বলতে বাংলা দেশে মহাত্মা গান্ধীর প্রাধান্য স্থাপনের কথাই বিপিন পাল উল্লেখ করেন।

আর একটি প্রবন্ধে (১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই লিখিত) বিপিন পাল রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি আলি ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন।১১ বিপিন পালের মতে, বর্তমান জাতীয় রাজনীতির অনিষ্টের মূল হল স্বচ্ছ চিন্তাধারার অভাব। সম্প্রতি অরবিন্দ ঘোষও একথা বলেন। গত পাঁচ বছরে ইচ্ছাকৃতভাবে 'চিন্তাকে' বিনাশ করা হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে নতুন মত ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। জাতীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হল 'স্বরাজ' অর্জন করা। কিন্তু মহাত্মা এই 'স্বরাজের' কোন সংজ্ঞা নিরূপন করেন নি। তিনি কাউকে তা করতে দেন নি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর বাড়ীতে মহম্মদ আলির সংগে আলাপ-আলোচনার সময় বিপিন পাল জানতে পারেন যে, 'স্বরাজ' শব্দের সংজ্ঞা নিরূপন এই কারণে করা হয়নি, যে-মুহূর্তে তা করার চেষ্টা হবে তখনই কংগ্রেসের ঐক্য ভেঙ্গে পড়বে। নাগপুর সম্মেলনে বিপিন পাল গান্ধীর প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাতে তিনি 'স্বরাজ' শব্দের আগে 'গনতান্ত্রিক' শব্দ জুড়ে দিতে চান এবং ইংরেজিতে তার অর্থ করেন 'পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার' (full responsible government)। দেশবন্ধু দাস তাঁর প্রস্তাব সমর্থ করেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। সেই সময়ে তিনি বুঝতে পারেন ভারতীয় রাজনীতির ক্লান্তিকর হতবুদ্ধিতা। একজন প্রখ্যাত 'অসহযোগপন্থী' নেতা তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, বর্তমান বিদেশী আধিপত্যের পরিবর্তে প্রয়োজন হলে রণজিৎ সিংহের মত একজন স্বৈরতান্ত্রিক শাসককেও তাঁরা সংবর্ধনা জানাবেন। নাগপুর

অধিবেশনে এই ভাষণ অভিনন্দিত হয়। তাই বিপিন পাল মন্তব্য করেন, যাঁরা 'পৈশাচিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে' (Satanic British Empire) ধ্বংস করতে চান তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন এই ভাষণ থেকেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।১২

বিপিন পালের মনে হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবেই জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়নি। সমগ্র অসহযোগ আন্দোলনকে যেভাবে অসচ্ছ চিন্তাধারার আবরণে আচ্ছাদিত করা হয়েছে তা আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মত চতুর রাজনীতিবিদেরা উপলব্ধি করতে পারেননি, তা তাঁর মনে হয়নি। তাঁর মতে, আলি ভ্রাতৃদ্বয় ব্রিটিশ সরকারের ধ্বংসসাধনেই কেবলমাত্র আগ্রহশীল। ভবিষ্যতে নিজের পথ করে চলবে। অবশ্য তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁরা কখনই গোপনীয়তা অবলম্বন করেন নি। তাঁদের আদর্শ রাজনৈতিক নয়, মূলতঃ Theocratic। ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী রাজ্যশাসন করাই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'জাতীয়তাবাদী' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে কোন মতেই 'জাতীয়তাবাদী' বলা চলে না। কারণ প্রথমে তাঁরা হলেন মুসলমান, পরে ভারতীয়। তাঁদের দেশপ্রেম ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়, extra-territorial. অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলোর চিন্তা-ভাবনা ও স্বার্থের সংগে সম্পৃক্ত। 'জাতীয়তাবাদ' ও 'দেশপ্রেম' শব্দ দুটোর যে নতুন সংজ্ঞা নিরূপন করেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় তা খুবই অস্বাভাবিক। এ শুধু ইতিহাস অগ্রাহ্য করা নয়, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ অবমাননা করাও। তাই বিপিন পাল বলেন, জাতীয়তাবাদ এবং ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল দেশপ্রেম (extra-territorial patriotism) পরস্পর একসংগে চলতে পারে না। এই extra-territorial patriotism থেকে প্যান ইসলাম মতবাদের (Pan Islamism) উদ্ভব। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, এককালের সমৃদ্ধশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের যা কিছু সামান্য অবশিষ্ট আছে তা সংরক্ষণ করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করেই এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তাই। সুতরাং তাঁদের দেশপ্রেম জাতীয়তা-বিরোধী।১৩ স্বভাবতই ভারতীয় প্যান ইসলামিস্টরা ভারতের রাজনৈতিক গোলযোগের আশু ও শান্তিপূর্ণ সমাধান

সম্পর্কে মোটেই আগ্রহশীল নন। ব্রিটিশ রাজমুকুটের পরিবর্তে প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনেও তাঁদের কোন উৎসাহ নেই। আলি ভ্রাতৃদ্বয় আশা পোষণ করেন, এইভাবে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতে থাকলে সমগ্র দেশে বিপ্লব দেখা দেবে। তখন তাঁদের সুযোগ হবে ভারতবর্ষে প্রাধান্য স্থাপন করার। ইংরেজ শাসন থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হলে তাঁদের স্বপ্ন সফল হবে। ভারতবর্ষে তখন নতুন খলিফার বিজয় পতাকা উড়বে।[১৪]

বিপিন পাল বলেন যে, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের এই জাতিয়তা-বিরোধী প্রচারের গুরুত্ব যাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন তাঁদের পক্ষে এই মতবাদের পরিণতির দিকে চোখ বুজে থাকা সম্ভব নয়। তাঁদের মনে সন্দেহ হবে একথা ভেবে যে, বিশেষ অভিসন্ধি থাকার ফলে 'স্বরাজ' শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণে প্রবলভাবে বাধা দেওয়া হয়। এই কারণে জনসাধারণের ধ্যান-ধারণার একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরা দরকার। একথা মনে রাখা দরকার ব্রিটিশ সমরাস্ত্ররাগী ব্যক্তি ও ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা ছাড়াও ভারতবর্ষে এমন ধরণের ব্যক্তিরাও আছেন যাঁরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী। তাঁরা ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষ জিইয়ে রাখতে চান। স্বভাবতই তাঁরা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আদর্শের বিশদ বিশ্লেষনের পক্ষপাতী নন। কারণ ভারতের রাজনৈতিক কর্মীরা যদি একবার 'স্বরাজ' শব্দটি জনসাধারণের প্রয়োজনে জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সরকার (government of the people, by the people and for the people) এই অর্থে বুঝে ফেলেন তবে তাঁরা ভারতীয় বুর্জোয়াদের শোষণ ও প্যান ইসলামিস্টদের প্রতি যে বিমুখ হবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১৫]

বিপিন পাল এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান ভারতের প্রকৃত সমস্যা জানতে হলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার, আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ এখনও অনুভূতির পর্যায়ে (stage of intellection) আছে। অসংখ্য মানুষ কাজের (action) কথা বলেন। তাঁরা এখন 'ব্যবহারিক ও গঠনমূলক কার্যক্রমের' (practical programme and

constructive programme) দাবী করেন। কিন্তু তাঁরা একথা চিন্তা করেন না, আমরা কি গড়তে যাচ্ছি বা গঠন করব, এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে, কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে না। এজন্য 'স্বরাজের' সঠিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বর্তমানে সংগঠন (organisation) গড়ে তোলার দাবীকে মস্তবড় গঠনমূলক কাজ বলে গন্য করা হচ্ছে। বিপিন পাল প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কি উদ্দেশে আমরা সংগঠিত হব, এ বিষয়ে কোন স্বচ্ছ ধারণা কি আমাদের আছে? বলা হয়, বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য মজবুত-সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। স্বরাজ্য পার্টির উদ্দেশ্য হল ভারতীয় আইন সভাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। কিন্তু স্বরাজ্য পার্টির নেতৃবৃন্দ ও অনুগামীরা কখনই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি যে, বর্তমান শাসনযন্ত্র অকার্যকরী হলে তার পরিবর্তে অন্য কি ব্যবস্থা হবে, অথবা আইনসভার শক্তি নষ্ট করলেই কি আমরা 'স্বরাজ' অর্জন করতে পারব। এ সব প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে বিপিন পাল সিদ্ধান্ত করেন, মূল সমস্যা সম্পর্কে কারও চিন্তাধারা পরিচ্ছন্ন নয়। তাই তাঁর মতে, এই অবস্থায় বর্তমানে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য সংগঠনের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন হল শিক্ষার এবং রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তাধারা প্রচারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের। এ পথেই 'স্বর্গীয় গণতন্ত্রের' (Divine Democracy) প্রাচীন ভাবধারাকে উর্ধে তুলে ধরা সম্ভব।[১৬]

মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে 'স্বরাজ' শব্দের সংজ্ঞা উল্লেখ না করা হলেও, পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী ও স্বরাজ্য পার্টির নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে 'আত্মশাসিত ডোমিনিয়ন স্টেটাস' (a self-governing Dominion Status) অর্থে 'স্বরাজ' শব্দের প্রচলন হয়। অর্থাৎ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভূক্ত স্বরাজের দাবী করা হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতার' অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করা হয় নি। এমন কি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দেশবন্ধু দাস যে-বিবৃতি দেন তাতেও এর উল্লেখ এভাবেই আছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বরদৌলির সিদ্ধান্তের পর কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি অংশ, বিশেষ করে দেশবন্ধু দাস ও মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধীর নীতির সমালোচনা করেন। এই মত পার্থক্যের পরিণতি হল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ্য পার্টির প্রতিষ্ঠা। এই পার্টি

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা ও আইনসভার অভ্যন্তরে সংগ্রাম পরিচালনা করার পক্ষপাতী ছিল। অবশ্য এই পার্টি কংগ্রেসের মধ্যেই থাকে, আর কংগ্রেসের 'অহিংস অসহযোগ' নীতি সমর্থন করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে 'স্বরাজ' অর্জন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। উল্লেখ করা দরকার, দেশবন্ধু দাস ও মতিলাল নেহরু 'আত্মশাসিত ডোমিনিয়ন স্টেটাস' দাবী করলেও, তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে একটা অংশ 'পূর্ণ-সার্বভৌম-স্বাধীনতা'র (absolute Sovereign independence) দাবীকে পার্টির মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে ঘোষণা করতে চান। এই দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মতিলাল নেহরু একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, 'আত্মশাসিত ডোমিনিয়ন স্টেটাসের' দাবী হল তাঁদের পার্টির 'আশু' (immediate) উদ্দেশ্য। এই 'আশু' (immediate) শব্দ যোগ করে তিনি অনুগামীদের শান্ত করেন। বিতর্ক অবসানের প্রয়োজনেই এই শব্দটি যুক্ত করা হয়।১৭ এই শব্দটি গ্রহণ করায় বিপিন পাল দুর্ভাবনা প্রকাশ করেন। তাঁর কাছে এই শব্দটি অশুভ বলেই মনে হয়েছে। কারণ 'আত্মশাসিত ডোমিনিয়ন স্টেটাস' অর্জনের পর ব্রিটিশ কমনওয়েলথের জাতিসমূহের মধ্যে সমান অধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের শক্তি সংহত না করে ভারতীয়রা এর বাইরে চলে যাবার জন্য তৎপর হবে। এই প্রস্তাবের অর্থ হল তাই। বিপিন পাল লেখেন, এই মনোভাব প্রকাশ করায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কখনই সমান অধিকার ও সম্মানজনক সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহান্বিত হবে না।১৮ এই অবস্থায় এই অশুভ বিশেষণটি (অর্থাৎ আশু বা immediate শব্দ) স্বরাজ্য পার্টির প্রোগ্রাম থেকে বাদ দেওয়া উচিত। তা না হলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতের জন্য পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব হবে না। ভারতের জাতীয়তাবাদীদের সাথে ইন্দো-ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। স্বরাজ্য পার্টির নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্যেই ঘোষণা করা উচিত যে, তাঁরা আনুগত্য প্রকাশ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে যাবেন যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ শাসন ভারতীয়দের স্বায়ত্বশাসন ও আত্মোন্নতির পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।১৯ এই পথ অনুসরণ করলে স্বরাজ্য পার্টির সাথে জাতীয়তাবাদী

গ্রুপ, লিবারেল ও ইণ্ডিপেনডেণ্টদের মৈত্রী স্থাপিত হবে তা না হলে, তাঁদের সংগে কেবলমাত্র মৌলানা হাসরাত মোহানীর অনুগামী অথবা দেশ-প্রেমিক বিপ্লবীদের সংযোগ থাকবে।২০

প্রশ্ন হল, কিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে দায়িত্বশীল সরকার ভারতবর্ষে স্থাপন করা যাবে? বিপিন পাল এই সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেন। তাঁর মতে, দায়িত্বশীল সরকার হল নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি দায়িত্বশীল আইনসভা কর্তৃক পরিচালিত সরকার। তাদের অপসারণ করবার ক্ষমতাও থাকবে এই নির্বাচকমণ্ডলীর। যে 'স্বরাজে'র কথা ভাবা হচ্ছে তার ভিত্তি হবে এই নির্বাচকমণ্ডলী। পরবর্তীকালে এই নির্বাচকমণ্ডলী সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। অবশ্য এখনই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। তবুও এই অধিকার অর্জন করাই হবে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য।২১ একথা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের দেশ এখনও উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উপযোগী হয় নি। তাই বর্তমানে অবিলম্বে 'স্বরাজ' অর্জনের পথে এই চূড়ান্ত উদ্দেশের কথা মনে রাখতে হবে। এখনই আমাদের যা প্রয়োজন তা এই নয় যে, বিদেশী শাসনের পরিবর্তে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা দরকার যার ফলে ভবিষ্যতে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনসাধারণের উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়, কোন শ্রেণী বা গ্রুপ যেন ক্ষমতা দখল করতে না পারে। একথা পরিষ্কার করে উপলব্ধি করলে বর্তমানে আমলাতন্ত্রের হাত থেকে যে-কোন উপায়ে, ষড়যন্ত্র করে বা প্রতারণা করে, সৎ বা অসৎ পথে, ক্ষমতা কেড়ে নেবার প্রয়োজন হবে না। ধৈর্যসহকারে পরিশ্রম করে জনসাধারণকে শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেবার জন্য প্রস্তুত করাই হবে প্রধান কাজ। 'শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী' (educated constituency) ছাড়া কখনই প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না। তাঁরাই কেবলমাত্র সচেতনভাবে ভোট দিতে সক্ষম এবং সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে। তাই বিপিন পাল 'শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলীর' প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।২২

একথাও তিনি বলেন, যতই আমরা বিদেশী শাসনের জন্য অধৈর্য হই না কেন, একথা কি আমরা বলতে পারি বর্তমান ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী দায়িত্ব-

শীল সরকারের গুরুদায়িত্ব বহন করতে সক্ষম? জনসাধারণের কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক্। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভাবধারায় দীক্ষিত নন। এই অবস্থায় প্রথমে জনসাধারণকে গ্রামীন শাসনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সংগে পরিচিত করানো দরকার। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসিত গ্রাম্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই এ্যানি বেশান্ত 'ইণ্ডিয়া বিল' নামক খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান। কিন্তু এই অজুহাতে তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয় যে, গ্রামের কাউন্সিলে ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণরা একসংগে বসতে সম্মত হবে না। বিপিন পাল মন্তব্য করেন, এই যদি দেশের অবস্থা হয় তাহলে 'দিল্লী তো অনেক দূরে'। যেখানে সমাজব্যবস্থা বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ে এমনভাবে শতধা বিভক্ত হয়ে আছে সেখানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দেশে কোন গঠনমূলক নেতৃত্ব নেই। 'ষড়যন্ত্র' ও 'কূটনীতি' প্রয়োগ করে কিভাবে দ্রুত ফল পাওয়া যায় সেদিকেই সকলের লক্ষ্য। সার্বজনীন মঙ্গলের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কোন আদর্শ ও নীতিবোধ সামনে না রেখে জনসাধারণকে পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশের অবস্থা সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। এই অবস্থায় যাঁরা একবছরে বা একযুগে বা কুড়ি বছরের মধ্যে 'স্বরাজ' অর্জনের কথা বলেন, তাঁরা যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ নন ও বিবেক বুদ্ধিবর্জিত, তাই প্রমাণিত হয়েছে।২৩

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে বিপিন পাল 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ লেখেন তা পড়ে মহম্মদ আলি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তাঁর 'দি কমরেড' কাগজে বিপিন পালের সমালোচনার উত্তর দেন। এই সাপ্তাহিক কাগজ দিল্লী থেকে প্রকাশিত হত, মহম্মদ আলি ছিলেন সম্পাদক। প্রথমে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে বিপিন পাল যে মন্তব্য করেন সে বিষয়ে মহম্মদ আলি কি অভিমত পোষণ করেন, তা আলোচনা করা যাক। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর অধিবেশন থেকেই বিপিন পাল ও মহম্মদ আলির মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। তাঁর কাগজে মহম্মদ আলি

নাগপুরে দেশবন্ধু দাসের মত পরিবর্তন ও আত্মত্যাগের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, সম্ভবত দাসের বিরোধীদের মধ্যে একজন এখনও তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করেননি। মহম্মদ আলি যে বিপিন পালের কথা বলেন তা প্রবন্ধ পাঠ করলেই বোঝা যায়। কিন্তু এই মতান্তর তখনও তিক্ততায় পর্যবসিত হয়নি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধীকে যেভাষায় বিপিন পাল আক্রমণ করেন তা মহম্মদ আলির কাছে 'লজ্জাকর' বলে মনে হয়েছে।২৪ এই সময়ে মহম্মদ আলি যেসব মন্তব্য করেন তাতে বিপিন পাল খুবই অস্বস্তিবোধ করেন। মহম্মদ আলি লেখেন, যাঁরাই মহাত্মা গান্ধীর সুন্দর অনুভূতির সংগে পরিচিত তাঁরা সবাই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধী প্রেরিত শোকবার্তায় গভীরভাবে বিচলিত হন। তিনি আসাম ভ্রমন বাতিল করে বাংলা দেশের প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যতদিন পর্যন্ত স্বরাজ পার্টির অনুগামীরা বাংলা দেশে তাঁর উপস্থিতিও সেবা প্রয়োজন মনে করবে ততদিন তিনি সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনায় এমন একটি মহৎ মনের পরিচয় পাওয়া যায় যিনি সব সময় অপরের জন্য চিন্তা করেন। একজন অসহযোগপন্থীরূপে মহম্মদ আলির মনে হয়েছে, যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে পারেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, তাঁদের প্রকৃতস্থান কোথায়। নাগপুরে দেশবন্ধু দাসের সিদ্ধান্তের পর বিপিন পাল কলকাতার 'ইংলিশম্যান' কাগজে যোগ দেন। আর তিনিই এই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন, মহাত্মা গান্ধী যদি দেশবন্ধু দাসের 'গদি' দখল করেন তাহলে কি হবে। আর বিপিন পাল একথাও বলেন, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মহাত্মা গান্ধীকে বাধা দেওয়া দরকার যাতে তিনি বাংলা দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার না করতে পারেন। এই গান্ধী-বিরোধিতা মহম্মদ আলি কর্তৃক ধিকৃত হয়। এই সময়কার মহম্মদ আলির রচনাবলী পাঠ করলে দেখা যায়, তিনি ইসলাম-বিরোধী ও গান্ধী-বিরোধী লেখকদের নির্ভয়ে সমালোচনা করেন।২৫ প্রসঙ্গত তিনি 'দি টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার' লেখকের সংগে বিপিন পালের তুলনা করেন। এই কাগজের একজন লেখকের,

যিনি নিজের নাম গোপন রাখেন, পবিত্র কর্তব্য হল ভারতবর্ষের যা কিছু ভালো তারও সমালোচনা করা। কিন্তু 'আত্মপ্রচারে অভ্যস্ত' বিপিন পাল নিজনামে, 'ইংরেজের নীল চোখে' 'ইংলিশম্যান' কাগজে প্রবন্ধ লেখায় কোন সংকোচবোধ করেন না।২৬

তারপর আলি ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে বিপিন পালের অভিযোগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন মহম্মদ আলি। ওরা জুলাইয়ের বিপিন পালের প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে উভয় নেতার মধ্যে পত্রালাপ হয়। এই প্রবন্ধের খবর পেয়ে মহম্মদ আলির নির্দেশে তাঁর একজন সহকারী বিপিন পালকে একটি পত্রে প্রবন্ধের কপি পাঠাতে বলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১১শে জুলাই এই পত্র পাঠানো হয়। মহম্মদ আলির ধারণা 'ইলিংশম্যান' এর কপি পাঠিয়ে দেবার জন্য নিজে বিপিন পালকে পত্র না লিখে তাঁর সেক্রেটারীকে দিয়ে পত্র পাঠানোর ফলে এবং ২৬শে জুনের 'কমরেড' কাগজে প্রকাশিত তাঁর অভিমত পড়ে বিপিন পাল ক্ষুব্ধ হন তাই তাঁর পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালকে দিয়ে যে পত্র মহম্মদ আলির সেক্রেটারীর কাছে পাঠান তাতে উল্লেখ করা হয় যে, মহম্মদ আলির সৌজন্যবোধ থাকলে অথবা সত্য ঘটনা জানবার ইচ্ছা থাকলে 'ইংলিশম্যান' কাগজে যোগ দেবার বিষয় নিয়ে বিপিন পালের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা কথা লিখতেন না।২৭ 'ইংলিশম্যান'-এর ফাইল থেকেই এই কুৎসা ধরা পড়বে। বরিশাল প্রদেশ কনফারেন্সের কয়েকমাস পরে স্বরাজ্য পার্টির অনুগামীরা অথবা অসহযোগপন্থীরা বিপিন পালের নীতি ও আদর্শ, যা তিনি সভাপতির ভাষণে ব্যক্ত করেন, তার বিরোধিতার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। তখন বিপিন পাল তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করবার প্রয়োজনে 'ইংলিশম্যান' কাগজে লিখতে আরম্ভ করেন। এই কাগজই আগ্রহ সহকারে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত করে। কলকাতার অন্য কোন কাগজ বিপিন পালকে এই সুযোগ দিতে চায়নি। যদি মহম্মদ আলি 'ইংলিশম্যান' কাগজে প্রকাশিত বিপিন পালের স্বাধীন মতামত, যা অনেকক্ষেত্রে কাগজের মতের বিপরীত, পাঠ করতেন তবে এই মিথ্যা অভিযোগ দ্রুত ছাপাতেন না একে নিশ্চয়ই সৎ সাংবাদিকতা বলে না। অন্তত বিপিন পালের তাই ধারণা। তাঁর সংগে মহম্মদ আলির মতপার্থক্য আছে। তাছাড়া 'স্বরাজ' ও 'জাতীয়তাবাদ'

সম্পর্কে মহম্মদ আলির মতেরও প্রকাশ্য সমালোচনা বিপিন পাল করেন। তবুও তিনি কখনও মহম্মদ আলির মত ব্যক্তিগত চরিত্র হননের পথ গ্রহণ করেননি। আজ যদি দেশবন্ধু দাস জীবিত থাকতেন, বিপিন পালের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও, তিনিই প্রথম বিক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁর বন্ধুর বিরুদ্ধে, যাঁর সংগে তাঁর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল, এই হীন অভিযোগ অস্বীকার করতেন। বিপিন পালের রাজনৈতিক মত বা প্রচার কখনই সরকারী বা বে-সরকারী অর্থদ্বারা সহায়তা করা হয়নি। অবশ্য এও তিনি আশা করেন না যে, ভিন্ন আদর্শ ও জীবনে বিশ্বাসীরা একথা উপলব্ধি করবেন। ২৭শে জুলাই জ্ঞানাঞ্জন পাল এই চিঠি লেখেন। তিনি মহম্মদ আলির সেক্রেটারীকে একথাও এই পত্রে জানিয়ে দেন যে, তাঁর ২২শে জুলাইয়ের পত্র 'ইংলিশম্যান'-এর ম্যানেজারের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহম্মদ আলির আচরণে বিপিন পাল যে দুঃখিত হন, তাও জ্ঞানাঞ্জন পালের পত্রে জানা যায়।২৮

মহম্মদ আলি তাঁর প্রবন্ধে বিপিন পালের প্রবন্ধ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দেন। বিপিন পাল 'extra-territorial patriotism-এর কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু এই বিশেষ শব্দ মহম্মদ আলির আবিষ্কার নয়। মিঃ মন্টেগু যখন আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ছিলেন তখন তিনি হাউস অব কমনসে বিতর্কের সময় ভারতীয় মুসলমানদের 'extra-territorial patriotism' পরিহার না করেও তার সংগে 'territorial patriotism'-এর কিছু উপকরণ যুক্ত করতে বলেন। সুতরাং এই শব্দগুলো মন্টেগু ব্যবহার করেন।২৯

'প্যান ইসলামিজম্' সম্পর্কে বিপিন পাল যে সব কথা মহম্মদ আলির বলে উল্লেখ করেন তা তাঁর নিজের বক্তব্য নয়। মহম্মদ আলি লেখেন, তিনি 'ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্ববোধে' (Islamic Brotherhood) বিশ্বাসী। আর তাই হল ইসলাম। এই 'ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্ববোধ' অর্থেই প্যান ইসলাম মতবাদ তিনি সমর্থন করেন।৩০ তাছাড়া তিনিও জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। সেখানে ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোন শোষণ থাকবে না। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের কেউ

যদি পরাজিতের মনোভাব নিয়ে, সুযোগের সন্ধানে থেকে, অপহৃত সাম্রাজ্য গড়ে তুলবার দিবা-স্বপ্নে মশগুল থাকেন, তাঁদের সংগে মহম্মদ আলির মতের কোনই মিল নেই। স্বভাবতই বিপিন পালের এই অভিযোগ তিনি অগ্রাহ্য করেন।৩১

কিন্তু বিপিন পালের মত অনন্তকালধরে 'গণতান্ত্রিক স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য শ্বেত আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করতে মহম্মদ আলি রাজী নন। 'ইংলিশম্যান' কাগজের মাধ্যমে বুর্জোয়া ব্যবস্থা (যা বিপিন পাল সমালোচনা করেন) ছাড়া অন্য কোন কিছু করা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। বিপিন পালের এমন যোগ্যতাও নেই যাতে তিনি জনসাধারণকে নিজেদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত করাতে পারেন। প্রধান কথা হল, বিপিন পাল একবার জেলে গিয়ে আর দ্বিতীয়বার যেতে রাজী নন তাই কলকাতার হেয়ার স্ট্রীট বা চৌরঙ্গীর এমন জায়গায় তাঁকে পাওয়া যায় যেখানে অন্য ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর ঝাঁজাল রচনা সমাদর পাচ্ছে। তাই তাঁরা বিপিন পালের 'ঘেউ ঘেউ শব্দ' (bark) কেবলমাত্র সহ্য করেন না, পছন্দও করেন, কারণ তাঁরা জানেন তাঁর 'কামড়ানোর' (bite) শক্তি নেই। এই ভাবে মহম্মদ আলি নিন্দাসূচক বাঙ্গোক্তি প্রকাশ করেন।৩২

তারপর মহম্মদ আলি বলেন, বিপিন পাল 'গণতান্ত্রিক স্বরাজে'র সংজ্ঞা নিরূপন করতে গিয়ে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বললেও তিনি মনে করেন না যে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব। অন্যদিকে 'প্যান ইসলামিস্ট' মহম্মদ আলি All Parties Conference এ প্রকাশ্যে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের দাবী উত্থাপন করেন এবং পুনরায় এ্যানি বেশান্তের কমনওয়েলথ সম্পর্কীয় বিল আলোচনার সময় এই দাবীর পক্ষে ভোট দেন। মহম্মদ আলি বিদ্রূপ করে লেখেন, ঘটনা এই যে 'মিঃ বিপিন চন্দ্র পাল হলেন মিঃ বিপিন চন্দ্র কাপুরুষ' (Mr. Bepin Chandra Pal is Mr. Bepin Chandra Poltroon) যিনি কখনই সরকারী ক্ষমতা বর্তমান আমলাতন্ত্র থেকে ছিনিয়ে নেবার ইচ্ছা পোষণ করেন না। কারণ এইভাবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে গেলে যে বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে তা তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।৩৩ কাজ করার ক্ষেত্রে যিনি মন্থরতার পক্ষপাতী, তিনিই সব সময়

উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেন অন্যেরা যখন কর্মরত তখন বিপিন পাল 'চিন্তা' করেন অর্থাৎ 'কথা বলেন'। যতই তিনি 'গণতান্ত্রিক স্বরাজের' কথা বলুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে মনের দিক থেকে তিনি সেই ধরণের স্বৈরতান্ত্রিক যাঁদের আবির্ভাব বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ঘটে। বিপিন পাল যে স্বরাজের কথা বলেন, তা হল 'Demagogic Swaraj' ।৩৪ এইভাবে মহম্মদ আলি বিপিন পালের মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সমগ্র রচনাটিই বিদ্রূপ ও পরিহাস মিশ্রিত।

জ্ঞানাঞ্জন পাল লিখিত ২৫শে জুলাইয়ের পত্র পেয়ে মহম্মদ আলির নির্দেশমত তাঁর সেক্রেটারী এইচ, রহমান ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই এক দীর্ঘ পত্র জ্ঞানাঞ্জন পালকে লেখেন। মহম্মদ আলি জানতে চান, কলকাতার অন্য কাগজে লিখবার সুযোগ না পেয়ে কি বিপিন পাল 'ইংলিশম্যান' কাগজের বদান্যতা গ্রহণ করে সেখানে প্রবন্ধ লিখেছেন? 'ইংলিশম্যান' কাগজে লিখে কি তিনি টাকা পান? 'বেঙ্গলি', 'পত্রিকা' ও 'সারভ্যান্ট' কাগজ কি বিপিন পালের লেখা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছে? তিনি কি নিজেই 'ইংলিশম্যান কাগজে লিখবার জন্য আবেদন করেন? না, তাঁরাই তাঁকে অনুরোধ করেন লিখতে? এই চিঠিতে একথাও বলা হয়, ইসলাম ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে মহম্মদ আলির অভিমত সম্পর্কে বিপিন পাল অজ্ঞ এবং তাঁর প্রবন্ধে অনেক তথ্যের বিকৃতি ঘটেছে। যদিও 'কমরেড' কাগজে এই বিষয় নিয়ে মহম্মদ আলির অসংখ্য রচনা আছে। তা সত্ত্বেও মহম্মদ আলির নিজের রচনা থেকে একটি লাইনও উদ্ধৃতি না দিয়ে বিপিন পাল তাঁর সমালোচনা করেন। এমন নয় তাঁদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের কোনই সুযোগ ছিল না। কিছুদিন পূর্বেও দিল্লীতে দুজনে দীর্ঘকাল ছিলেন। তখন বিপিন পাল তাঁর মতামত জেনে নিতে পারতেন।৩৫

মহম্মদ আলির মতে, সব ধর্মের মৌলিক নীতি হল 'theocracy'। জাতীয়তাবাদকে যদি বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের দ্বারা সংশোধিত না করা হয় তবে তা মানবজাতির কাছে অভিশাপরূপেই দেখা দেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তখন জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব ছিল 'My country, right or wrong'। তাই এই অর্থে ঈশ্বর মানবসমাজ সৃষ্টি

করেন. আর শয়তান জাতি তৈরী করে (God made mankind, and the Devil made the Nation)। মহম্মদ আলি আশা করেন, সব অ-মুসলমান ভারতীয়রা তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ ও প্রচার সহ্য করবেন, তেমনি তিনি চান সমস্ত মুসলমানেরাও ভারতের অ মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ ও প্রচার মেনে নেবেন। অ-মুসলমানদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেবার ইচ্ছা তাঁর আদৌ নেই। অন্যদিকে অ-মুসলমানদের কাছ থেকেও তিনি এই ব্যবহার আশা করবেন। প্রসঙ্গত তিনি গরু সম্পর্কে হিন্দু মনোভাব আলোচনা করেন। গরুর প্রতি পবিত্রতা আরোপ করা তাঁর কাছে 'হিন্দু কুসংস্কার' বলেই মনে হয়। তবুও হিন্দু ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত মহম্মদ আলি নিজের পরিবারে গোমাংস ভক্ষণ করা বন্ধ করে দেন গতবছর মহাত্মা গান্ধী যখন অনশন ভঙ্গ করেন তখন মহম্মদ আলি তাঁকে একটি গরু উপহার দেন। তাই মহম্মদ আলি জিজ্ঞেস করেন, 'এমন একজন ব্যক্তি জাতীয়তাবাদীদের কাছে আতঙ্কের কারণ হবেন কেন' ?৩৬

সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে মুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন মহম্মদ আলি। কারণ তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সৈন্যরূপে ব্যবহার করতে পারবে না। এইজন্য অন্যান্য ভারতীয় দেশ-প্রেমিকদের সঙ্গে তিনিও অবিলম্বে 'স্বরাজ' প্রশ্নের সমাধান চান। স্বভাবতই বিপিন পাল একথা বলতে পারেন না যে, তিনি এই সমস্যা সমাধানে মহম্মদ আলির চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহশীল ।৩৭

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে বিপিন পাল একটি সংশোধনী প্রস্তাবে 'স্বরাজ' শব্দের পূর্বে 'গণতান্ত্রিক' শব্দ জুড়ে দিতে চান। একজন মুসলমান হিসাবে মহম্মদ আলি সমস্তরকমের স্বৈরতন্ত্রকেই ঘৃনা করেন। নাগপুরে তিনি বিপিন পালের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন, কারণ তিনি 'অনাবশ্যক পুনরুক্তিতে (tautology) বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, স্বরাজ তো গণতান্ত্রিক হবে। এমনকি মহম্মদ আলি 'রিপাবলিকান পদ্ধতি' প্রতিষ্ঠারও পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এসেম্বলির সদস্যরূপে যিনি রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন তাঁর পক্ষে এদাবী করা সম্ভব নয়।৩৮

'স্বরাজ' শব্দের সংজ্ঞা সম্পর্কে মহম্মদ আলির অভিমত বিপিন পাল ভুলভাবে উল্লেখ করেন। মহাত্মা গান্ধীর সভাপতির ভাষণ নিয়ে মহম্মদ আলি বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তখন তিনি 'স্বরাজ' সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করেন।৩৯ তাঁর মতে, স্বায়ত্বশাসনের অর্থেই 'স্বরাজ' শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা উল্লেখ করা যায়। 'স্বরাজ' অর্জনের পর জনসাধারণ সমগ্র জাতির জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। কারন প্রকৃত ক্ষমতা পাবার পর তা করা সম্ভব। যখন ব্রিটিশ ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রের 'কমা' পর্যন্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কারও নেই, তখন ভবিষ্যত ভারতের শাসনতন্ত্র কি হবে তার বিভিন্ন ধারা নিয়ে ঝগড়া করার মত বোকামি করতে মহম্মদ আলি প্রস্তুত নন। প্রসঙ্গত একথাও বলা হয়, ইউরোপের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ও আইন বিষয়ে মহম্মদ আলির জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। তাই ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখলের পর তিনি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে দায়িত্ব পালনে সক্ষম। কিন্তু বর্তমানে তিনি 'স্বরাজ' অর্জনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন।৪০ কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা এখনই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চান যদিও সে ক্ষমতা আগামী দিনে বিজয়লাভের পর অর্জন করা সম্ভব। ভারতীয়দের অবস্থা জেনেই মহম্মদ আলি তাঁদের প্রস্তাবিত পথ গ্রহণে অস্বীকৃত হন। তাঁর মনে হয়, দীর্ঘকাল এক অবাস্তব অবস্থার মধ্যে বাস করায় ভারতীয়রা শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য ব্যগ্রতা দেখান, কল্পনা করেন বিতর্ক সভায় বসে শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব এবং তাঁরা যার প্রয়োজন বোধ করেন তা হল বেশীরভাগ সদস্যের ভোট। অনেকদিন ধরে তাঁরা ইতিহাস তৈরী থেকে এবং ইতিহাস-সম্মতভাবে চিন্তা করতে বিরত আছেন। তাঁদের কোন ধারণা নেই, কিভাবে অন্যদেশ শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার আদায় করতে অথবা শাসনতন্ত্রের একটি ধারা রহিত করতে শত-সহস্র লোকের মূল্যবান জীবনদান করেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন কিধরণের শত্রুর সঙ্গে তাঁদের ভারতবর্ষে সংগ্রাম করতে হবে।৪১

এই কারণে মহাত্মা গান্ধীর মত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ভবিষ্যতে ভারতের শাসনতন্ত্র কি হবে তা নিয়ে এখনই জল্পনা-কল্পনা করে সময় নষ্ট

করতে প্রস্তুত নন। তাছাড়া 'স্বরাজ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র জাতির সামনে যে 'বারো পয়েন্ট' রেখেছেন তাতে শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের বিবেচনার জন্যও রয়েছে।৪২ এই পত্রে একথাও বিপিন পালকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অবিলম্বে 'ভারতবর্ষ ও ইসলামকে মুক্ত' করবার জন্য মহম্মদ আলি আবার দীর্ঘকাল কারাগারে যাপন করতে প্রস্তুত, তবুও বিপিন পালের মত 'ইংলিশম্যান' কাগজের বদান্যতা গ্রহণ করতে তিনি রাজী নন।৪৩ ৩১ শে জুলাইয়ের (১৯২৫খ্রী) পত্রে এই সব বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট পুনরায় মহম্মদ আলির সেক্রেটারী এইচ. রহমান জ্ঞানাঞ্জন পালের কাছে একটা ছোট্ট পত্রের সংগে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে ডিসেম্বর 'কমরেড' পত্রিকায় প্রকাশিত বেলগাঁওতে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতির ভাষণ সম্পর্কে মহম্মদ আলির প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেন।৪৪ এই প্রবন্ধে Islamic Theocracy ও Indian Nationalism নিয়ে মহম্মদ আলির মতামত পাওয়া যায়। প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয় : 'হিন্দুমুসলিম ঐক্য'। বিপিন পালকে এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করা হয়। এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হল।৪৫ মহম্মদ আলি লেখেন, মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ প্রোগ্রামের বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্তটি বজায় রাখতে চান। কিন্তু জাতীয় বাহিনী যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকে তবে শত্রুর সংগে নিজস্ব শান্তি-পূর্ণ পদ্ধতি অনুযায়ী সংগ্রাম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কোন জেনারেল কি পরস্পর কলহকারী সৈন্যদের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে পারেন? মহাত্মা গান্ধী ঠিক কথাই বলেছেন, কিছু সংখ্যক হিন্দু ও কিছু সংখ্যক মুসলমান ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীলতাই পছন্দ করবেন যদি না তাঁরা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু-ভারত, অথবা মুসলমান-ভারত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তারপর মহম্মদ আলি বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান আছে তা থেকে একথা বলতে পারি, একজন মুসলমানের অ-মুসলমানের উপর মুসলিম শাসন চাপিয়ে দেবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, এবং তেমনি মুসলমান প্রজাদের দ্বারা অ-মুসলমান শাসন বিপর্যস্ত করার প্রশ্নও ওঠে

না যতদিন পর্যন্ত সেখানে একজন মুসলমান বিনা বাধায় ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণ করতে পারেন। ইসলাম Theocracy এবং কোরাণের ভাষায় 'ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন সরকার নেই' ("There is no Govt. but God's") এবং 'কেবলমাত্র ঈশ্বরের সেবার জন্যই আমরা আদিষ্ট' ('Him alone are we Commanded to Serve')। অন্যসব ধর্মের মত, ইসলামেও এমন কিছু বিধি আছে যা প্রতিটি মুসলমানের অনুসরণ করা কর্তব্য, আবার এমন কিছু বিধান আছে যা তাদের পালন করা উচিত নয়। এই করা-বা-না-করার মধ্যে অনেকখানি জমি পড়ে আছে যেখানে একজন মুসলমান মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারেন। অবশ্য এখানেও কয়েকটি বিষয় তাকে নির্বাচন করে চলতে হয়। একজন মুসলমান কখনই ঈশ্বর সৃষ্ট কোন ব্যক্তিকে মান্য করবে না যিনি তাঁকে ইসলামের বিধি-নিষেধ অবহেলা করতে নির্দেশ দেবেন, যদি সে ব্যক্তি তাঁর পিতা-মাতা, প্রভু বা শাসকও হয়; আবার যদি সে শত্রু বা বন্ধু হয়; অথবা সে যদি মুসলমান অথবা অ-মুসলমান হয়। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের জাগতিক শক্তি একজন মুসলমানের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে উপযোগী রয়েছে এবং সব সময় খলিফার পরিচালনাধীন আছে, ততদিন একজন মুসলমান কার প্রজা হয়ে আছেন—মুসলমান অথবা অ-মুসলমানের এই নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। তাঁর যা প্রয়োজন তা হল ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করা। যদি কোন মুসলিম শাসন, এমনকি খলিফাও, তাঁকে ঈশ্বরকে অমান্য করতে নির্দেশ দেয়, তবে তিনি তা অগ্রাহ্য করবেন। ইসলামের প্রতি অনুগত একজন মুসলমানের কর্তব্য নির্ধারণ করার পর মহম্মদ আলি মন্তব্য করেন, এই যখন অবস্থা তখন 'স্বরাজ সরকারের' প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলবার কি প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে 'স্বরাজ সরকার' যখন 'স্বধর্ম' রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।[৪৬] যখন স্বরাজের নামে মুসলমানের উপর এমন কিছু বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হবে যেসব সর্ত ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার সামিল হয়, তখন তিনি তা মানতে অস্বীকার করবেন এবং বিদ্রোহ করবেন। একই কারণে ভারতবর্ষে যদি 'স্বরাজ সরকার' প্রতিষ্ঠিত না হয়ে দিল্লীতে মুগল শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, অথবা তুরস্কে

মহম্মদ ঘ্যাসিদউদ্দিনের বিতাড়নের পূর্বেকার খলিফার নিজস্ব শাসনও হয়, যা তাঁর উপর এই ধরণের সর্ত চাপিয়ে দেবে, তাকে অমান্য করা ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। ঈশ্বরের সরকার (God's government) সাধারণত হিন্দু বা খ্রীষ্টান সার্বভৌমত্বের বিরোধী নয়। কিন্তু তার সংগে মুসলমান শাসকের বিরোধ হতে পারে যদি সেই শাসক ঈশ্বরের নির্দেশের পরিবর্তে নিজের নির্দেশ মানতে আদেশ দেন। এই কারণে একজন মুসলমানের পক্ষে মুসলমান বা অ-মুসলমান শাসক পরিচালিত সরকারের প্রতি অনুগত থাকা সম্ভব।৪৭ প্রশ্ন হল, কাকে আগে স্থান দেওয়া হবে : ঈশ্বর অথবা মানুষ (God or Man)। যাঁরা মুসলমানদের আহ্বান জানান ঈশ্বরকে দ্বিতীয় স্থান দিতে তাঁরা মুসলমানদের নিজেদের বিশ্বাস বিসর্জন দিতে বলেন। স্বভাবতই তাতে কোন মুসলমান সম্মতি দিতে পারেন না। কোন হিন্দু, শিখ, পার্সী, খ্রীষ্টান ও ইহুদি নিশ্চয়ই এই ধরণের ব্যবস্থা অনুসরণে সম্মত হবেন না। তাই মহম্মদ আলি মন্তব্য করেন, যখন তাঁদের 'স্বধর্ম' অনুসরণে প্রতিশ্রুতি দিতে আমরা প্রস্তুত, তখন মুসলমানদের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায় ? অ-মুসলমান মনোভাবের প্রতি যাঁদের আনুগত্য রয়েছে তাঁরাই মুসলমানদের ক্ষমতা সংকোচনের পক্ষপাতী এবং আবার তাঁরাই মুসলমানদের কাছ থেকে এমন সরকারের প্রতি আনুগত্য দাবী করেন যা ঈশ্বরের প্রতি মুসলমানদের যে দায়িত্ব রয়েছে তাকে অগ্রাহ্য করে।৪৮ তাঁদের সংগে মহাত্মা গান্ধীর কি পার্থক্য তা নিয়ে মহম্মদ আলি আলোচনা করেন। তাঁর মতে, মহাত্মা গান্ধী কোন হিন্দু বা মুসলমান, ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি বা নাস্তিকের কাছ থেকে এই ধরণের কোন দাবী করেন না। তিনি আশা করেন সবাই তাঁদের বিবেক অনুযায়ী চলবেন। এই কারণে মুসলমানেরা তথাকথিত 'মুক্তচিন্তা' ও 'গোঁড়া' ব্যক্তিদের পরিবর্তে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করেন।৪৯ মহম্মদ আলির মত মুসলিম নেতারা ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান, এই অভিযোগ যাঁরা করেন তাঁদের উদ্দেশ্য করে মহম্মদ আলি লেখেন, সেই মুসলমানের স্থান ভারতবর্ষে নয় যিনি ভারত-বর্ষকে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম শাসাধীন রাখতে চান। তেমনি সেইসব

হিন্দুর স্থানও ভারতবর্ষে নয় যাঁরা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। মহাত্মা গান্ধীর সংগে একমত হয়ে বলা চলে, ভারতবর্ষে এই মতের লোকের সংখ্যা খুবই কম। বেশী হোক বা কম হোক, ভারতীয়দের কর্তব্য হল যৌথভাবে এই ধর্মান্ধতাকে পরাজিত করা এবং ভারতবর্ষে 'স্বরাজ' ও 'স্বধর্মের' পথকে সুগম করা।৫০ ধর্মের পক্ষে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ রাখবার পর ভারতবাসী খুব সহজ বিবেক নিয়ে তাঁদের সমালোচনা করতে পারবেন যাঁরা ধর্মের নাম নিলেও প্রকৃতপক্ষে নিজেদের স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হন। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, স্বার্থপর লোকেরাই অসহযোগ আন্দোলনের সময় হতাশা বোধ করেন। তাঁদের এখন সুযোগ হয়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতা নিয়ে ব্যবসা করবার।৫১ মহাত্মার এই মন্তব্যে মহম্মদ আলি আনন্দ প্রকাশ করেন। গত কয়েকবছর ধরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে অনৈক্য ও বিরোধের কারণও মহাত্মা বিশ্লেষণ করেন। এইসব বিরোধে ধর্মই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেন, ধর্মকে হাস্যজনক করা হয়েছে। তুচ্ছ বিষয়কে ধর্ম-বিশ্বাসের নামে মহিমান্বিত করা হয়েছে। ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিরা তা পালন করতে বদ্ধপরিকর। মহাত্মা গান্ধী এ উক্তিও করেন, একটা গণ্ডগোল বাধানোর প্রয়োজনেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলোকে সামনে তুলে ধরা হচ্ছে।৫২ মহম্মদ আলির ধারণা, লিখতে ভুল করায় মহাত্মা গান্ধী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে এই ধরণের মন্তব্য করেন আরও ব্যাখ্যা করে মহম্মদ আলি বলেন, মহাত্মা আমাদের মতই চিন্তা করেন, দেশে যথার্থ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিযোগ আছে, এবং যাঁরা অভিযোগ করেন ও যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তাঁরা উভয়েই ধর্মের নামে গণ্ডগোল বাধান, অথবা তাঁরাই বিবাদমান সাম্প্রদায়িক দলগুলোর উৎসাহী সমর্থক। এই পরস্পর বিবাদমান দলগুলোর ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার দূর করতে তাঁরা কিছুই করেন না। যদি তাঁরা এই বিবাদে প্রথমে ইন্ধন নাও যোগান, তাহলেও অবস্থা জটিল করে তোলার ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে।৫৩ দিল্লীর ঐক্য সম্মেলন (Unity Conference at Delhi) ধর্মীয় পার্থক্য দূরীকরণে অবস্থাকে স্বাভাবিক করেছে। অন্তত মহাত্মা গান্ধীর তাই ধারণা। মহাত্মার সাথে ঐকমত প্রকাশ করে

মহম্মদ আলি লেখেন, সর্বদল সম্মেলন কমিটি (Committee of the All Parties Conference) বর্তমান রাজনৈতিক মতপার্থক্য সমাধানে একটি কার্যকরী ও ন্যায়সঙ্গত উপায় বের করতে পারবে। তারপর মহাত্মা গান্ধীর কথার প্রতিধ্বনি করে মহম্মদ আলি ঘোষণা করেন: আমাদের উদ্দেশ্য হল অনতিবিলম্বে সাম্প্রদায়িক ও স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব বিলোপ করা। একই নির্বাচন কেন্দ্র নিরপেক্ষভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। আমাদের কাজের জন্য নিরপেক্ষভাবে উপযুক্ত পুরুষ ও মহিলা নিয়োগ করতে হবে। মহম্মদ আলির বিবেচনায় মহাত্মা গান্ধী হলেন বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি ভবিষ্যতের পরিণতি সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন, তেমনি বর্তমানের প্রয়োজন সম্পর্কেও তাঁর কোন অবহেলার ভাব নেই।৫৭ মহাত্মা গান্ধী যথাপই তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন এই বলে: সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অথবা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মনোনয়নের ব্যবস্থা অতীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের পথ করে দিতে হবে। কারণ তাঁরা সংখ্যাগুরুর মনোভাব সন্দেহ করেন। মহাত্মা গান্ধী সংখ্যাগুরুদের আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। মহাত্মা গান্ধীর এই সব উক্তি উদ্ধৃত করে মহম্মদ আলি বলেন, সংখ্যালঘুরা সন্তুষ্ট হতে পারে যদি সংখ্যাগুরুরা ন্যায়বিচারের আদর্শ স্থাপন করেন। কেউ যেন এই না ভাবেন সংখ্যালঘুরা নৈরাশ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে, অথবা ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে করছে পরিশেষে মহম্মদ আলি উভয় সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার কথা উল্লেখ করেন। এমনকি অনাহারে আক্রান্ত হয়েও তাঁরা পরস্পর কলহে লিপ্ত হন। খুব দৃঢ়তার সংগে মহম্মদ আলি ঘোষনা করেন, হিন্দু-মুসলমানদের মনে রাখা উচিত ভারতবর্ষের বর্তমান দুরবস্থার প্রকৃত কারণ দাসত্ব, স্বরাজ নয়। অসুবিধা হল এই, স্বরাজ কখনই অর্জিত হবে না যদি না এই সব লক্ষণ বিলুপ্ত হয়।৫৮ এই ভাবে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে মহম্মদ আলি গান্ধীজি ও সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই এইচ, রহমান যে পত্র জ্ঞানাঞ্জন বাবুকে পাঠান, তার প্রাপ্তিস্বীকারের রসিদ পেলেও কোন উত্তর না পাওয়ায় মহম্মদ আলির নির্দেশমত পুনরায় ১৯শে আগষ্ট (১৯২৫খ্রী) এইচ রহমান জ্ঞানাঞ্জন বাবুকে পত্র লিখে জানতে চান, বিপিন পাল 'ইংলিশম্যান' কাগজের আনুকূল্য

গ্রহণ করে যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁর জন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক পান কি না। ৩১ শে জুলাই এই বিষয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, তাই এখানে জিজ্ঞেস করা হয়। এই সম্পর্কে বিস্তৃত খবর পাবার জন্যে মহম্মদ আলি উদ্‌গ্রীব থাকেন। একথাও বলা হয় যে, খবর পাবার পর যদি মহম্মদ আলি দেখেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে বিপিন পালকে সমালোচনা করেছেন তাহলে তিনি নিঃসঙ্কোচে তা সংশোধন করবেন। অন্যদিকে মহম্মদ আলি এও জানতে চান, বিপিন পাল ইসলাম, স্বরাজ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মহম্মদ আলির মন্তব্য বলে ভুলভাবে যে সব আলোচনা করেন তা সংশোধন করতে সম্মত আছেন কিনা, অথবা যে সব তথ্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে তার সাহায্যে বিপিন পাল ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি সম্পর্কে তাঁর পূর্বের উক্তি সংশোধন করে কোন প্রবন্ধ লিখেছেন কিনা।৫৬

তারপর ১৯শে আগস্ট জ্ঞানাঞ্জন বাবুর কাছে মহম্মদ আলির পক্ষ থেকে হাফিজুর রহমান টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চান, বিপিন পাল মহম্মদ আলির পত্রের উত্তর দেবেন কিনা। যদি না দেন তবে মহম্মদ আলি তাঁর সংগে যে সব পত্রালাপ করেছেন তা প্রকাশ করবেন।৫৭

এই টেলিগ্রাম পাবার পর জ্ঞানাঞ্জন পাল জানান যে, মহম্মদ আলির পত্রের উত্তর পাঠানো হয়েছে। এই খবরটি পাবার পর মহম্মদ আলি যে পত্র পান তা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট জ্ঞানাঞ্জন পাল লেখেন। খুবই সংক্ষিপ্ত পত্র। এই পত্রে তিনি হাফিজুর রহমানকে জানান, নিজের অসুস্থতা ও কলকাতাতে ভ্রাতার অভিনয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় তিনি আরও পূর্বে পত্রের উত্তর দিতে পারেননি। তাঁকে সম্বোধন করে পত্র দেওয়ায় জ্ঞানাঞ্জন বাবু দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বিপিন পালের সংগে মহম্মদ আলির বিতর্ক তাঁদের দুজনের মারফত হওয়া উচিত নয়। মহম্মদ আলি তো সরাসরি বিপিন পালকে পত্র দিতে পারতেন। জ্ঞানাঞ্জন বাবু লেখেন, 'ইলিশম্যান' কাগজের সংগে বিপিন পালের যোগাযোগ নিয়ে মহম্মদ আলি যে-সব কথা জানতে চান, সে বিষয়ে তিনি যেন বিপিন পালকে নিজেই পত্র দেন।৫৮

এই সংক্ষিপ্ত পত্র ও জ্ঞানাঞ্জন বাবুর কৈফিয়ত পেয়ে মহম্মদ আলি খুশি হননি। যাইহোক, জ্ঞানাঞ্জন বাবুর পত্র পেয়ে মহম্মদ আলি নিজেই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬শে আগস্ট বিপিন পালকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন।৫৯

মহম্মদ আলি লেখেন, যেহেতু তিনি নিজে খুব ব্যস্ত থাকেন এবং তাঁর শরীরও ভালো নেই, সেজন্য তাঁর কাগজের সম্পাদক বিভাগের একজনকে পত্র লিখতে বলেন। এর মধ্যে অসঙ্গতি কি আছে? ২২শে জুলাইয়ের চিঠিতে তো 'ইলিশম্যানে' প্রকাশিত ৩রা জুলাইয়ের প্রবন্ধটি চাওয়া হয়। ২২শে জুলাইয়ের পত্রের উত্তরে ২৫শে জুলাই জ্ঞানাঞ্জন পাল মহম্মদ আলি সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেন তা আলোচনা করে মহম্মদ আলি লেখেন, বিপিন পাল তাঁর পুত্র মারফত তাঁর কাজের কটূক্তিপূর্ণ উক্তি করেন। এই পত্রে মহম্মদ আলি পুনরায় জানতে চান কি অবস্থায় 'স্বাধীন মতামত' প্রকাশের জন্য বিপিন পাল 'ইলিংশম্যান' কাগজের আনুকূল্য গ্রহণ করেন এবং কলকাতার অন্য সব কাগজ তাঁকে কেন এই অধিকার দিতে অস্বীকৃত হয়। এই সব প্রশ্নের উত্তর পেলে তিনি ভুল সংশোধন করতে প্রস্তুত আছেন। তিনি সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর চান। কিন্তু প্রায় একমাস সময় নিয়েও বিপিন পাল কোন উত্তর দেন নি। যদিও মহম্মদ আলি তাঁর রচনাবলী বিপিন পালকে পাঠিয়ে দেন। এই সব তথ্য পেয়ে বিপিন পাল মহম্মদ আলির মতামত সম্পর্কে তাঁর 'বোকা ধারণা' পরিবর্তন করেছেন কিনা এবং 'সংসাংবাদিকতার ধবজাধারী' হিসাবে বিপিন পাল যদি কিছু লিখে থাকেন, তাও মহম্মদ আলি জানতে চান।[৬০] কিন্তু বিপিন পালের কাছ থেকে তিনি কোনই উত্তর পাননি। যদিও ২৯শে আগস্ট পোস্ট অফিসের প্রাপ্তিস্বীকারের চিহ্ন আছে। চিঠিটি রেজিষ্ট্রী করেই পাঠানো হয়।[৬১] পরিশেষে হেমলেটের ভাষায় মহম্মদ আলি মন্তব্য করেন 'নীরবতাই বিশ্রাম'। এখানেই এই বিতর্ক সমাপ্ত হয়। তারপর এই দুই নেতার মধ্যে আর কখনই স্বাভাবিক সম্পর্ক হয় নি।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই যুগের ভারতীয় মুসলিম সমাজের ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁদের সম্পর্কে অনেকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের রচনাবলী, বিশেষ করে মহম্মদ আলির অসংখ্য প্রবন্ধ ও পুস্তিকা এখনও গবেষকদের দৃষ্টি ততটা আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। কয়েকটি গ্রন্থে তাঁদের বিবৃতি ও মন্তব্য বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা কষ্টকর। কোন কোন লেখকের কাছে মহম্মদ আলি একজন সাম্প্রদায়িক নেতারূপেই প্রতিভাত হন। অন্তত

তাঁদের সন্নিবিষ্ট তথ্যের বিশ্লেষণ পড়ে তাই মনে হবে। কিন্তু এই মনোভাব প্রকাশে আজকের লেখকদের নিজস্ব কোনো অবদান নেই। অনেক পূর্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ইংলিশম্যান' কাগজে প্রকাশিত বিপিন পালের প্রবন্ধেই তার সূত্রপাত হয়। তখন মহম্মদ আলি অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর প্রবন্ধ না পড়েই বিপিন পাল বিকৃতভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। আজকের লেখকদের রচনা পাঠ করলেও এ ত্রুটি চোখে পড়বে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত 'কমরেড' পত্রিকার ফাইল অনেকেই ভালো করে দেখেননি। অথচ এই ফাইল থেকে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের ধর্মীয় রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। এই কারণে আলোচ্য প্রবন্ধে দুই নেতার উক্তি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হল। এই সব তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে না 'ইসলাম' ও 'ভারতের স্বরাজের' প্রতি আস্থাশীল মহম্মদ আলি সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন। অন্তত বিপিন পালের চেয়ে যে তাঁর মতবাদ এই সময়ে অগ্রসর ছিল তা বোঝা যায়। 'ইংলিশম্যানের' সংগে বিপিন পালের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে কি ধরণের ছিল, সে বিষয়ে আরও তথ্য পেলে এই সময়ে বিপিন পালের ভূমিকা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ভাবতে অবাক লাগে, বারে বারে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তিনি কেন মহম্মদ আলিকে কোন উত্তর দেন নি? কেন তিনি এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন? বিপিন পাল মহম্মদ আলির বিতর্কে বিপিন পাল কোন জোরালো বক্তব্য রাখতে পারেননি। যে সব তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন মনে হবে না।

সূত্র নির্দেশ

১. 'An Unpleasant Correspondence' by Mohamed Ali, The Comrade, September 4, 1925, p.110.
২. Ibid.
৩. Ibid.
৪. Ibid.
৫ 'Element of Reckless Abandon' by Bipin Chandra Pal, The Englishman, June 18, 1925.

৬. The Englishman, June 26, 1925.
৭. 'The Curtain Falls Grave Problem of the Succession' by Bipin Chandra Pal, The Englishman, June 20, 1925.
৮. Ibid.
৯. Ibid.
১০. Ibid.
১১. 'The Problem and the Situation Extraterritorial Patriotism' by Bipin Chandra Pal, The Englishman, July 3, 1925.
১২. Ibid.
১৩. Ibid.
১৪. Ibid
১৫. Ibid.
১৬. Ibid.
১৭. Ibid.
১৮. Ibid.
১৯. Ibid.
২০. Ibid.
২১. Ibid.
২২. Ibid.
২৩. Ibid.
২৪. The Comrade, June 26, 1925 ; September 4, 1925 p.111.
২৫. Ibid, June 26, 1925.
২৬. The Comrade, September 4, 1925, p111.
২৭. Letter of Jnananjan Pal, dated 25th July, 1925. Published in the Comrade, Sept. 4, 1925, pp.111-112.
২৮. The Comrade, Sept. 4, 1925, pp. 111-112.
২৯ Ibid, p. 112.
৩০. Ibid.
৩১. Ibid, p.113.
৩২. Ibid.
৩৩. Ibid.
৩৪. Ibid.

৩৫. Ibid.
৩৬. Ibid, p. 114.
৩৭. Ibid.
৩৮. Ibid.
৩৯. The Comrade, 9th January, 1925, p.8.
৪০. Ibid, Sept. 4, 1925, p 114.
৪১. The Comrade, 9th January, 1925, p.8.
৪২. Ibid.
৪৩. Letter of H. Rahman. date 31st July, 1925. The Comrade, 4th Sept., 1925, p.114.
৪৪. Letter of H. Rahman, dated 4th August, 1925. The Comrade, 4th Sept., 1925, p. 115.
৪৫. 'Hindu-Muslim Unity' by Mohamed Ali, The Comrade 26 the December. 1924, pp. 138-139.
৪৬. Ibid.
৪৭. Ibid.
৪৮. Ibid.
৪৯. Ibid.
৫০. Ibid.
৫১. Ibid.
৫২. Ibid.
৫৩. Ibid.
৫৪. Ibid
৫৫. Ibid.
৫৬. Letter of H. Rahman. dated 19th August 1925 Published in the Comrade; September 4, 1925, p116.
৫৭. Ibid.
৫৮. Letter of Jnananjan Pal, dated August 24, 1925, Published in The Comrade, Sept. 4, 1925, p.116.
৫৯. Letter of Mohamed Ali, dated August 26, 1925. Published in the Comrade, Ibid, pI17.
৬০. Ibid.

ঐতিহাসিক গীবন

সুবোধ কুমার মজুমদার

জাতীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হিসাবে ইংলণ্ডের লোকেরা আজও যে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেক্‌স্‌পীয়র অথবা নিউটনের নাম স্মরণ করে থাকে, ঠিক একই শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করে ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড গীবনের নাম। উনবিংশ শতকের শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ইংরাজ ভদ্রলোক মাত্রই মনে করতেন যে, সেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য ও গীবনের ইতিহাস যে গৃহে নেই, সে গৃহ সত্যকার জ্ঞান ও কৃষ্টির আলো থেকে বঞ্চিত। সাধারণতঃ দেখা যায়, কবি, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার তাঁদের জীবদ্দশায় দেশবাসীর নিকট অপরিচিত থেকে যান এবং তাঁদের কপালে যথাযোগ্য মর্য্যাদা জোটে মৃত্যুর পরই। কিন্তু গীবন তার ব্যতিক্রম। জীবদ্দশায় যে সম্মান তিনি দেশবাসীর কাছে পেয়েছিলেন তা খুব কম লেখক বা গ্রন্থকারের ভাগ্যেই জুটেছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে গীবন কতবড় ভাগ্যবান ব্যক্তি। ওয়ারেণ হেস্টিংসের বিচার হচ্ছে লণ্ডনে—প্রধান প্রসিকিউটর শেরিডন জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করছেন, তীব্র সমালোচনা করছেন হেষ্টিংসের আচরণের, জনসাধারণ রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছে হেষ্টিংসের হাতে অযোধ্যার বেগমদের নিগৃহীত হবার কাহিনী। পরিশেষে বক্তা বলে ওঠেন, হেষ্টিংসের হীন আচরণের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও মিলবে না, না ক্ল্যাসিকাল ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের বর্ণনায়, না আধুনিক ঐতিহাসিক গীবনের ভাস্বর লেখনী-নিঃসৃত ছন্দময় গদ্যে। পরের দিন 'পাঞ্চ' পত্রিকায় ঐতিহাসিকের ব্যঙ্গ চিত্র ছাপা হল, যার নীচে লেখা ছিল "দ্য লুমিনাস্ হিস্টরিয়ান"। এই ঘটনার পর লোকের মুখে মুখে গীবনের নাম ফিরতে লাগল। গীবনের আমলে যে দুজন ঐতিহাসিক অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন হিউম ও রবার্টসন্। আজকের দিনে এঁরা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন ; অন্যদিকে গীবনের "ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফল" চিরায়ত

সাহিত্যের অক্ষয় মর্যাদা লাভ করেছে। দু'শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে তবু গীবনকে পাঠকরা ভোলে নি—আজও তারা সমান আগ্রহ নিয়ে তাঁর 'লুমিনাস পেজেস' ওলটায়।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এক ধনী ও সঙ্গল মধ্যবিত্ত পরিবারে ঐতিহাসিক গীবনের জন্ম। আত্মচরিতে গীবন তাঁর বংশ মর্যাদার কথা সগর্বে উল্লেখ করেছেন। প্রপিতামহ ম্যাথিউ গীবন ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লণ্ডনের এক ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ী হিসাবে বিখ্যাত হলেন। লিডেন হল স্ট্রীটে তাঁর সুসজ্জিত দোকানটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। গীবনের পিতামহ এডোয়ার্ড কিন্তু বিষয় বুদ্ধিতে তাঁর স্বীয় পিতা ম্যাথিউকে ছাড়িয়ে গেলেন। বস্ত্র ব্যবসা ছাড়াও তিনি সেনাবাহিনীতে ঠিকেদারী নিয়ে রাতারাতি প্রচুর পয়সার মালিক হলেন। অর্থকৌলিন্যে তিনি বোর্ড অব কাস্টমস্-এ আসন পেলেন এবং সেই সঙ্গে সাউথ সী কোম্পানীর ডিরেক্টর পদ। তিনি বেশ সহজ গতিতেই ধাপে ধাপে সমাজের শীর্ষে উঠে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ সাউথ সী কোম্পানীর বুদ্বুদ কেটে গিয়ে তিনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন বলেই তিনি জনসাধারণের কোপ দৃষ্টিতে পড়লেন। পার্লামেণ্ট তাঁর কাছ থেকে একটা মোটা টাকা জরিমানা আদায় করেন। অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই গেল তবু তিনি দিশেহারা হলেন না। অর্থের ক্ষতি তার গায়ে লাগে নি। কেননা, অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর যা অবশিষ্ট ছিল তার পরিমাণ বড় কম নয়। তিন জায়গায় জমিদারী ছিল—পাটনি, বুরিটন ও ম্যাপেল্-ডারহাম-এ যা থেকে প্রচুর আয় হত। জমিদারী ছাড়া ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ গচ্ছিত ছিল। কিন্তু এত অর্থের মালিক হয়েও তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করতে পারেন নি। সাউথ সী কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত থাকায় তিনি সরকার পক্ষেরও বিশ্বাসভাজন হতে পারেন নি। আর একটা অসুবিধা ছিল। ম্যাথিউ ও এডোয়ার্ড উভয়ে ছিলেন রাজনীতিতে চরম রক্ষণশীল এবং সিংহাসনচ্যুত দ্বিতীয় জেমসের বংশধরদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। পাছে রাজরোষে পড়েন এই ভয়ে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত সর্বদা গোপন রাখতেন তাঁরা, যদিও মনে বস্তু ধারার মত প্রবাহিত হত অন্তঃশীল

জ্যাকোবাইট প্রীতি। ঐতিহাসিকের পিতার নামও এডোয়ার্ড। তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণ ব্যক্তি। রাজনীতিতে প্রবেশ করে যশস্বী হবেন—এই ছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্খা। ওয়ালপোল-প্ল্যামের মন্ত্রিসভার বিরোধী সদস্য হিসাবে তিনি দু'বার পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাল্যকালে এক ধর্মযাজকের কাছে ঐতিহাসিক গীবনের হাতেখড়ি হ'ল; সামান্য অক্ষর পরিচয় হল, সেই সঙ্গে অঙ্ক কষা। ১৭৪৮ এ ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্কুলে তিনি ভর্তি হলেন। সেখানে খানিকটা ল্যাটিন পড়েছিলেন গীবন কিন্তু গ্রীক একে বারেই স্পর্শ করেন নি: মেধাবী ছাত্র বলতে যা বোঝায় কোনদিনই সে রকমের ছিলেন না। ১৭৫২-তে গীবন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন অক্সফোর্ডের মডলিন কলেজে একজন 'জেণ্টলম্যান কমনার' হিসাবে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে অক্সফোর্ড কিন্তু মোটেই আদর্শ স্থানীয় ছিল না। শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা অসঙ্গতি ও ত্রুটী বিচ্যুতি তরুণ গীবনের মনকে বিরূপ করে তুলেছিল। চল্লিশ বছর পর তিনি যখন তাঁর আত্মচরিত লেখেন তখন অক্সফোর্ড সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করেছিলেন, যার মধ্যে একটি বহু বিদিত—"Oxford will as cheerfully denounce me as a son, as I am willing to disclaim her for a mother." অধ্যাপকদের সম্পর্কেও নানারকম মন্তব্য করেছেন গীবন। ডঃ টমাস ওয়ান্ডগ্রেডের কাছে তিনি ল্যাটিন পড়তেন। কিন্তু তাঁর পড়াবার পদ্ধতি এত নীরস ছিল যে সুযোগ পেলেই গীবন ক্লাস থেকে পালাতেন এবং কোনদিনই টাস্ক করতেন না। ডঃ উইনচেষ্টার অপর আর একজন অধ্যাপক যাঁর একটিও লেকচার বা টিউটোরিয়ালে যোগ দেন নি গীবন। কাজ না করে, মাস মাস কি করে মাইনে নিতে হয়, সে বিদ্যা নাকি ভাল করে আয়ত্ত করেছিলেন শিক্ষক উইনচেষ্টার সাহেব।

অক্সফোর্ড সম্পর্কে গীবনের এই তিক্ততার কারণ কি? অক্সফোর্ড তখনকার দিনে একান্তভাবেই বড়লোক জমিদার বা লর্ড পরিবারভুক্ত ছেলেদের আড্ডাস্থল ছিল, জেণ্টলম্যান কমনারদের সেখানে কৃপার দৃষ্টিতে দেখা হত। গীবন এই শ্রেণী-বৈষম্য পছন্দ করতেন না। উপরন্তু তিনি

এসেছিলেন এমন এক পরিবার থেকে যারা বংশানুক্রমিক ভাবে 'জ্যাকোবাইট' ভাবাপন্ন। এর ফলে তাঁকে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কিল-ঘুষি সহ্য করতে হত। গীবন মোটেই সুপুরুষ ছিলেন না; ছেলেরা যে তাঁকে নিয়ে হাসি তামাসা করত এ বোধ হয় তার সহ্য হত না। ব্যক্তিগত কারণেই গীবন প্রচণ্ড ভাবে অক্সফোর্ড বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। অক্সফোর্ডের নিঃসঙ্গ জীবন ও তদুপরি ফরাসী দার্শনিক রুসোর-র প্রভাব গীবনের জীবনে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটিয়ে দিল। রুসোর এক্সপোজিন পড়ে তিনি অভিভূত হন। তারপর যখন এলিজাবেথের আমলের এক জেসুইট যাজক রবার্ট পারসনের লেখা পড়লেন তখন তাঁর মনে সন্দেহ থাকল না যে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিরাই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সৎ ও নির্ভীক। রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি তাঁর এক প্রবল আকর্ষণ জাগল—তিনি কাল বিলম্ব না করে গুরুজনদের সম্মতি না নিয়েই রোমান ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করলেন। সে যুগে অক্সফোর্ডের কোন আবাসিক ছাত্রের পক্ষে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী গীবন বহিষ্কৃত হলেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই অশুভ সংবাদ যেদিন পিতার কাছে এসে পৌঁছুল সেদিন তিনি গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হলেন। পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা উচ্চাশা ছিল তাঁর মনে—সে সব সম্ভাবনা বিনষ্ট হতে দেখে মনে নিদারুণ আঘাত পেলেন তিনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি প্রথমে পুত্রকে পাটনিতে নিয়ে আসেন। সেখানে পরিবার বর্গের অন্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করা হয় যে পুত্রকে কেশ কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ডের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। স্থির হল সুইট্‌জারল্যাণ্ড-অন্তর্গত লজানই নির্বাসনের উপযুক্ত স্থান। ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হবার ঠিক এগার দিন পর গীবন লজান শহরে চলে এলেন। এক ক্যালভিনপন্থী ধর্মযাজক ড্যানিয়াল পাভিলার্ডের তত্ত্বাবধানে তাঁর নূতন জীবন সুরু হ'ল। পাভিলার্ডের কাছে ক্লাসিক্স পাঠ আরম্ভ হল কালবিলম্ব না করে। সেই সঙ্গে গীবন পড়তে থাকেন গ্রোসিয়াস, লক্, মঁতেস্কু, পাসকাল প্রভৃতির রচনা। দর্শন ও সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে চলে গণিত চর্চ্চা। পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের এই বিচিত্র জগতে প্রবেশ করেও মনে

পরিপূর্ণ শান্তি পান নি গীবন। কোথায় যেন কি অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছিল। লজানের প্রবাস জীবনকে মনে হল বন্দী দশা—সে জীবনে না আছে স্বাধীনতা, না আছে আনন্দ-ফূর্ত্তি। একটি মাত্র ঘরে তিনি আবদ্ধ—যে ঘরটিতে না আছে আলো বাতাস, না আছে পরিচ্ছন্নতা, না আছে লণ্ডন ও পাটনির সৌখীন আসবাব পত্র। গীবনের পক্ষে ঘরটিকে কয়েদখানা মনে করা আশ্চর্য নয়। তার উপর ছিলেন গৃহকর্ত্রী মাদাম প্যাভিলার্ড, যিনি নীচতা ও লোভের প্রতিমূর্ত্তি (ugly, dirty, proud, ill-natured and covetous)। ফরাসী ভাষা ভাল করে জানা না থাকায় প্রবাস জীবনের প্রথম কয়বছর গীবন শিক্ষিত ফরাসী ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না, যার জন্য আরও বেশী করে নিজেকে তাঁর নিঃসঙ্গ মনে হ'ত। পরে অবশ্য এই অসুবিধা দূর হয়ে যায় এবং গীবন মাতৃভাষার মতই সহজে ও অনায়াসে ফরাসী বলতে ও লিখতে পারতেন। লজানে থাকার সময়ে গীবন আকৃষ্ট হন এক সুন্দরী ফরাসী ললনার প্রতি। নাম তাঁর সুজান কারচাড। পরিশেষে এঁকে বিবাহ করবেন মনস্থ করেন তিনি। কিন্তু কৈশোর-প্রেম ব্যর্থ হ'ল। প্রতিবাদক হলেন গীবনের পিতা। এক বিদেশিনীকে বিবাহ করবে তাঁর পুত্র—এ চিন্তা তাঁর কাছে অসহ্য মনে হ'ল। গীবন স্বাধীন নন—অর্থের জন্য সর্ব্বপ্রকারে পিতার মুখাপেক্ষী। তাই বিদ্রোহ করতে পারলেন না। আত্মচরিতে গভীর খেদের সঙ্গে গীবন লিখেছেন—"I sighed as a lover and obeyed as a son"। পরবর্ত্তী কালে সুজান বিপ্লব-পূর্ব্ব যুগে ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী নেকার-কে বিবাহ করেন (১৭৬৪)-এঁদের একমাত্র কন্যা মাদাম দা স্তাল বিপ্লব কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নেকারকে বিবাহ করার পরও সুজানের সঙ্গে গীবনের বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ অটুট ছিল।

লজানে থাকাকালীন ঐতিহাসিক গীবন, লক্, মঁতেস্কু, পুফেনডর্ফ, গ্রোসিয়াস প্রভৃতি চিন্তাবীরের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন। রাজনৈতিক মতবাদে তিনি ঘোরতর রক্ষণশীল ছিলেন কিন্তু এতদিনে তাঁর মনের গতি ফিরল। রাজতন্ত্র তথা ডিভাইন রাইটের প্রতি

অন্ধ বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এলো। ধীরে ধীরে লকের ছইগ আদর্শে দীক্ষিত হলেন তিনি। যদিও পিতার খুব ইচ্ছা ছিল পুত্র পার্লামেন্টের সদস্য হোক, গীবন নিজে রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কোন উচ্চাভিলাষ পোষণ করতেন না। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন এদিকে তাঁর কোন সফলতা আসবে না। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য প্রকার। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধে তিনি নির্ব্বাচনে নামলেন এবং লিসকেয়ার্ড থেকে পার্লামেন্টে নির্ব্বাচিত হলেন। কিন্তু পার্লামেন্টে প্রবেশ করে তিনি তেমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। তৃতীয় জর্জ্জের আমলে আমেরিকায় স্বাধীনতা-সমর শুরু হ'ল। গীবন প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন যে বিদ্রোহীদের পরাস্ত না করা পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সুখ শান্তি, মান-মর্য্যাদা কিছুই থাকবে না। লর্ড নর্থের উগ্র সমর্থক হিসাবে তিনি পরিচিত হলেন। কিন্তু যেদিন ইংরাজ বাহিনী স্যারাটোগায় আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল সেদিনই গীবনের নিশ্চিন্ত আত্মপ্রত্যয় কর্পূরের মত উবে গেল এবং নিছক বাহুবলের উপর গভীর আস্থা ক্রমশই শিথিল হয়ে আসল। হতচকিত ঐতিহাসিক বিমূঢ় চিত্তে ভাবতে বসলেন, ইংরাজরা যখন বাহুবলে আমেরিকাকে ধরে রাখতে পারল না, তখন ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা দিতে আর বাধা কোথায়! এমন কি লর্ড নর্থের উপরই দোষারোপ করে বললেন তিনিই হচ্ছেন যত নষ্টের মূল কারণ। তাঁর ভাষায়, "Lord North does not deserve pardon for the past, applause for the present and confidence for the future."। অথচ এই নর্থকেই গীবন তাঁর "ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল" উৎসর্গ করেছিলেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, গীবনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল না। যে সময়ে নর্থ ও রকিংহামকে সুবুদ্ধি জুগিয়ে, সর্ব্বনাশা ঔপনিবেশিক নীতি পরিত্যাগ করানো সম্ভব ছিল সে সময় গীবন অন্ধ স্তাবকের মত তাঁদের বাহবা দিয়েছেন।

গীবন যখন সুইট্‌জারল্যাণ্ডে অবস্থান করছেন তখন ফ্রান্সে বিপ্লব বহ্নি জ্বলে ওঠে। ১৭৯৩ সালের যে হিংসাত্মক ঘটনাবলী ফ্রান্সের ইতিহাসকে রক্তাক্ত করে তুলেছে, গীবন তারই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি মনে প্রাণে বিপ্লবীদের ঘৃণা করতেন এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন বিপ্লবের আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ

জীবনকে বিষাক্ত করে তুলবে। ফরাসী বিপ্লবের বিরোধিতায় তিনি বার্ককেও ছাড়িয়ে যান। সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, সনাতন মূল্যবোধগুলি রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি 'লেজিটিমেসি ও স্ট্যাটাস্ কো'র অন্ধ সমর্থক হয়ে দাঁড়ান। বিপ্লব তাঁর মনে এতদূর ত্রাসের সঞ্চার করেছিল যে বিপ্লবকে ঠেকাতে তিনি যে কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলাতে প্রস্তুত ছিলেন। এমন কি ইনকুইজিশানের মত ধর্মীয় অত্যাচার, নিপীড়নকেও সমর্থন করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। গীবনের আধুনিক জীবনীকার তাঁর এই আক্রোশের একটি কারণ আবিষ্কার করেছেন গীবন ১৩০০ পাউণ্ড মূল্যের বণ্ড ক্রয় করেছিলেন ফরাসী সরকারের কাছ থেকে। বিপ্লবের ফলে এই টাকা নষ্ট হ'ল। অর্থ-নাশের জন্য ফরাসী বিপ্লবীদের উপর তিনি রুষ্ট ছিলেন—নানা তীক্ষ্ণ মন্তব্যে তাঁর এই বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। গীবনের বিপ্লব বিরোধিতার এমন সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য কিনা ইতিহাসের ছাত্র তা বিচার করে দেখবেন।

গীবন তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর চিত্তোন্মেষ ঘটে। এই বয়সে বই পড়ার খুব আগ্রহ জাগে মনে এবং প্রচুর বই পড়েও ফেলেন। বাইরের দৌড়-ঝাঁপ, খেলাধূলায় তেমন আগ্রহ ছিল না তাঁর—যতটা ছিল বই পড়ার বিষয়ে। ১৭৪০-৪৯ এর মধ্যে বিশ খণ্ডে 'বিশ্ব ইতিহাস' লেখা হ'ল। লেখকরা কেউই তেমন নাম করা নন—তবু গভীর আগ্রহ নিয়ে সমস্ত খণ্ডগুলি ভাল করে পড়লেন গীবন। নিজে কোনদিন বই লিখে ফেলবেন—এমন কথা কখনও তাঁর মনে উদিত হয় নি। লজানে গুরুদেব পাভিলার্ড ছাত্রকে খুব ভাল ভাবে ল্যাটিন শিখিয়েছিলেন কিন্তু তিনিও ছাত্রের মনে ঐতিহাসিক হবার সুপ্ত ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে পারেন নি। ১৭৬৪ সালের গ্রীষ্মকালে ইটালী ভ্রমণে বেরিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনার বাসনা জেগে ওঠে। ক্যাপিটলের ধ্বংসস্তূপ দেখতে দেখতে তাঁর মনে প্রাচীন ইটালীর সুমহান ঐতিহ্যের কথা বার বার মনে হতে থাকে। ১৫ই অক্টোবর ১৭৬৪ সালে তিনি যখন ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল জুপিটারের মন্দিরে নগ্নপদ নতজানু প্রার্থনা-রত পূজারীদের চিত্র। সেদিনই গীবন সঙ্কল্প করলেন রোমান সভ্যতার 'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফলের' ইতিহাস রচনা করবেন।

সর্ব্বকালের সব দার্শনিক পণ্ডিতরাই রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ও পতন বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং নিজস্ব দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। এটি তাঁদের একটি অতি প্রিয় বিষয়বস্তু। খ্রীষ্ট জন্মের তিন হাজার বছর পূর্ব্বে মধ্যপ্রাচ্যের উর দেশীয় এক ঐতিহাসিক পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজবংশগুলির এক তালিকা প্রস্তুত করেন। তাঁর মতে ইতিহাস হচ্ছে এই রাজবংশগুলির উত্থান ও পতনের কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে তিনি এক নৈতিক ব্যাখ্যার অবতারণা করলেন। যে সব শাসক ন্যায় ধর্ম অনুযায়ী দেশ শাসন করেন তাঁরাই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে বেঁচে থাকেন এবং জীবন যুদ্ধে জয়ী হন। অপরদিকে, অত্যাচারী নিপীড়ক ও ব্যাভিচারী শাসকবর্গ শীঘ্রই পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হন। বহু শতাব্দী ধরে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস চিন্তা এই ন্যায় অন্যায় বোধ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে থুকিডিডিস একেবারে নূতন কথা শোনালেন। তিনি বললেন এথেন্সের ক্ষেত্রে পতনের কারণ শুধুমাত্র মদগর্বী শাসক শ্রেণীর ঔদ্ধত্য বা পাপাচারই নয়। অন্য কারণও সেখানে বিদ্যমান ছিল। পরবর্ত্তী যুগে ঐতিহাসিক পলিবিয়াস বলেছিলেন রোমের অগ্রগতির একমাত্র কারণ ঈশ্বরের আশীর্বাদ নয় তাঁর মতে এই অগ্রগতি ও পরাক্রমের মূলে ছিল রোমানদের সামরিক সংগঠন, তাদের কঠিন নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আইন শৃঙ্খলার প্রতি গভীর আনুগত্য। কিন্তু রোমের প্রাধান্য এত ক্ষণস্থায়ী হ'ল কেন? তার উত্তর দিয়েছেন স্যালাস্ট, যিনি ৪০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রিপাবলিকান যুগের শেষ অধ্যায়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মতে কার্থেজকে পরাভূত করাই রোমের কাল হল। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে হারিয়ে রোম ক্ষমতাশালী হ'ল—সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এমন কোন শক্তি রইল না যে রোমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। তার ফলে রোম নিজশক্তিতে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হয়ে বিলাস ব্যসনে গা ঢেলে দিল। যে চরিত্রবল ও আত্মপ্রত্যয় তাকে দেশ জয়ের প্রেরণা জুগিয়েছিল সেই অমূল্য সম্পদকে রোম অচিরেই হারাল। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক লিভি সঙ্কল্প করেন যে, তিনি রোমের এমন ইতিহাস রচনা করবেন যার উদ্দেশ্য হবে রোমের স্বর্ণময় অতীতের কাহিনী বর্ত্তমান মানুষকে শোনান, যাতে তাদের দৃষ্টি কলুষ কালিমালিপ্ত ও ব্যাভিচার-দুষ্ট বর্ত্তমান

থেকে গৌরবোজ্জ্বল এক অতীতের দিকে নিবদ্ধ হয়। অতীতের আলোচনায় রোমান নাগরিকদের চিত্ত-শুদ্ধি ঘটবে, নৈতিক মান উন্নত হবে, এই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। রিপাবলিকান যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে ঈশ্বরের অভিসম্পাত নয়, রোমের পতনের মূলে আছে তার বিলাস-ব্যসন ও চরিত্রহীনতা।

আগাস্টাসের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হবার এক শতাব্দীর মধ্যেই কিছু লেখক রোমের পতন শুরু হয়েছে বলে বিলাপ আরম্ভ করেন। পতনের নানাবিধ কারণ নির্দেশ করলেন তাঁরা। যেমন, রোমান নাগরিকদের স্বাধীনতা হরণ, রোমের বার্দ্ধক্য, নৈতিক জীবনের অবনতি ইত্যাদি। এঁদের ক্ষেত্রে বিলাপ করাটা কিন্তু মানসিক বিলাসিতা। রোমের চারিদিকে প্রতিদিন যা ঘটছিল, তা দেখে তাঁরা বিস্মিত বিমূঢ় হচ্ছিলেন বিক্ষুব্ধ চিত্তে ভাবছিলেন কেন এই অধঃপতন! কিন্তু আক্ষরিক অর্থে রোমের পতন কোনদিন ঘটবে, রোম ভেঙে চুরমার হবে—এ তাঁদের স্বপ্নের অতীত ছিল। দ্বিতীয় শতকের প্লেগ মহামারি, তৃতীয় শতকের গৃহযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক দুর্গতি, চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের বর্ব্বর আক্রমণ—এতগুলি বিপর্যয় সত্ত্বেও রোমের সভ্য নাগরিক সগর্ব্বে বলত তাদের 'রোমা এটার্নার' (শাশ্বত রোমের) বিনাশ নেই। অবশ্য সকলেই যে তাদের সমর্থন করত তা নয়। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতরা পতনের কথাই জোর দিয়ে বলতেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০ অব্দে পম্‌পিয়াস্ ট্রোগাস্ ৪৪ ভল্যুমে তাঁর 'বিশ্ব ইতিহাস' লিপিবদ্ধ করেন। এতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজবংশগুলির উত্থান ও পতনের কাহিনী ছিল। জাস্টিন এই বৃহৎ বই এর এক সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন ; ছাত্রাবস্থায় গীবন তা' মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জেরোম যখন এ্যাসিরিয়া, মেডিয়া, পারসিয়া ও ম্যাসিডোনিয়ার ইতিহাস রচনা করেন তখন তিনি পথপ্রদর্শক হিসাবে ট্রোগাসের বর্ণনাকে কাজে লাগান।

রোমের পতন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা—এরূপ ধারণা সর্ব্ব প্রথম হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতদের রচনাতেই পাওয়া যায়। এঁরা ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস করতেন না, আবার পাপ-পুণ্য দ্বারা ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত

হয় সেকথাও মানতেন না। প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেটে যেটুকু তথ্য জানা যায় কেবল সেটুকু নিয়েই তাঁরা মাথা ঘামাতেন। হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের রচনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হওয়ায় তাঁরা ক্ল্যাসিকাল লেখক স্যালাস্ট ও লিভিকেই পছন্দ করতেন বেশী। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান ক্রনিকলারদের মতে 'পতন' কথাটার অর্থই হ'ল বৈষয়িক সর্বনাশ, যা যুদ্ধের ফলে অল্প বিস্তর সবদেশেই ঘটে থাকে। যেমন, ট্রয় বা কার্থেজের পতন। হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, তাঁরা বললেন 'পতন' কেবল বৈষয়িক নয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিকও বটে। রাজনৈতিক জীবনে যে পতন শুরু হয় তার প্রভাব পড়ে সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলায়। দেশের বিষয়-বৈভব, ঐশ্বর্য্য-সম্পদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনেও এক নিম্নগামিতা সূচিত হয়; অবক্ষয়ের ছাপ পড়ে সর্বত্র। পঞ্চম শতকে যে সার্বিক পতন রোমকে গ্রাস করল, তার ফলে প্রায় হাজার বছর ইউরোপে জ্ঞানের দীপটি আর জ্বলে নি। অমানিশার অন্ধকার দূর হ'ল পঞ্চদশ শতকের হিউম্যানিজমের উৎপত্তিতে। পেট্রার্ক হচ্ছেন প্রথম আধুনিক পণ্ডিত যিনি পুরাতন ও আধুনিক যুগের মধ্যে (এান্টিকা ও নোভার মধ্যে) একটি সীমারেখা টানতে সক্ষম হন। তাঁর মতে ইম্পিরিয়াল যুগে শাসক-শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারিতা, চার্চ্চের বিরোধিতা এবং বর্ব্বর জাতির আক্রমণ—রোমের পতনকে ত্বরান্বিত করে। ষোড়শ শতকে লুথারের আন্দোলনের ফলে চার্চ্চ দ্বিধা বিভক্ত হ'লে, ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট উভয় সম্প্রদায়ই রোমের পতন সম্বন্ধে ভিন্ন মত জারি করেন। ক্যাথলিকদের ধারণা শাশ্বত রোমের পতন কোন দিনও ঘটেনি, চার্চ্চেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব্ব হয়নি। প্রটেষ্টাণ্ট পণ্ডিতরা তা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা বললেন রোমের পতনের ফলে, ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতি 'ডার্ক এজের' অমানিশায় ঢাকা পড়ে গেল। রেণেসাঁসের যুগে হিউমানিষ্ট পণ্ডিতদের আবির্ভাবে মৃত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবার পুনরুজ্জীবন ঘটল—জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে দশ দিক উদ্ভাসিত হল।

সপ্তদশ শতকের "এরুডিটরা" কোন একটি দলের পক্ষ না নিয়ে, নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলেন। প্রাচীন পুঁথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ নিজেরা পড়ে

দেখে অতীত সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণায় আসতে চাইলেন তাঁরা। ল্যাটিন ভাষা ভাল করেই তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন। ল্যাটিনে মোটা মোটা গ্রন্থও রচনা করলেন তাঁরা। সে রচনা যেমন জটিল, তেমনি দুর্বোধ্য। পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণের সাধ্য ছিল না তাঁদের লেখা দস্তস্ফুট করতে পারে। গীবন এরুডিটদের কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী। এঁদের কাছ থেকে তিনি ল্যাটিনে লেখা পুস্তকের তালিকা সংগ্রহ করেন এবং কি ভাবে একটি বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করতে হয় তাও খানিকটা এঁদের দেখে শেখেন। কিন্তু যেহেতু গীবনের বাসনা ছিল যে তিনি যা শিখবেন তা যেন জনসাধারণ পড়ে আনন্দ পায় সেইজন্য তিনি কোন দিনই এরুডিটদের অন্ধ অনুকরণ করেন নি বা তাঁদের মত "ড্রাই-এ্যাজ্-ডাস্ট্" ঐতিহাসিক হবার চেষ্টা করেন নি।

১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম পরিদর্শন করার পর গীবন গভীর মনোযোগ সহকারে রোমের প্রাচীন ইতিহাস পড়তে শুরু করেন। "ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফল" লেখার পশ্চাতে ছিল দীর্ঘদিনের মনন, চিন্তন ও সাধনা প্রস্তুতি। স্যালাস্ট, লিভি, ট্যাসিটাস, প্লিনি, প্রভৃতির রচনাগুলি তো পড়ে ছিলেনই-তাছাড়া ফরাসী, জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় রোমান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে সবই যত্ন সহকারে পড়ে দেখেন। প্রায় কুড়ি বছর তাঁকে বই লেখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। পৈতৃক এস্টেট বুরিটনের প্রাসাদোপম বাড়ীতে বসে তিনি মনে মনে পরিকল্পনা করলেন ক'টি অধ্যায়ে তাঁর বিরাট বিষয়বস্তুকে ভাগ করে নেবেন। কয়েকটি সুস্পষ্ট অধ্যায় তার মনে রেখাপাত করল। যথা. ১ম অধ্যায়, ১৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত, যখন দুর্ধর্ষ উপজাতি গথ, ভিসিগথ, ভ্যাণ্ডেল প্রভৃতির বারংবার আক্রমণে অস্তিত্ব বিপন্ন (২) ২য় অধ্যায়, ৪৭৬ খ্রীঃ থেকে ৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত, যে সময়ে জাস্টিনিয়ান শার্লমান ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। (৩) ৩য় অধ্যায়ে (৮০০-১৪৫৩ খ্রীঃ, শার্লেমান থেকে কনস্টান্টিনোপল শহরের পতন পর্য্যন্ত। প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা শেষ করে গীবন বুরিটন ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসেন। লণ্ডনের ৭নং বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে বসে তিনি 'ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফ'ল এর প্রথম চারখণ্ড একটানা লিখে যান। এখনকার দিনের লেখকরা একজায়গায় স্থির

হয়ে বসে কিছু লিখতে পারেন না বৈচিত্র্যসন্ধানী লেখক ভাবেন, জড় পদার্থের মত এক জায়গায় বসে থাকলে লেখার মধ্যে একঘেয়েমির ভাব এসে যাবে, বুদ্ধি ভোঁতা ও মন শ্লথ হয়ে আসবে। কিন্তু পূর্বসূরীদের মধ্যে ধারণাটা ছিল একেবারেই ভিন্ন ধরনের। নিউটন, কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে একটানা ৩৫ বছর কাটিয়েছিলেন; গীবনও ৪র্থ খণ্ডের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত লণ্ডনের বাইরে বেরোন নি। এঁদের থেকে আমরা যে বেশী পরিশ্রমী বা বুদ্ধিমান সেকথা কি একবারও ভাবা চলে?

১৭৭৪-এর গ্রীষ্মকালে গীবন প্রথম ভল্যুম লেখা শেষ করলেন। এটি লিখতে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে, অনেক পড়তে হয়েছে। বহুবার একই পরিচ্ছেদ লিখেছেন আবার কেটেছেন। লিখতে আরম্ভ করে সবই তার গোলক ধাঁধা মনে হচ্ছিল: নিজের লেখা কিছুতেই মনের মত হচ্ছিল না। কিন্তু মনের এই দ্বিধা, সংশয় ও অনিশ্চয়তার ভাব কাটতে দেরী হ'ল না। ওস্তাদ শিল্পী তাঁর বাদ্যযন্ত্রে হাত দিয়ে অনেক সময় কি বাজাবেন ভেবে পান না, নানা এলোমেলো সুরের মধ্যে তাঁর মনের আসল সুরটি হারিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ তিনি সেই সুরটি খুঁজে পান ও বাজাতে আরম্ভ করেন যেটি তাঁর অন্তরের নিভৃত লোক থেকে উৎসারিত। তাঁর বাদ্যযন্ত্র তখন মুখর হয়ে ওঠে, সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন তিনি। গীবন প্রথমটা ঠিকভাবে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারছিলেন না। কিন্তু ক্রমশই এলোমেলো চিন্তাধারা সুস্পষ্ট বক্তব্যে ফুটে উঠতে লাগল, ভাষা হ'ল ঋজু ও প্রাঞ্জল, ছত্রগুলি পূর্ণতার মাধুর্যে নিটোল। ১৭৭৪-এ টমাস ক্যাডেল্ বইটি ছাপেন। প্রকাশিত হবার এক পক্ষ কালের মধ্যে প্রথম খণ্ড নিঃশেষিত হ'ল। যে যুগে শিক্ষিত ইংরাজ মহলে বই-এর এত দ্রুত কাটতি হচ্ছিল যে চাহিদা অনুযায়ী বই-এর জোগান দিতে পারছিল না প্রকাশকরা। সুযোগ বুঝে এক অসৎ ব্যবসায়ী ডাবলিন থেকে চোরাই সংস্করণ বাজারে ছেড়ে দিল।

"ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল" এর বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর, দিগন্তবিস্তৃত তার পট-ভূমিকা, বর্ণাঢ্য তার কাহিনী। সুধী পাঠক যদি মনোযোগ সহকারে গীবনের ইতিহাস পড়েন, তবে তিনি অতীতের এই কাহিনীর মধ্যে অষ্টাদশ শতকের নানা ঘটনাবলীর সুস্পষ্ট ছাপ খুঁজে পাবেন। দ্বিতীয় শতকের রোমের কথা

লিখবার সময় গীবন মনে মনে অষ্টাদশ শতকের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী ইংলণ্ডের কথাই ভেবেছিলেন। "In the second century of the Christian era the empire of Rome comprehended the fairest part of the earth and the most civilised portion of mankind."—গীবনের এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেন না, রোমের এই উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে ছিল দ্বিবিধ প্রেরণা—ব্যক্তি স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা-বোধ। রোমান নাগরিকরা স্বাধীনতার পূজারী—তারা দেশের আইন শৃঙ্খলাকে মান্য করতে জানে—সেইজন্যই তাদের এত উন্নতি। ১৮ শতকের হুইগ রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে এই ব্যাখ্যা বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ও ব্যবসাবাণিজ্যে স্ফীত ১৮ শতকের ইংরাজ বুর্জোয়ার সঙ্গে ২য় শতকের সুখী রোমানদের প্রভেদ কোথায়? দ্বিতীয় শতকের সূচনায় রোমে নূতন যুগের প্রভাত হয়েছে। প্রচণ্ড টাইবেরিয়াস, দুর্দ্ধর্ষ ক্যালিগুলা, নির্বোধ ক্লডিয়াস, নিষ্ঠুর নিরো ও নরপিশাচ ভিটেলিয়াস গত হয়েছেন। এঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বিখ্যাত 'পাঁচ-রাজা', সুবোধ শাসক হিসাবে যাঁরা ইতিহাসে সুবিদিত। এঁদের আবির্ভাবে স্বাধীনতার মলয় পবন মৃদুমন্দ হইতে শুরু করেছে—জনজীবন আবার হয়ে উঠেছে সুখী ও সচ্ছল। এমনযুগে জন্ম গ্রহণ করতে পারাটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ নয় কি? গীবন লিখেছেন যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি যুগ বেছে নাও, যে যুগে মানুষ সবচেয়ে বেশী সুখী ছিল তবে সে নিঃসন্দেহে বেছে নেবে রোমের ইতিহাসে সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে যা ডোমিনেয়নের মৃত্যু থেকে কমোডাসের আগমনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ (৯৬-১৪০ খ্রীষ্টাব্দে)। এই শতকের শ্রেষ্ঠ বীর ট্রাজানের বিজয় অভিযানের নিখুঁত বর্ণনা আছে গীবনের ইতিহাসে। তিনি ডেসিয়া, এশিয়া মাইনর, পার্থিয়া-সর্ব্বত্রই বিজয় গৌরবে ভূষিত। এক একটি যুদ্ধে জয় হয় আর সেই বার্তা বহন করে আনে দূত ও দৌবারিক। সিনেটের মহামান্য সদস্যরা হর্ষে পুলকিত। এই বর্ণনা আমাদের সমসাময়িক সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের একটি বিশেষ বছরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৭৫৯ বছরটি ছিল বিশেষভাবে স্মরণীয়—ইয়ার অব ওয়ানডারস—যখন ইংরাজরা ফরাসীদের একাধিক যুদ্ধে গোয়াডিলোপ, কুইবেকে, পর্য্যুদস্ত করে।

ভারতবর্ষে পলাশী, বন্দীবাসের পর ক্রমান্বয়ে এতগুলি জয় ইংরাজদের কল্পনাকে উদ্দীপিত ও মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। তারা দেখল ২য় শতকের দুর্দ্ধর্ষ রোমান সাম্রাজ্যের মতই তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে—ঔপনিবেশিক যুদ্ধে জয়ী হয়ে সসাগরা ধরিত্রীর শাসনভার তাদের হাতে এসে পড়েছে।

গীবন মনে করতেন রিপাবলিকান যুগে রোমের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সম্রাট আগাস্টাস্ কৌশলে এই স্বাধীনতা হরণ করেন। পরে 'পঞ্চরত্নের' শাসনকালে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সম্ভব হ'ল। ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারক ও বাহক রোমের সেনেট জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। যতদিন সমহিমায় সেনেট রাষ্ট্রজীবনে অধিষ্ঠিত ছিল, ততদিন রোমের শাসন শৃঙ্খলা নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। সেনেটকে যারা ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকল তাঁরা প্রকারান্তরে রোমের স্বাধীনতাকেই খর্ব্ব করল। সেনেট সম্বন্ধে গীবনের এই উচ্চ ধারণার অন্তর্নিহিত কারণ আছে। গীবন নিজে এই সময় পার্লামেণ্টে প্রবেশ করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে হুইগ নেতারা পার্লামেণ্টকে 'প্যালাডিয়াম অব লিবার্টি' বলে মনে করত সেই উচ্ছ্বাস তাঁর মনকেও স্পর্শ করেছিল।

অগাস্টাসের স্বেচ্ছাচারিতায় রোমের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছিল। প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছিল ইংলণ্ডে, যখন তৃতীয় জর্জ্জ স্বৈরাচারী শাসন কায়েমী বলে মনস্থ করেন। সময়ের ব্যবধান দুস্তর হলেও, অগাস্টাস ও তৃতীয় জর্জ্জের মধ্যে নিকট সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন গীবন। দ্বিতীয়তঃ, রোমের মিলিশিয়া ক্রমশই দুর্ব্বল হতে থাকল। নিম্ন শ্রেণীর সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিরা সৈন্য বিভাগে যোগ দেবার ফলেই এই শোচনীয় পরিণতি। দেখা দিল আদর্শ ও নীতি বোধের দারুণ অভাব। সেনাবাহিনীতে এখন থেকে প্রাধান্য পেল ভাড়াটে সৈন্যরা অর্থের বিনিময়ে যারা যে কোন অপরাধ করতে প্রস্তুত থাকে। এদের সমর্থনেই সেপ্টেমিয়াস শেভেরাস্ ১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমের সিংহাসন দখল করলেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মুখ্যত তাঁকেই দায়ী করেছেন ঐতিহাসিকরা।

সংহার-পর্ব্বের তিনিই প্রধান অভিনেতা—প্রপয় কাণ্ডের নট।

১৭৭৬-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ—এই চার বছর গীবন ২য় ও ৩য় ভল্যুম লিখতে ব্যস্ত ছিলেন। এই দুই খণ্ড প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হ'ল ১৭৮১ সালে। সমসাময়িক দুটি ঘটনা লেখকের মনে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের ছাপ পড়ল লেখার অনেকাংশে। প্রথম ঘটনা, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দ্বিতীয় ঘটনা তৃতীয় জর্জ্জের সঙ্গে পার্লামেণ্টের মত-বিরোধ। গীবন এই সময় বার্কের বক্তৃতা থেকে যে সারাংশ সংগ্রহ করতেন অথবা কফি হাউসে ফক্স-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যে সব খবর পেতেন, অজ্ঞাতসারে সেগুলি তাঁর মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করত। পরের দিন সকালে যখন লেখা নিয়ে বসতেন তিনি, সদ্য জানা সেই ঘটনার ছায়া পড়ত তাঁর রচনার উপর। ২য় এবং ৩য় ভল্যুমে হুইগ ভাবাদর্শ এত বেশী প্রাধান্য পেয়েছে যে এদুটিকে 'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল'এর হুইগ ব্যাখ্যা বললে অত্যুক্তি হয় না। হুইগ রাজনৈতিক আদর্শের যোগ্য ব্যাখ্যাতা হিসাবে পরিচিত হবার পর আশা করা গিয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতায় কায়েম হয়ে বসবেন গীবন। কিন্তু ঠিক বিপরীত ঘটনাই ঘটে গেল। গীবন তাঁর পার্লামেণ্টের আসন হারালেন। গভীরভাবে এই ব্যর্থতা গীবনের মনে বেজেছিল, যার জন্য পুরো একবছর মন দিয়ে কিছুই আর লিখতে পারেন নি তিনি। তার উপর চোখের সামনে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে গেল যা প্রবল ভাবে নাড়া দিল ঐতিহাসিকের মনকে। ১৭৮১ তে নর্থ মন্ত্রিসভার পতন হ'ল; পরের বছর পাশ হ'ল বার্কের রিফর্ম বিল যার ফলে বোর্ড অব ট্রেডের অবলুপ্তি ঘটল। এই বোর্ড থেকে গীবন বাৎসরিক ৭৫০ পাউণ্ড বেতন পেতেন অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা রূপে। এবার এই অর্থাগমের পথ বন্ধ হল। অর্থনাশের ফলে ইংলণ্ডে বাস করাই দুরূহ হল গীবনের। ১৭৮৩ সালে শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগী হয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডে বসবাস শুরু করলেন তিনি। যে সময়ে তিনি আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন, সে সময়ে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে ঝড় উঠেছে। নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গীবন তাঁর ৪র্থ খণ্ডটি শেষ

করেন। এতে সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের কথা আছে। সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে, সব ব্যর্থতা-পরাভবকে জয় করে জাষ্টিনিয়ান রোমের হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনলেন। এই কাহিনী তাঁকে নূতন প্রেরণা জোগাল। নিজের জীবনের ব্যর্থতা, পরাভব ও ভাগ্য বিপর্যয়কে তিনি সাময়িক বলে মনে করতে চেষ্টা করলেন। এই মনে করে সান্ত্বনা পেলেন যে অচিরেই তিনি সব ব্যর্থতা কাটিয়ে নূতন বলে বলীয়ান হয়ে উঠবেন এবং জীবনে চরম সাফল্য লাভ করবেন। কিন্তু গীবনের আদর্শ পুরুষ জাষ্টিনিয়ান কেবল বাস্তবেই বলীয়ান নন তিনি জগদ্বিখ্যাত তাঁর 'কোডের' জন্য, যা হচ্ছে তাঁর একমাত্র 'ফেয়ার অ্যাণ্ড এভারলাষ্টিং মনুমেণ্ট'। জাষ্টিনিয়ানের চরিত্র ব্যাখ্যার মধ্যে গীবন তাঁর একটি আদর্শ বা স্বপ্নের কথা অপ্রত্যক্ষভাবে বলে নিয়েছেন। গীবন আশা করেছেন, অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ড কেবল সামরিক শক্তিতে বড় হবে না ; তাকে সাহিত্য-শিল্পকলা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করতে হবে। এমন কি তাঁর বিশ্বাস যে ইংরাজদের স্বাধীনতা প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতা কালে রোমান ল'এর মত দৃঢ়-ভিত্তিক ও সর্বজনপূজ্য হয়ে উঠবে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভল্যুম লেখা হ'ল ১৭৮৪-৮৭-র মধ্যে। প্রথম চার ভল্যুমে ৪ শতাব্দীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন গীবন। কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড মিলিয়ে লিখলেন ৮ শতাব্দীর কাহিনী। বিষয়বস্তুর এই অসম বণ্টনের কারণ আছে। শেষ দুই ভল্যুম লসেনে বসে লেখা। এখানে তিনি এমন কোন বিদগ্ধ বন্ধু পান নি বিদ্যাবিত্তায় যিনি তাঁর সমকক্ষ এবং যাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তিনি উপকৃত হতে পারতেন। বিতর্ক ও সমালোচনার অভাবে বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভব হ'ল না। তবে পরিধি সীমিত হলেও, লেখার ধার কিছুমাত্র কমল না। পঞ্চম খণ্ড লিখতে ব্যয় হয় ২১ মাস, ষষ্ঠ খণ্ডে ১২ মাস। লসেনের শান্ত পরিবেশে গীবন মনে শান্তি পেলেন, ভুলতে পারলেন অর্থ ও প্রতিপত্তি নাশের কথা। কিন্তু ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ তাঁকে হতাশ করে তুলল। তখন নর্থ ও ফক্স-এর কোয়ালিশন মন্ত্রি-সভা ভেঙে পড়েছে ; ছোট পিট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। নূতন শাসকমণ্ডলীর মধ্যে এমন কাউকেও তিনি পেলেন না যাকে বন্ধুস্থানীয় বলে ভাবতে পারেন। নূতন যুগে তরুণ দেশনায়কের নেতৃত্বে ইংলণ্ড উপকৃত হল—কিন্তু গীবনের মন ভরল না। ছেলে-ছোকরারা ইংলণ্ডের শাসন ভার পেয়েছে—

এরা কি দেশের ভাল করবে?—বিমর্ষ মনে তাই চিন্তা করতেন ঐতিহাসিক।

ইতিহাস রচনায় গীবন যে ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার সূত্র পাওয়া যাবে লকের দার্শনিক আলোচনায় এবং নিউটনের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন অষ্টাদশ শতকের র‍্যাশানালিজম কি পরিমাণে এই দুই চিন্তাবীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। গীবন দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়েছিলেন এবং ফরাসী ভাষা ও ফরাসী সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকে চিন্তা ও মননক্ষেত্রে যেসব ফরাসী দার্শনিক বিপুল আলোড়ন এনেছিলেন তাঁদের সঙ্গে গীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। ভলটেয়ারের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৭৫৭ সালে ভলটেয়ার যখন লসেনে কিছু দিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন তখন গীবন জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিকের সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

ইতিহাস রচনায় গীবন কোন মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দেন নি কিন্তু ইতিহাসের যে সংজ্ঞা তিনি নির্দিষ্ট করেছেন তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁর কাছে ইতিহাস হচ্ছে..."a little more than the register of crimes, follies and misfortunes of mankind." প্রত্যেক যুগেই দু'একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক পাওয়া যাবে যাঁরা ইতিহাসের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতকে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন লিখেছিলেন, ইতিহাস হচ্ছে কোন উন্মাদের আত্মচরিত। মনীষী টলস্টয়েরও একটি উক্তি আছে যার অর্থ হ'ল, বধির ব্যক্তি প্রশ্ন না বুঝেই যে অর্থহীন উত্তর দেয় বা অসঙ্গত প্রলাপ বকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু অনেকটা সেই ধরনের। গীবন কিন্তু ইতিহাসের সংজ্ঞাই দেন নি, ঐতিহাসিকের নৈতিক দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ইতিহাসের পাতায় মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও অপকীর্তির কাহিনী পড়বেন এবং সেই সঙ্গে চিন্তা করবেন কি করে মানুষ সেগুলি থেকে বিরত থাকবে। সেযুগের আদর্শবাদী সকল লেখকের মতই গীবন ভাবতেন, ইতিহাস মানুষকে সৎপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে, তার অন্তরের নীতিবোধকে জাগ্রত করে তুলবে। গীবন লিখেছেন, "History which undertakes to record the transactions of the past,

for the instruction of the future ages, would ill deserve that honourable office, if it condescended to plead the cause of the tyrants and justfy the maxims of persecution."

ইটালীয় সমালোচক অরনাল্ডো মমিগ্লিয়ানো বলেছেন একদিকে হিউম্যানিষ্ট পণ্ডিত ও অপরদিকে ঐতিহাসিক-দার্শনিক,—এই উভয় মেরুর মাঝামাঝি কোন নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল বেছে নিয়েছিলেন গীবন। এই দুই মেরুর অধিবাসীদের মধ্যে যে তীব্র মতভেদ আছে তার পরিচয় আছে গীবনের প্রথম জীবনের রচনা, "এসে স্যুর"-এ। ফরাসীতে লিখিত এই প্রবন্ধে তিনি ক্ল্যাসিক্‌সে সুপণ্ডিত এরুডিটদের পক্ষ অবলম্বন করে দ্য' এলেমবার্ট প্রমুখ ফরাসী দার্শনিকদের কঠোর সমালোচনা করেন। এরুডিটরা অত্যন্ত পরিশ্রম-সহকারে ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করতেন। অন্যদিকে দার্শনিকরা ফ্যাকট্ বা তথ্যকে সহ্যই করতে পারতেন না। ভলটেয়ারের ভাষায় ফ্যাকট্ হচ্ছে "ভেরমিন্ দ্যাট ডেসট্রয় গ্রেট্ ওয়ার্কস"। তথ্যের অতিসরল ব্যাখ্যা করে দার্শনিকরা তাঁদের মতামত জাহির করতেন, অনেক সময় কল্পনা-শক্তির আশ্রয় নিয়েও। গীবন এই আপাতবিরোধী ধারার মধ্যে এক সমন্বয় সাধন করেছিলেন এবং এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। মূল আকর গ্রন্থাদি পড়ে (অধিকাংশ ল্যাটিন বা গ্রীকে লেখা) তিনি তথ্য চয়ন করতেন, তারপর সেই তথ্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে তবে তাকে তাঁর গ্রন্থে স্থান দিতেন। পাঠকের সামনে তথ্যকে উপস্থাপিত করার সময় ভাষার যাদুদণ্ড স্পর্শে গীবন তাকে প্রাণময় ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে জানতেন। ট্রেভেলিয়ান তাঁর আত্মচরিতে গীবন সম্পর্কে যে বিখ্যাত উক্তিটি করেছেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"In Gibbon, the perfection both of science and art of history was reached and has never since been surpassed."

যদিও নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে অতীত-অন্বেষণ গীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল—তবু খৃষ্টান চার্চ্চের আলোচনায় তিনি তাঁর নিজস্ব প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। গীবনের চার্চ্চ-বিরোধী মতামত ঐতি-

হাসিকদের মধ্যে তীব্র বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি করেছে। গীবনের মতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিকাশ ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই রোমান জগতের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো; বর্ব্বর জাতির আক্রমণ ও চার্চ্চের সাফল্য চলেছিল সমতালে। আত্ম-চরিতে গীবন আরও বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন…"the propagation of the gospel and the triumph of the church are inseparably connected with the decline of the Roman monarchy. I weighed the causes and effects of the Revolution."…এখানে 'রেভলুশন' শব্দটির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ফরাসী বিপ্লবের কথা ভেবে তিনি আতঙ্কিত হতেন। তাঁর চোখে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আন্দোলন ও ফরাসী বিপ্লব প্রায় অভিন্ন ছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকরা যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন তারই ঘূর্ণী হাওয়ায় প্যাগান মূল্যবোধ ধূলিস্যাৎ হল, বিধ্বস্ত হল রোমের রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যবস্থা। ঠিক একইভাবেই ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সে 'আসিয়েঁ রেজিমকে' সমূলে উৎপাটিত করেছিল।

গীবন যে শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন সেই শতাব্দীর আকাশে বাতাসে চার্চ্চ-বিরোধী ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। চার্চ্চ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন ফরাসী দার্শনিক ভলটেয়ার, যাঁর বিখ্যাত উক্তি, "E'crasez L'infame", তাঁর তিক্ত মনোভাবের পরিচয় বহন করছে। চার্চ্চের কুসংস্কার, দুর্নীতি ও প্রগতিবিরোধী চিন্তাধারা—সব কিছুকেই তিনি তীব্র কশাঘাত করেছিলেন। গীবনের মনোভাব যদিও অতটা তিক্ত ছিল না, তবু তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে চার্চ্চের কুসংস্কার মেনে নেওয়ার অর্থই হল অধর্ম্ম আচরণ করা। চার্চ্চ সম্বন্ধে গীবন তাঁর বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন 'ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফলের' পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য পড়ে ক্ষুণ্ণ হলেন অনেকে, পত্রপত্রিকাতেও বিতর্কের ঝড় উঠল। গীবন ভাবতে পারেন নি তাঁকে এ জাতীয় প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হবে। আগে বুঝলে পরিচ্ছেদ দুটি অন্যভাবে লিখতেন তিনি। এই দুই পরিচ্ছেদে গীবন যা বলতে চেয়েছেন তার একটু বিস্তারিত আলোচনার দরকার। তাঁর মতে প্রথমযুগে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাফল্যের মূলে প্রত্যক্ষ দুটি কারণ বিদ্যমান। যথা, ধর্ম্মের

অন্তর্নিহিত শক্তি যা হাজার হাজার লোকের চিত্ত জয় করে নিয়েছিল এবং পরিত্রাতা যীশুর জীবন ও বাণী। এই কারণগুলির সঙ্গে যুক্ত হল গৌণ আরও পাঁচটি কারণ (১) খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোন্মাদনা—যা ইহুদীদের সংস্পর্শে এসে খ্রীষ্টানরা পেয়েছিল (২) সাধুসন্ত ও ধর্ম্ম প্রচারকদের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস —এই বিশ্বাস জনসাধারণকেও প্রভাবিত করল এবং সাধুসন্তদের কাছ থেকে তারা অমরত্বের সন্ধান পেয়ে ধন্য হল। (৩) "মিরাকল্"-এ বিশ্বাস ধর্ম্ম প্রচারকরা বলতেন খ্রীষ্টানদের সাফল্য সম্ভব হয়েছে সাধুসন্তদের অলৌকিক ক্ষমতা বলে। গীবন আদৌ 'মিরাকল্'-এ বিশ্বাস করতেন না। (৪) খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদের বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন এবং (৫) তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা, ও নিয়মানুবর্তিতা—তাদের জয়লাভে সহায়তা করে।

মোট কথা, গীবন বলতে চান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সাফল্য এসেছিল স্বাভাবিক কারণেই, সাধুসন্তদের অপার্থিব বা অলৌকিক ক্ষমতা বলে নয়। দ্বিতীয় কথা, প্রথমযুগের খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে অতিমাত্রায় ধর্ম্মান্ধতার সন্ধান পেয়েছিলেন গীবন। রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা অনেক আছে যেখানে দেখা যায় প্যাগান শকদের হাতে খ্রীষ্টানদের চরম নিগ্রহ ঘটেছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় যেভাবে অন্য সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাত তুলনামূলক ভাবে রোমান সম্রাটদের আচরণ অপেক্ষা তা অনেকগুণ বন্য ও হিংস্র। এসব কথা প্রকাশ্যে বলার ফলে, ফল হল মারাত্মক। একদল মন্দবুদ্ধি কুচক্রীব্যক্তি, গীবনকে খ্রীষ্টধর্ম্মের শত্রু বলে অভিহিত করতে থাকলেন। ইংলণ্ডের আইনে এমন কথা আছে যে, যে ব্যক্তি অন্ততঃ দু'বার লিখিতভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতাকে অস্বীকার করেন তাকে তিনবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। গীবন কিন্তু কোনদিনই খ্রীষ্টধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে অস্বীকার করেন নি। খ্রীষ্টানদের অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামিকে আঘাত করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যাঁরা গীবনের লেখায় তথ্যগত ভুল বার করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। সমসাময়িক বিখ্যাত ক্ল্যাসিকাল পণ্ডিত রিচার্ড পোরসন বলেছেন যে গীবনের সমগ্র লেখা যত্নসহকারের পড়েও তিনি একটিও ভুল তথ্য বা অশুদ্ধ উদ্ধৃতি খুঁজে পাননি। ডেভিস্ নামক অক্সফোর্ডের এক রাগী-ছোকরা একটি পুস্তিকা প্রচার করে

গীবনকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করে। তার বক্তব্য গীবন ইচ্ছে করেই ভুলতথ্য পরিবেশন করেছেন। 'Vindication' লিখে গীবন তার প্রত্যুত্তর দিলেন। তাঁর যুক্তি এত বলিষ্ঠ, বক্তব্য এত স্পষ্ট ও নির্ভুল যে বিরুদ্ধ সমালোচকদের মুখ চিরদিনের মত বন্ধ হ'ল। ডীন মিলম্যান লিখেছেন "Gibbon with a single discharge from his ponderous artillery of learning and sarcasm laid prostrate the whole disorderly squadron of his attackers."

লেখক হিসেবে গীবন অনিন্দ্যসুন্দর স্টাইলের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচনায় সর্বত্রই চোখে পড়ে গ্রন্থের কঠিন ক্ল্যাসিক্যাল দার্ঢ্য। বিষয়বস্তু যেমন গুরুগম্ভীর, ভাষাও তেমনি ঋজু ও বলিষ্ঠ। 'ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফলের' একটি অনুচ্ছেদ পাঠক যদি উচ্চৈঃস্বরে পড়েন তবে তাঁর মনে হবে একদল রোমান সৈন্য যেন ভারী বুট পায়ে সমতালে মার্চ্চ করে চলেছে। দুটি কারণে গীবনের কৃতিত্ব অসাধারণ। প্রথমতঃ, তিনি রোমের ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করে পথপ্রদর্শক হিসাবে এমন কোন লেখককে পান নি, যাঁর রচনাকে তিনি আদর্শ হিসাবে চোখের সামনে রাখতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, ক্ল্যাসিকাল লেখকদের মধ্যে অনেক নিকৃষ্ট ধরনের লেখক ছিলেন, যাঁদের লেখা বোঝা যেমন দুরূহ, পড়া তেমনই ক্লান্তিকর। গীবন কিন্তু সকলের লেখাই সমান শ্রদ্ধাসহকারে পড়েছিলেন—নিকৃষ্ট বা দুরূহ বলে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। 'ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফলে' এমন অনেক বিখ্যাত অধ্যায় আছে যেখানে লেখকের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর বর্ণনানৈপুণ্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।

(১) ৪৭ অধ্যায় জীবন 'ডকট্রিন্ অব ইনকারনেশন্' সম্পর্কে লিখেছেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপর অসাধারণ দখল না থাকলে এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা গীবনের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। এই অধ্যায়টি পাঠ করে ডীন মিলম্যান ও রেভাঃ রিচার্ড পোরসন (উভয়ই চার্চ্চের অন্তর্গত) ঐতিহাসিককে সাধুবাদ দিয়েছেন।

(২) ১৭ অধ্যায়ে গীবন দ্বাদশ শতকের কনস্টানটিনোপল্ শহরের একটি নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। জীবনে কোনদিন কনস্টানটিনোপল শহর দর্শন না

করেও যিনি এমন জীবন্ত ও উজ্জ্বল চিত্র আঁকতে পারেন তাকে যাদুকর ছাড়া আর কি ভাবা চলে!

(৩) মহম্মদের জীবন ও ইসলাম সম্বন্ধে যে অধ্যায়টি আছে সেটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। গীবন আরব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, তার জল হাওয়া, ভূপ্রকৃতি, মনুষ্য চরিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে ভুল নেই। এজাতীয় ভৌগোলিক বর্ণনায় তিনি ক্রমশই সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন।

(৪) যুদ্ধ বর্ণনায় গীবন সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বেলাসেরিয়াস ও নারসেস্-এর সামরিক অভিযান সম্পর্কে যে সব খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা পড়ে মনে হয় যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলেন।

(৫) ৩১ অধ্যায়ে বর্ব্বর জাতির আক্রমণের পূর্বে রোমের অবস্থা যেরূপ ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন গীবন। এই বর্ণনা যেমন উপভোগ্য—তথ্য পরিবেশনও তেমনি নির্ভুল।

(৬) 'ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফল' বর্ণাঢ্য চরিত্রের বিশাল এক চিত্রশালা। চিত্রগুলি এক নিপুণ শিল্পীয় রঙ ও তুলিতে উজ্জ্বল ও জীবন্ত ভাবে ফুটে উঠেছে। চিত্রের শোভাযাত্রায়, যেগুলি গভীরভাবে আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে সেগুলি হল—কনস্টানটাইন, স্টিলিকো, এ্যালারিক, এটিলা, জাষ্টিনিয়ান, থিওডোরা বেলাসেরিয়াস, গডফ্রে অব বুইলোঁ প্রভৃতির।

শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলে অভিনন্দিত হলেও ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফলের মধ্যে নানা ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে যেগুলি নিয়ে ঐতিহাসিক-সমালোচকরা যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। প্রথম কথা, গীবন বর্ণনাতে যতটা সিদ্ধহস্ত, ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে ততটা নন। ঘটনাকে তিনি বাইরে থেকে দেখে বিচার করতেন তার চাকচিক্যে আকৃষ্ট হতেন বেশী। কিন্তু কঠিন স্তর ভেদ করে, ঘটনার অন্তঃমূলে প্রবেশ করার যথেষ্ট শক্তি তাঁর ছিল না। গ্রীক ইতিহাসের একটি বিখ্যাত ঘটনা—গ্রীক গণতন্ত্রের দেবতা Hermaea মূর্ত্তির অবমাননা যা সিসিলি অভিযানের প্রাক্কালে সমস্ত এথেনীয়ানদের স্তম্ভিত করে দেয়। ঘটনাটি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ঐতিহাসিক গ্রোট তাঁর ইতিহাসে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুদীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠা ধরে। গ্রোট সমাজবিদ্যা ভাল করে পড়েছিলেন—তাই সামাজিক

শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের সঠিক মূল্যায়ন তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। গীবনের সময় সমাজ বিদ্যার চর্চা তেমন এগোয় নি তাই গীবন নিজেও এসম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না যার ফলে তাঁর দৃষ্টি অস্বচ্ছ থেকে গেছে। দ্বিতীয় কথা, আকর গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তার আনুপূর্ব্বিক বিচার বিশ্লেষণ গীবনের সাধ্যের অতীত ছিল। তাঁর অনেক পরে ঊনবিংশ শতকের জার্মান পণ্ডিতরা গবেষণার এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলন করেন। কেবলমাত্র ছাপার অক্ষরে যে সব পুরাতন ক্ল্যাসিকস্ সে আমলে পাওয়া সম্ভব ছিল সেগুলি কাজে লাগিয়েছিলেন গীবন, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান তিনি নিতে পারেন নি। ল্যাটিন ভাষা তিনি যতটা জানতেন সেই অনুপাতে গ্রীক ভাষায় তাঁর ততটা দখল ছিল না। গীবন ল্যাটিন লেখকদের আপেক্ষিক গুণাগুণ নিখুঁত ভাবে নির্দ্ধারণ করতে পারতেন। এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি জাস্টিনিয়ান যুগের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে প্রকোপিয়াস নামক এক ল্যাটিন লেখকের রচনা থেকে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেন। ঊনবিংশ শতকের জার্ম্মান বিশেষজ্ঞদের মতে প্রকোপিয়াস দায়িত্বজ্ঞানহীন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি তাঁর কোন কথাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। বিংশ শতকের গবেষকরা কিন্তু প্রকোপিয়াসকে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে করেন। এতে পরোক্ষভাবে গীবনকেই সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু গীবনের ভুল হয়েছিল একক্ষেত্রে। তিনি সব ল্যাটিন লেখকদের সমসাময়িক জ্ঞান করতেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম দুই শতকে জার্ম্মানীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সিজার ও টাসিটাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। এঁরা কিন্তু সমসাময়িক নন; সিজারের এক শতাব্দীর পর ট্যাসিটাসের আবির্ভাব। গীবন এই দুই ক্ল্যাসিকাল লেখকের মধ্যে সময়ের কোন প্রভেদ করেন নি। তাঁর লেখা পড়ে মনে হবে দুজনই যেন একই শতাব্দীর অধিবাসী। ঊনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক গবেষণার রীতি অনুযায়ী দুই লেখককে আলাদা করে দেখানো উচিত এবং তাঁদের অন্তর্বর্ত্তী এক শতাব্দীর ব্যবধানে জার্মানীর সমাজ জীবনের কোন পরিবর্তন ঘটেছিল কিনা তাও অনুসন্ধানসাপেক্ষ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে যে নূতন ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে তার পরিচয় আছে বিউরি, জোন্‌স বা ফার্দিনাণ্ড নট প্রভৃতির লেখাতে। বলাবাহুল্য সেগুলি গীবনের নাগালের বাইরে ছিল।

কবি কোলরিজ তাঁর টেবল টকে প্রশ্ন তুলেছিলেন গীবনের ইতিহাস কি সত্যি রোমান সাম্রাজ্যের ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফলের ইতিহাস? তাঁর মতে নামটি ভ্রমাত্মক, কেননা সমস্ত বই-এ 'পতনের' অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। কোলরিজের অভিযোগ সত্য। গীবন পতনের কারণ নিয়ে কোন সূক্ষ্ম আলোচনায় নামেন নি: 'পতন' কথাটির অর্থ কি এবং 'পতন' যদি হয়েই থাকে কিসের পতন হ'ল—এই সব কূট প্রশ্নের মীমাংসা করেন নি। তৃতীয় ভল্যুমে মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদ পাওয়া যায় যার মধ্যে পতনের সম্ভাব্য কারণ তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু সে আলোচনা সম্পূর্ণ নয়। এখনকার ঐতিহাসিকদের মতে তৃতীয় শতকের অর্থনৈতিক সঙ্কটই রোমের পতনকে ত্বরান্বিত করে। অথচ এদিকটা নিয়ে গীবন তেমন আলোচনা করেন নি। অর্থনৈতিক কারণ সম্বন্ধে তিনি যে আদৌ কোন খবর রাখতেন না তা নয়। তাঁর নোটগুলির মধ্যে সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান প্রশ্ন ও মন্তব্য আছে যার সূত্র ধরে নূতন অনুসন্ধান চালান যায়।

রোমান রাজারা কয়েকটি বর্ব্বর উপজাতিকে প্রত্যন্ত প্রদেশে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে সৈন্যবাহিনীতে ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়। এর ফলাফল ভাল হল, না মন্দ হ'ল এ সম্বন্ধে কোনদিনই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি গীবন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন এই ব্যবস্থা রোমান শাসকদের শুভবুদ্ধির পরিচায়ক। পরে আবার মত পরিবর্ত্তন করে বলেছেন এর ফলেই নাকি রোমের সর্বনাশ ত্বরান্বিত হ'ল। বর্ব্বর জাতির আক্রমণে যখন রোমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে তখন রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরেই রোমনদের মত সুশিক্ষিত ও সুসভ্য একদল গথ, ভ্যাণ্ডাল ও ফ্রাঙ্ক সুখে বসবাস করছিল। রোমের বিপদের দিনে, এরা বহিরাগত বর্ব্বরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল এবং মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল। বর্ব্বর জাতির এই দুই শ্রেণীকে গীবন ভাল ভাবেই চিনতেন কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে প্রভেদটি ভাল করে তুলে ধরেননি।

৪র্থ খণ্ডে গীবন জাস্টিনিয়ানের কথা লিখেছেন। এটি তাঁর একটি স্মরণীয় অধ্যায়। তবে এর মধ্যে রাণী থিয়ডোরা সম্পর্কে যেসব কথা

লিখেছেন তা সুরুচির পরিচায়ক নয়। যদিও বর্ণনা বহুলাংশে প্রকোপিয়াসের কাছ থেকে নেওয়া এবং কোথাও কাল্পনিক নয়, তবু মনে হয় এগুলি লিখে তিনি ইতিহাসের পাতা কলঙ্কিত না করলেই পারতেন। রাণী ফাউস্টিনা সম্পর্কেও অনেক আপত্তিকর বর্ণনা দিয়েছেন গীবন। রিচার্ড পোরসনের মতে আদিরসাত্মক আলোচনার দিকে গীবনের এই প্রবণতা—তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতাকেই বেশী করে উদ্ঘাটিত করেছে।

৪৮ অধ্যায়ে গীবন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। অধ্যায়টি পক্ষপাতদুষ্ট। গীবন বাইজানটাইন সভ্যতার প্রতি সুবিচার করেননি এবং এমন সব বিরূপ মন্তব্য করেছেন যা সমর্থনযোগ্য নয়। হেরাক্লিয়াসের আমল থেকে বাইজানটাইন ইতিহাসের যে অধ্যায় শুরু হ'ল গীবনের কাছে তা বৈচিত্র্যহীন ও ক্লান্তিকর কাহিনী, "a tedious tale of weakness and misery." এরাজ্যের অধিবাসীরা গ্রেকো-রোমান সভ্যতার বংশধর বলে দাবি করলেও "they are neither softened by the weakness of humanity, nor animated by the vigour of memorable crimes". বাইজানটাইন আর্টও গীবনের কাছে 'the last degeneracy of taste and genius'—একদেশদর্শিতার চরম নিদর্শন এর থেকে আর কি হতে পারে! অবশ্য গীবনকে দোষারোপ করে লাভ নেই। বাইজানটাইন সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি যে সব উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন সেইগুলিই ছিল পক্ষপাতদুষ্ট। এখনকার ঐতিহাসিক বাইজানটাইন সভ্যতা সম্বন্ধে যে সব তথ্য জেনেছেন তার সাহায্যে গীবনের এই অধ্যায়টিকে নূতন করে ঢেলে সাজান চলে।

গীবনের স্টাইল দোষমুক্ত নয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাঁর সুদীর্ঘ পঙক্তিগুলি স্থানে স্থানে কেমন যেন আড়ষ্ট ও কৃত্রিম; তার মধ্যে না আছে সহজ সচ্ছন্দ গতি, না আছে নমনীয়তা। তাঁর বহু কথিত বর্ণাঢ্য উক্তিগুলি শ্রুতিমধুর হলেও যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। দ্বিতীয়তঃ, কবি কোলরিজ দেখিয়েছেন কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বা স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনায় গীবনের রচনা ছন্দময় সুললিত গদ্যে পরিণত হয়; যা তুচ্ছ বা যা অকিঞ্চিৎকর তা তার মনকে স্পর্শ করে না। মনে হয় তিনি যেন এক পর্বত চূড়া থেকে অন্য পর্বত চূড়ায় কেমন অনায়াসে যাতয়াত করছেন, উপত্যকার পাদভূমি না ছুঁয়েও।

নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও গীবনের ইতিহাসকে যুগান্তকারী সৃষ্টি আখ্যা দেওয়া যায়। ইংরাজ-জাতীয় জীবনে এই বই-এর প্রভাব অপরিসীম। যে সময় ইংলণ্ড তার আমেরিকার উপনিবেশগুলি হারাতে বসেছে সেই সময়ে গীবন তার ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফল রচনা করেন। পশ্চিম ইউরোপের কথা বলতে বলতে লেখক উপনীত হলেন পূর্ব দিগন্তে, যেখানে রোমান সাম্রাজ্য আরও দীর্ঘদিন টিকে ছিল। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের কাহিনী প্রসঙ্গে গীবন হয়ত ভারতবর্ষের কথা ভেবে থাকবেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন আমেরিকা হস্তচ্যুত হ'ল—কিন্তু তাতে দুঃখ কিছু নেই, ইংলণ্ডের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে ভারতবর্ষকে অধিকার করতে পারলে। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের কাহিনী পাঠকের দৃষ্টিকে পূর্বদিকে নিবদ্ধ করল, যেখান থেকে আর একটু অগ্রসর হলেই দিকচক্রবালে ভারতের বেলাভূমির অস্পষ্ট রেখা চোখে পড়বে। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা গীবনের কাছ থেকে এই পাঠ নিতে দেরী করে নি। শেষ দু'ভল্যুমে গীবন, পাইন ও পান বনাক্কলে 'হোয়াইট-ম্যান্‌স্ বারডেনের' কথা তাঁর দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডে সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা উইনস্টন চার্চ্চিলের জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। ১৮৯৬ সালে ২২ বছরের যুবা চার্চ্চিল সাহেব অশ্বারোহী বাহিনীর তরুণ অফিসার হিসাবে ভারতে (বাঙ্গালোরে) অবস্থান করেছেন। তাঁর ইচ্ছা হ'ল অবসর মুহূর্তে ইংরাজী ক্লাসিকস্ পড়ে ইংরাজ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয়কে আরও নিবিড় করে তুলবেন। সর্বপ্রথম যে বইটি তিনি পড়তে সুরু করলেন সেটি গীবনের 'ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফল'। 'মাই আর্লি লাইফ্' গ্রন্থে চার্চিল লিখেছেন—'I was immediately dominated both by the story and the style. All through the long glistening middle hours of the Indian day, from when we quitted stables till the evening shadows proclaimed the hour of polo, I devoured Gibbon. I rode triumphantly through it from end to end and enjoyed it all'. সাহস ও শক্তিমত্তাসম্পন্ন নির্ভীক দেশনায়ক জাতির জীবনের ঘোর দুর্দিনে দিশেহারা না হয়ে অবিচলিত চিত্তে আপন কর্তব্য কাজ করে চলেছেন, এমন চিত্র অনেক আছে 'ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফল'-এ। গীবনের লেখা চার্চ্চিলকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৪০ সালে

চার্চ্চিলের নেতৃত্বে ইংলণ্ড বিপদ-জালে আচ্ছন্ন হয়েও যে মনোবল নিয়ে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়েছিল সে ঘটণা স্মরণ করলে মনে হয় 'ডিকলাইন অ্যাণ্ড ফল' পড়া চার্চ্চিলের ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছিল।

এযুগে গীবন বাতিল হয়ে গেছেন একথা তাই বিশ্বাস হয় না। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি দু'শো বছর ধরে অনির্বাণ দীপশিখাটির মতই জ্বলছে। ঊনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান গীবন সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছিলেন তা আজও সত্য। "That Gibbon should ever be displaced seems impossible. He remains the one historian of the 18th century whom modern research has neither set aside nor threatened to set aside. We may correct and improve from the stores which have been opened since Gibbon's time; we may write, again large parts of his story from other and often truer and more wholesome points of view, but the work of Gibbon, as a whole, as an encyclopaedic history of thirteen hundred years, as the grandest of historical designs, carried out alike with wonderful power and with wonderful accuracy, must ever keep its place. Whatever else is read, Gibbon must be read too".

গ্রন্থপঞ্জী

1. Gibbon—The History of the Decline and Fall of the Roman Empire—Edited in 7vols by J. B Bury (1800-1900)
2. The autobiography of Edward Gibbon—Edited by John Murray, 1896
3. J. C. Morrison—Gibbon (English Men of Letters Series, London. 1878)
4. A. Cecil—Six Oxford Thinkers (Lond, 1909)
5. J. M. Robertson—Gibbon (Lond., Wall & Co 1925)
6. D. M. Low—Edward Gibbon (Lond, Chatto & Windus, 1937)
7. G. M. Young—Gibbon (Lond, Rupert Hart-Davis, 1948)

8. Peter Quennell—Four Portraits of the Eighteenth Century (Lond, Collins, 1940)
9. Michael Joyce—Edward Gibbon (Lond, Longmans, 1953)
10. Swain—Edward Gibbon, the Historian (Lond, Macmillan, 1960)
11. Gavin de Beer—Gibbon and his World (Lond, Thames & Hudson, 1968)
12. Harold Bond—The Literary Art of Edward Gibbon (Oxford, Clarendon Press, 1960)
13. Arnold Momigliano—Studies in Historiography (Lond, Weidenfield and Nicholson, 1960)
14. Article on Gibbon in the DNB by Leslie Stephens
15. Article on Gibbon in Encyclopaedica Britannica by J. B. Bury.

Calcutta Historical Society Publications

Little's House of Jagatseth
Edited with introduction by
Dr. N. K. Sinha — Rs. 15·00

Bengal Past & Present
(A Journal of Modern Indian & Asian History.)
Speial Number Annual Subscription — Rs. 20·00
Sir Jadunath Centenary volume (December 1970) — Rs. 15.00

33/1, AMHERST STREET,
CALCUTTA —9

With best compliments from

UNIVERSAL EMPORIUM
KHAGOL-PATNA

(LEADING DEPARTMENTAL STORE)

With Compliments of

EAST INDIA RUBBER WORKS (P) LTD.

162, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA-7

DAS GUPTA & CO.

PRIVATE LIMITED

BOOKSELLERS SINCE 1886

54 3, College Street, Calcutta-12

PHONE :- 343875 & 346547

STUDENTS BOOK SUPPLY

15, COLLEGE SQUARE,

CALCUTTA-12

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত সংশোধিত সিলেবাস No. Sy II PN/21/61 dated 9 5 68 অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি আপনার মনোনয়ন প্রার্থী।

1. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ১ম ভাগ—ডঃ এন, রায় for VI
2. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ৪র্থ ভাগ—ডঃ এন, রায় for IX.X
3. ভারত কথা—অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় (for H. S. or S. F.)
4. প্রাথমিক অর্থ শাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ for IX, X or XI, (H.S)
5. প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ for IX, X (S.F)
6. বাণিজ্যিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ ও অধ্যাপক ভবেশ ভট্টাচার্য্য (H.S. Com)
7. অর্থনৈতিক ভূগোলের ভূমিকা— অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী (H.S.Com)
8. বাণিজ্যিক ভূগোলের ভূমিকা —অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী (S F Com)

ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড | পৌষ-চৈত্র ১৩৭৭ | ৩য় সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

দ্বিতীয় পর্ব

(১)

১৯৪২ সনের জুলাই মাসে আমি ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় আমার নিজের বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করি। তখন আমার বয়স ৫৪ বৎসর পূর্ণ হয়নি এবং স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। সুতরাং ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী একটা স্থির করতে হল। বলা বাহুল্য ইতিহাসের বই লেখাই আমার লক্ষ্য হল। বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশের যে ইতিহাস আমি ঢাকায় থাকতে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম সেইটি শেষ করাই প্রথম কর্তব্য মনে করলাম এবং তদনুসারে কিছু পড়াশোনাও আরম্ভ করলাম এ সম্বন্ধে পরে সবিস্তারে লিখব। কিন্তু এই সময় ঘটনাচক্রে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমাকে যোগ দিতে হয়। আমার জীবনে ব্যবসা করা এই প্রথম এবং শেষ। এই কাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কয়েকজন ছাত্রের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, একটু সবিস্তারে সেইকথা বলছি।

ঢাকায় শচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য নামে আমার একজন ছাত্র ছিল। আমি যখন জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট তখন সে ঐ হলেই বাস করত। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হয়ে তার ব্যক্তিত্ব, অধ্যবসায় এবং চরিত্রের যে পরিচয় পাই তাতে তার প্রতি আমি খুব আকৃষ্ট হই। ছেলেটি ছিল খুব গরীব; পড়াশোনার খরচ চালান তার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। আমি তাকে একটি স্টাইপেণ্ড দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু তাতেও তার কুলতো না বলে

আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য তাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলাম। এই সময় সে আমার বিশেষ অনুগত এবং আমার প্রতি অনুরক্ত ছিল। শচীন তেমন মেধাবী ছাত্র ছিল না ; কিন্তু একবারেই সে বি এ পাশ করে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন তুমি কি করবে ?" সে বললে, "এম. এ পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না এবং কেবল বি. এ পাশ করে কোন ভাল চাকরী পাওয়া যাবে না। এজন্য স্থির করেছি আর পড়াশোনা না করে ব্যবসা করব।" শুনে আমি একটু আশ্চর্য্য হলাম, বললাম, "তোমার তো টাকা পয়সা কিছু নেই। ব্যবসা করবে কি করে ?" সে বললে, "মাড়োয়ারীরা তো এদেশে কেবল লোটা কম্বল নিয়ে আসে ; তারপর বড় ব্যবসা ফাঁদে। আমিও সেই চেষ্টা করব, তবে ঢাকায় সুবিধে হবে না ; আমি কলকাতায় যাব। আমাকে আশীর্বাদ করুন।" কিন্তু ব্যবসায় তার সফল হবার সম্ভাবনা ছিল বলে আমার মনে হল না। তবুও আমি তাকে আশ্বাস জানিয়ে এবং আশীর্বাদ করে বিদায় দিলাম। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে সে আমায় জানাত ছোটখাট কি ব্যবসা সুরু করেছে। সে সব কথা ঠিকমতো এখন আর আমার মনে নেই।

তিন চার বছর পরে শচীন আমাকে লিখে জানাল সে এবার একটা ব্যাঙ্ক খুলেছে এবং জগন্নাথ হলের কয়েকজন ছাত্র তার সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। এদের সকলকে আমি ভালই চিনতাম। কিন্তু একটা ব্যাঙ্ক চালান যে এদের পক্ষে সম্ভব তা কখনই ভাবতে পারিনি। সে এই ব্যাঙ্কের নাম দিয়েছিল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। ঐ নামে আর একটি ব্যাঙ্ক ছিল। তারা আপত্তি করায় নামটা একটু বদলে নতুন নাম হল ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। সে আমাকে জানাল যে অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। তবে সে ভরসা ছাড়েনি। একদিন সে হঠাৎ ঢাকায় এসে হাজির। আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, আমার পৈতৃক বাড়ি বাবার আমল থেকে ঋণের দায়ে একজনের কাছে মর্টগেজ আছে। দু'একটি ব্যাঙ্ক শত্রুতা করে সেই খবর কাগজে ফলাও করে লিখে আমার ব্যাঙ্কের ক্ষতি করছে। এখন সেই মর্টগেজ ছাড়িয়ে নিয়ে তার পাল্টা জবাব দিতে হবে। এ বিষয়ে আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছি। সুদে আসলে ঋণের পরিমাণ দু'তিন হাজার টাকার মতো হয়েছে।

এই টাকাটা যদি আপনি দেন কুমিল্লায় আমার বাড়িতে গিয়ে মর্টগেজটা ছাড়াতে পারি। জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তার কাছ থেকে যা খবর পেলাম তাতে এই ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদই মনে হল। আমার ধারণা হল শচীন যে রকম উৎসাহ এবং উদ্যমের সঙ্গে কাজ করছে তাতে তার নিজের ভবিষ্যৎও বেশ উজ্জ্বল। অনেক ভেবে চিন্তে তাকে ঐ টাকাটা আমি দিলাম এবং সে ঋণ শোধ করল। এর কিছুকাল পরে আবার কি একটা গোলমাল দেখা দেওয়ায় সে আমার কাছে ছুটে আসে। সেবার আবার আমি দু'তিন হাজার টাকা দেওয়ায় তার ব্যাঙ্ক রক্ষা পায়। এই রকম বাধা বিপত্তি আরও এসেছিল কিনা জানিনা। ঢাকা ছাড়বার পূর্বেই শুনে আনন্দ হয়েছিল যে শচীনের ব্যাঙ্ক এখন খুব বড় হয়েছে। বাংলা দেশের নানা স্থানে এবং বাংলার বাইরেও তার অনেক ব্রাঞ্চ হয়েছে। ফলে শচীনের উপার্জনও বেশ বেড়েছে। কলকাতায় মিশন রো'তে ব্যাঙ্কের একটি নিজস্ব চারতলা বাড়িও হয়েছে।

ঢাকা থেকে আমার কলকাতায় ফেরার কয়েকদিন পরে শচীন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়জন ছাত্র এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে লিপ্ত ছিল তারা সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে সব কাগজপত্র শচীন সঙ্গে এনেছিল তা দেখে আমি বিস্মিত হলাম। ব্যাঙ্কটি এখন বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং বহু লক্ষ টাকা ডিপোজিট হয়েছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে শচীনের এই সাফল্যের জন্য তাকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলাম। ছাত্ররা বলল যে কেবল আশীর্বাদ করলেই হবে না আপনাকে এই ব্যাঙ্কে যোগ দিতে হবে। আপনার নামটা আমাদের চাই। আমি বললাম যে ব্যাঙ্ক বা এই জাতীয় ব্যবসা কখনও করিনি; কিছু জানিও না, সুতরাং এ সবের মধ্যে আমি যেতে চাই না। তখন তারা বলল যে আমরা নতুন একটা কটন মিল খুলেছি—হিন্দুস্থান কটন মিল। আপনাকে এতে যোগ দিতে হবে। আপনাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না: সুপারভাইজার রূপে থাকবেন। আমরা সকলেই আপনার ছাত্র। বাঙ্গালীর ব্যবসা ফেল করার প্রধান কারণ নিজেদের মধ্যে কলহ। এজন্য আমরা স্থির করেছি আপনি সুপারভাইজার রূপে থেকে আমাদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিলে সব শুনে

আপনি যা বলবেন আমরা সবাই তা মেনে নেব। কাজের চাপও তেমন নয়। সাধারণভাবে আপনি কাজ দেখবেন। সপ্তাহে দু'তিন ঘণ্টা বিকেলে অফিসে গেলেই চলবে। এর জন্যে আমাকে অবশ্য মাসিক কিছু টাকাও দেবে তাও বলল। অনেক ইতস্ততঃ করে আমি তাদের প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম।

কাজে যোগ দিয়ে দেখলাম ব্যাঙ্ক এবং কটন মিল ছাড়াও ওরা আরও অনেক রকম ব্যবসা করে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। ওরা অনেকগুলি মিলিটারি কনট্রাক্ট নিয়েছে। আমাকে তার একটি ব্যবসায়ে ডিরেক্টরও করল। একটি কনট্রাক্ট ছিল মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে স্পিরিট ল্যাম্প সরবরাহ করা। সপ্তাহে একহাজার কিম্বা তার বেশী এই ল্যাম্প সরবরাহ করতে হত। ল্যাম্পের খরচা পড়ত প্রতিটি পাঁচ সিকে; কিন্তু ওরা পেত পাঁচ টাকা করে। এই হিসেবে কাগজে কলমে প্রতি সপ্তাহে প্রায় তিন চার হাজার টাকা লাভ হবার কথা। কিন্তু এর অর্ধেক ঘুষ দিতে হত কর্মচারীদের। তাহলেও অনেক লাভ থাকত এবং যত দিন যুদ্ধ চলেছিল তাতে বেশ মোটা টাকাই ওরা লাভ করেছিল। অবশ্য ডিরেক্টর হিসেবে আমিও তার কিছু পেয়েছিলাম।

এই রকম আরও দু'একটি কনট্রাক্ট ওরা নিয়েছিল। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই আর কোনটির মধ্যে যাইনি। কটন মিলটিও ভালই চলছিল। কিন্তু এই সময় তুলা যোগাড় করা ছিল খুব কষ্টসাধ্য। আমি নিজে বোম্বাই গিয়ে অনেক তদ্বির করে আমার পরিচিত কয়েকজন লোকের সাহায্যে কিছু সুতো সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলাম। এতে ব্যবসাটি বেশ ভালই চলতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরে আমার কেমন সন্দেহ হল যে মিলের নাম করে এই যে সুতো আনার ব্যবস্থা আমি করেছি ওরা তার একটা অংশ কালোবাজারে বিক্রী করে নিজেরাই সে লাভের টাকা নিচ্ছে। এতে আমি বেশ অসন্তুষ্ট হলাম। কিছুদিন পরে কটন মিলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলাম।

ক্রমে ক্রমে কানে আসতে লাগল যে ব্যাঙ্ক নিয়েও শচীন অসদুপায়ে অনেক টাকা লাভ করছে। এর একটি দৃষ্টান্ত মনে আছে এবং সেটি সম্ভবত

অনেকটা সত্য। ব্যাঙ্ক থেকে একটি চা বাগানে আট লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। এ সব ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল যে বাগানের সম্পত্তি কি আছে তা ভাল ভাবে তল্লাস করে তার মূল্যের অর্দ্ধেক বা কিছু বেশী টাকা ধার দেওয়া যেতে পারে। ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় শচীন বলল যে সে নিজে গিয়ে তদন্ত করে দেখে এসেছে এই বাগানের যে সম্পত্তি আছে তাতে আট লক্ষ টাকা ধার দেওয়া যায়, তার কথামতই ঐ ঋণ মঞ্জুর হয়। এর কিছু কাল পরে একদিন সন্ধ্যার পর আমার একজন খুব প্রিয় ছাত্র আমার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে আসে। ছাত্র হিসেবে সে খুব মেধাবী ছিল; এম. এ পরীক্ষাতেও তার ফল বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবী দলে থাকায় কোন সরকারী চাকরি সে পায়নি। শচীনকে বলে আমি তাকে এই ব্যাঙ্কে একটি চাকরি দিয়েছিলাম। সচ্চরিত্র বলে তার খ্যাতি ছিল। আমিও তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম। সে এখনও জীবিত; সেজন্যে তার নাম উল্লেখ করছি না। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কতক-গুলি ব্যাপার সে আমাকে জানায়। তার একটি এই চা বাগানের ঋণ সম্বন্ধে। সে বলে যে অনেকেরই সন্দেহ শচীন এক লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে ঐ আট লক্ষ টাকা ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। আসলে বাগানে এত টাকার মতো সম্পত্তি নেই। আমি আর এই ব্যাঙ্কে থাকতে চাই না—আপনি আমায় অনুমতি দিন। সত্য সত্যই ছেলেটি ঐ চাকরি ছেড়ে দিল; যদিও তার আর্থিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। তারপর ক্রমশই এই রকম জনরব আরও আমার কানে আসতে থাকে। শচীনকে একদিন ডেকে বললাম, তুমি যে ব্যবসায় উন্নতি করেছ তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমার অসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধি, অধ্যবসায় এবং কর্মকুশলতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু তোমার সততা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জন্মেছে। সততা না থাকলে ব্যবসা টেকে না। শচীন অবশ্য সব অভিযোগই অস্বীকার করল। তার কথায় আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। ফলে তার ব্যবসার সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি ত্যাগ করলাম। এখানে বলা দরকার শচীনকে যে টাকা ধার দিয়েছিলাম তার সবই সে শোধ করে দিয়েছিল। তবে তার অনুরোধে আমি ব্যাঙ্কের অনেক টাকার শেয়ার কিনেছিলাম।

এর পরে ক্রমে ক্রমে শচীনের সঙ্গে জগন্নাথ হলের যে কয়জন ছাত্র কাজ করত—শচীনকে অনুরোধ করে যাদের আমি ঐ ব্যাঙ্কে কাজ দিয়েছিলাম—তারা

অনেকেই আমার কাছে এসে শচীনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতে থাকে। ব্যাঙ্কের উন্নতি খুবই গৌরবের বিষয়; এবং শচীন নিজেও যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছে। এখন কিন্তু তার মাথা গরম হয়েছে, বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছে, সে ঠিক পথে চলছে না। তখন ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বেশ সুনাম; শচীনও ব্যবসাজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। শচীনকে ডেকে কদিন যা শুনেছি বললাম। দুঃখের বিষয় কোন ফল হল না। কিছুদিন পরেই ঐ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল। শচীন বলল তার শত্রুদের নানা মিথ্যে রটনায় আমানতকারীরা টাকা ফেরৎ চাওয়ায় ব্যাঙ্ক ফেল হল। কিন্তু অন্য ছাত্ররা বলল যে তা নয়। ব্যাঙ্কের অনেক গলদ ছিল, সেটা বেরিয়ে পড়তেই এই বিপত্তি ঘটল। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ কলকাতায় যখন কয়েকটি দেশী ব্যাঙ্ক মিলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া তৈরী হয় তখন শচীনকেও তাতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমিও সেই পরামর্শই দিয়েছিলাম। শচীন তাতে রাজী হয়নি। আমার ধারণা এতে যোগ দিলে ব্যাঙ্কের কাগজপত্র সব পরীক্ষা হত। তাতে গলদ ধরা পড়ত, সেজন্যেই শচীন অরাজী হয়েছিল।

ব্যাঙ্ক ফেলের পর কটন মিলও শচীনের হাতছাড়া হল। তার নামে ফৌজদারী মামলা সুরু হল। অভিযোগ ছিল ব্যাঙ্কের কোন এক কর্মচারীকে দিয়ে সে একটি বিবরণ (statement) লেখাতে চেয়েছিল যাতে তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হয়। কর্মচারীটি অস্বীকার করায় সে তাকে লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলি ছুঁড়েছিল। মোটকথা শচীনের নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দু'রকম মামলাই চলতে থাকে। শেষ জীবনে শচীন বেশ অশান্তির মধ্যে ছিল। এই সব মামলা নিষ্পত্তি হবার আগেই হঠাৎ তার মৃত্যু হয়।

শচীনের জীবন কাহিনী সবিস্তারে বলার কারণ আমাদের দেশেও এমন মেধাবী ছাত্র আছে যারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণ হয় খুব বেশী সফল হলে ধীরভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যবসা চালান সহজ ব্যাপার নয়। শচীনের জীবনের এহেন পরিণতির জন্য আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু তার অসাধারণ কর্মকুশলতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থান কটন মিলেরও অনেক গলদের কথা প্রকাশ পায়। এই নিয়েও মামলা সুরু হয়। শচীনের মৃত্যুর পর তার সহযোগী জগন্নাথ হলের আর একজন ছাত্রের জেল হয়। এইভাবে আমার ঢাকার কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার উপর যবনিকাপাত হয়। আমার অনেক টাকার শেয়ার ছিল, সে সবই নষ্ট হল।

(২)

কটন মিলের জন্য সুতো সংগ্রহের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর যে কারণে আমি এই সময় মাঝে মাঝে বোম্বাই যেতাম এখন সেই কথা উল্লেখ করব। আমি যখন শচীনদের সঙ্গে ব্যবসায় যোগ দিয়েছি সেই সময় একবার কাশীতে এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস কিম্বা ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স-এ যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে বোম্বাইএর এক প্রতিনিধি, আচার্য্য জিন বিজয় নামে এক জৈন সাধু, আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন যে শ্রীকে. এম. মুন্সী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। ভারতবর্ষের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা মুন্সীজী করেছেন। তাঁর ইচ্ছা সেই ব্যাপারে আমি যেন যুক্ত হই।

শ্রীকানহাইয়া লাল মুন্সী তখন বোম্বাই শহরের একজন খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তিনি বেশ কিছুকাল বোম্বাই সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং একবার তিনি ভারত সরকারেরও মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর পেশা ছিল ওকালতি এবং এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ১৯৩৮ সনে তিনি বোম্বাই শহরে ভারতীয় বিদ্যাভবন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আচার্য্য জিন বিজয় ছিলেন ভারতীয় বিদ্যাভবনের ডিরেক্টর। মুন্সীজীর সঙ্গে তখন আমার কোন পরিচয় ছিল না।

জিন বিজয়জীর সঙ্গে ইতিহাস লেখার বিষয়ে কথা বার্তা বলার পর তিনি আমাকে বলেন যে আপনার যখন এতে সম্মতি আছে তখন এ বিষয়ে

মুন্সীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলা দরকার ; মুন্সীজীরও তাই ইচ্ছা। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বাই গেলেন। মুন্সীজীর বাড়িতেই উঠলাম। তাঁর কাছে ব্যাপারটি বিশেষরূপে শুনলাম।

ভারতীয় বিদ্যাভবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুন্সীজী একখানি পূর্ণাঙ্গ ভারতের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর ধারণা ছিল এই বই খানি অন্ততঃ আট দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে, প্রতি খণ্ডে পাঁচ ছ শত পৃষ্ঠা এবং ভারতীয় ছাড়া অন্য দেশের কোন লোক এর লেখক হবেন না। বলা বাহুল্য এই কাজ বহু ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তিনি তাঁর এক মক্কেল এবং বিশেষ বন্ধু বিড়লা কোম্পানীর কর্তা শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লার কাছে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। শ্রীবিড়লা এই প্রস্তাবে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণার্পণ চ্যারিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং ঐ কমিটির পক্ষ থেকে তিনি এই ইতিহাস লেখার কাজ সুরু করার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং এই ইতিহাস লেখার জন্য কমিটি গঠিত হল। তার নাম হয় ভারতীয় ইতিহাস সমিতি—এর চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রী কে. এম. মুন্সী ; ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লা, আর ছজন সদস্যের মধ্যে ছিলেন স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, স্যার টেকচাঁদ প্রভৃতি। ১৯৪৪ সনে এই কমিটি গঠিত হয়। কমিটি স্থির করলেন যে এই বই-এর বিভিন্ন অধ্যায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত হবে এবং এর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার থাকবে একজন সাধারণ সম্পাদকের (General Editor) উপর।

পরে মুন্সীজী আমাকে বলেছিলেন যে, এই প্রস্তাব করার মূলে ছিল ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের প্রস্তাবিত এইরূপ একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার অভিজ্ঞতা। ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস বই লেখার সমস্ত ভার দিয়েছিলেন একটি কমিটির হাতে। কিন্তু তাতে কাজ বেশী এগোয়নি। মুন্সীজীর তাতে এই ধারণা হয় যে, একজন লোকের উপর দায়িত্ব না দিলে এই ধরনের কাজ ভালভাবে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবেনা। এই কমিটিতে স্থির হয় যে আমাকে এই সাধারণ সম্পাদকের ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হোক। এক স্যার রাধাকৃষ্ণণ ছাড়া উক্ত কমিটির আর কোন সদস্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পরে মুন্সীজীকে এক সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম

যে তিনি আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন কেন ; কারণ শুনেছিলাম তাঁর প্রস্তাব অনুসারেই আমি নির্বাচিত হয়েছি। মুন্সীজী বলেছিলেন যে যদিও তিনি আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন না তবে ঢাকা থেকে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল (প্রথম খণ্ড) দেখে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল তাঁদের প্রস্তাবিত ইতিহাসও এই ভাবেই লেখা উচিত। এইজন্যই তিনি আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ীই আচার্য্য জিন বিজয়জী আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

মুন্সীজীর সঙ্গে বই-এর প্ল্যান নিয়ে অনেক কথা হল। স্থির হল মোট দশ খণ্ডে এই বই শেষ হবে—হিন্দু যুগ পাঁচ খণ্ড, মুসলমান যুগ দুই খণ্ড, মারাঠা এক খণ্ড এবং ইংরেজ যুগ দুই খণ্ড। তখন অবশ্য জানতাম না যে, এই বই শেষ হওয়ার আগেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং তার ফলে ইংরেজ যুগের অনেক ঘটনা নতুন ভাবে লেখার দরকার হবে। ইংরেজ যুগের জন্য পরে আরও একটি খণ্ড বাড়ান হয়। সব শুনে মুন্সীজীকে বললাম যে ভার নিতে রাজী আছি যদি তিনি আমার দুটি শর্ত গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ, কোন অধ্যায় কে লিখবেন সে বিষয়ে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। তিনি বা কমিটি তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ, আমি সম্পাদন করে যে বই প্রেসে পাঠাব আমার সম্মতি ছাড়া তার মধ্যে কোন অদল বদল করা চলবে না। যদি তাঁদের আপত্তির কিছু থাকে তা অবশ্যই আমি বিবেচনা করে দেখব। কিন্তু আমার যা সিদ্ধান্ত সেটাই শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকবে। মুন্সীজী এই দুটি শর্তই মেনে নিলেন। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি এই কথা হওয়ার পর ছাব্বিশ বৎসর পার হয়েছে ; বই এর জন্য টাকাকড়ি সবই মুন্সীজী ব্যবস্থা করেছেন এর মধ্যে নয় খণ্ড বইও প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু মুন্সীজী তাঁর প্রতিশ্রুতি কোনদিন লঙ্ঘন করেন নি।

মুন্সীজীর সঙ্গে কথা বলে কি ভাবে কাজ সুরু হবে তা স্থির হল। তিনি বললেন যে একাকে প্রথম দিকে আপনার বোম্বাইএ থাকা উচিত। কারণ আপনার সঙ্গে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দরকার হবে। সপরিবারে আমার

বোম্বাইএ থাকার জন্য তিনি একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। তদনুসারে মাস ছয়েকের মধ্যেই আমি কলকাতার কাজকর্ম গুটিয়ে বোম্বাই গেলাম।

অনেক দিন পরিশ্রম করে ভেবে চিন্তে একটি প্ল্যান আমি স্থির করলাম। কোন খণ্ডে কি কি বিষয় থাকবে এবং কে কে লিখবেন তার একটি খসড়া প্রস্তুত করলাম। মুন্সীজী আমাকে বললেন যে বিলেতের George Allen & Unwin প্রকাশন সংস্থা এই বই ছাপানর ভার নিয়েছেন। যতদূর স্মরণ হয় আমি প্রায় সাত আট মাস বোম্বাইএ ছিলাম। এর মধ্যে প্ল্যান ছাপা হল। যাঁদের লেখার কথা তাঁদের কাছে চিঠি লেখা হল এবং সে চিঠির উত্তরও এসে গেল। বই লেখার কাজ এক রকম আরম্ভ হয়ে গেল। মুন্সীজী আমাকে একজন কেরানী ও একজন টাইপিস্ট দিয়েছিলেন।

বোম্বাইএ আমার হাতে অনেক সময় ছিল। কাজেই সে অধ্যায় আমার লেখার কথা তা লিখতে সুরু করলাম, কিন্তু কিছুকাল পরে আমার হজমের গোলমাল দেখা দিল। পেটে ভয়ানক বেদনা এবং সর্বদা ক্ষুধার ভাব। বেশী কাজ করতে পারতাম না। বোম্বাইএ তখন একজন নামকরা বাঙ্গালী হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। তাঁর ওষুধেও কোন কাজ হল না; বরং অসুখ বেড়ে গেল। মুন্সীজীকে অসুখের কথা জানাতে তিনি তাঁর পরিচিত একজন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের নাম বললেন—এ ভদ্রলোকের তেমন নামডাক ছিল না; তবে তাঁর উপর মুন্সীজীর খুব বিশ্বাস ছিল। মুন্সীজীর কথা অনুসারে আমি সেই ডাক্তারের কাছে গেলাম। দু'তিন দিন পরীক্ষা করে বললেন যে সবই উল্টো চিকিৎসা হয়েছে। লক্ষণ দেখছি গ্যাসট্রিক আলসারের (Gastric ulcer)। এর উপশমের জন্যে প্রধান দরকার খাওয়ার দিকে নজর রাখা। কিন্তু আমরা বোম্বাইএর লোক; বাঙ্গালী রোগীর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক মতো করতে পারি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বললেন এই অবস্থায় সরষের তেল খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। সরষের তেল গ্যাসট্রিক আলসারের রোগীর কাছে বিষবৎ। কিন্তু আপনারা তাতে অভ্যস্ত। তাছাড়া এর উপর আবার মাছও আপনারা খান। কাজেই আপনার উচিত বাঙ্গালাদেশে ফিরে গিয়ে সেখানকার ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

শুনে বেশ মুস্কিলে পড়লাম। কারণ কথা ছিল দু'তিন বছর বোম্বাইএ

থেকে বইএর কাজ দেখা শোনা করব। ততদিনে প্রথম খণ্ড ছাপা হয়ে যাবে। সেজন্যেই মুন্সীজী আমার জন্যে বাড়ির ব্যবস্থা এবং আমাকে মাসে এক হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ডাক্তারের কথা মুন্সীজীকে বলায় তিনি বললেন স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে তো কাজ করতে পারবেন না। আপনি বরং এখন কলকাতায় ফিরে যান; বাড়িভাড়া ছাড়া যে টাকা আপনাকে দিই তা আমি দেব। এভাবে আমার বোম্বাই প্রবাস শেষ হয়।

কথা ছিল শরীর ভাল হলে আমি মাঝে মাঝে বোম্বাই যাব। ভারতীয় বিদ্যাভবনের নতুন যে বাড়ি তৈরী হল তাতে আমার থাকার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট হয়—যাতে বোম্বাই গিয়ে আমি থাকতে পারি। আরও স্থির হল আমি যখন বোম্বাইএ থাকতে পারছি না তখন আমার কাজের কিছু ভার—চিঠিপত্র লেখা, লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি—একজন সহকারীর উপর দেওয়া হবে। এজন্য একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটার নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয়। ডঃ এ. ডি. পুসলকরকে এই পদে নিয়োগ করা হয়। পুসলকর তখন বোম্বাইএ একটি কলেজের লেকচারার ছিলেন। আমি কলকাতায় থাকব, আর তিনি আমার নির্দেশ অনুযায়ী বোম্বাই অফিস থেকে কাজ করবেন। কলকাতায় আমার কেবল একজন টাইপিস্ট থাকবে। মুন্সীজী এসব ব্যবস্থাই করেছিলেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতায় ফিরে এসে এই ইতিহাস লেখার কাজে মনোনিয়োগ করলাম। পূর্বেই বলেছি শচীনদের সঙ্গে যে ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছিলাম নানা কারণে তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হই। সুতরাং এই সময় থেকে আমার প্রধান কাজ ছিল ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রস্তাবিত ইতিহাস লেখা। এই গ্রন্থমালার নাম স্থির হয় History and Culture of the Indian People। এই কাজের ভার গ্রহণ করি ১৯৪৫ সনে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি এতে লিপ্ত রয়েছি। ইতিহাস চর্চ্চার দিক থেকে এইটিই আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজের সঙ্গেই যুক্ত থাকব—এমন আশা। কি ভাবে এই গ্রন্থমালার কাজ সুরু হয় সে কথা পরে বলব।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সঙ্কলন করার জন্য ভারত সরকার যে কমিটি নিয়োগ করেছিলেন মতানৈক্য হওয়ায় আমি তা থেকে পদত্যাগ করি। দিল্লীর একজন উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি পরে আমাকে বলেছিলেন যে যখন আমার সঙ্গে ভারত সরকারের মতবিরোধ চলছে তখন মুন্সীজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মুন্সীজী তাঁকে বলেছিলেন যে ডঃ মজুমদারকে আমি আমার বইএর সম্পাদক নিযুক্ত করেছি ; আজ পর্যন্ত তাঁর মতের বিরুদ্ধে লেখাতে বাধ্য করিনি। আপনারা তাঁকে তাঁর মতের বিরুদ্ধে লেখাতে চান. তিনি যে রাজী হবেন না তা সহজেই বুঝতে পারি, আপনারা লেখার ভার ঐতিহাসিকের উপর ছেড়ে দিন। তাঁর উপর রাজনীতির মতামত চাপাবেন না।

মুন্সীজী যা বলেছিলেন তা যথার্থ। তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। একথাও আমি সঙ্কোচের সঙ্গে বলছি তিনি যদি আমার উপর সব ভার ছেড়ে না দিতেন তাহলে এতদিনে নয়খণ্ড বই বেরত না। প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি মুন্সীজীর এই প্রস্তাবের পূর্বে ভারতের পূর্ণাঙ্গ একটি ইতিহাস লেখার জন্য আরও দুটি প্রস্তাব হয়েছিল। প্রথম প্রস্তাবটি করেছিলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই প্রস্তাব অনুসারে মোট কুড়ি খণ্ডে বই শেষ করার কথা ছিল এবং এর সম্পাদক ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ইণ্ডিয়ান হিস্টি, কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল। বারটি খণ্ডে এই ইতিহাস লেখার কথা ছিল এর পরিকল্পনার ভার ছিল একটি কমিটির উপর ; ডঃ তারাচাঁদ ছিলেন তার সভাপতি। স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর চেষ্টায় এর জন্য দু'লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে আজ পর্যন্ত মাত্র একটি খণ্ড বই বেরিয়েছে।

মুন্সীজী আমাকে যখন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেন তাকে বললাম যে ইণ্ডিয়ান হিস্টি, কংগ্রেস থেকে এ ধরনের একটি বই প্রকাশ করার প্রস্তাব হয়েছে এবং সেবিষয়ে কিছু কাজও হয়েছে। আপনার ও তাঁদের পরিকল্পনা মিলে যদি কাজ হয় ভাল হয়। কারণ আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লেখকের বড়ই অভাব। দু'খানি বই বেরলে একজনকেই হয়তো একই

বিষয় দু'বার লিখতে হবে। মুন্সীজী বললেন যে কমিটি করে এ রকম কাজ বেশী এগোবে বলে মনে হয় না। তবে আপনি ওদের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখতে পারেন। যদি উপযুক্ত কোন প্রস্তাব আপনারা করেন আমি অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব।

হিস্টি কংগ্রেস যে কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন আমি তার সভ্য ছিলাম। মুন্সীজীর পরিকল্পনা এবং সম্ভব হলে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরিকল্পনা মিলে যদি একখানা বই বার করা হয়—এ কথা বিবেচনা করে দেখবার জন্য আমি কমিটির মিটিংএ তুললাম। কমিটির অধিকাংশ সদস্য এবং বিশেষ করে ডঃ তারাচাঁদ আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। তারাচাঁদ বলেছিলেন যে মুন্সীজীর বই তো স্কুলের পাঠ্য বই হবে; আর আমাদের বই হবে scholarly work। মুন্সীজীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলেও তাঁরা কিন্তু রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। স্থির হল রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং হিস্টি কংগ্রেস-এ দুয়ের প্রস্তাব মিলে একটি সিরিজ বেরবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের আদি পরিকল্পনা অনুসারে এই সময় Vakataka-Gupta Age নামে এক খণ্ড বই বেরিয়েছিল—ডঃ আলটেকর ও আমার সম্পাদনায়।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও হিস্টি কংগ্রেসের মিলিত প্রস্তাবের ফলে যে বই প্রকাশের আয়োজন হয় আজ পর্যন্ত তার মাত্র একটি খণ্ড বেরিয়েছে। এর জন্য সংগৃহীত দু'লক্ষ টাকার বেশীর ভাগই ব্যয় হয়েছে অফিসের খরচ এবং কর্মচারীদের বেতনে। এই কমিটি অবশ্য এখনও আছে। দু'একটি খণ্ড বই প্রকাশের আয়োজন চলেছে, তবে তা কবে বেরবে বলা কঠিন। এই পরিকল্পনায় যে খণ্ড আমার সম্পাদনায় বেরুবার কথা তা প্রায় পনের বৎসর পূর্বে শেষ করেছি। কিন্তু আজও তা ছাপা হয়নি। এর কারণ কি এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই; কারণ তাতে অনেক অপ্রীতিকর কথা বলতে হয়।

(৩)

ভারতীয় বিদ্যাভবন পরিকল্পিত ইতিহাসের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণের সময় মুন্সীজীর সঙ্গে আমার এই মর্মে কথা হয়েছিল যে ভবিষ্যতে পড়াশোনা সংক্রান্ত যদি কোন কাজ পাই তা আমি গ্রহণ করতে পারব। অর্থাৎ যদি বিদ্যাভবনের ইতিহাস সম্পাদনায় বিলম্ব বা বিঘ্ন না হয়, তবে এক

সঙ্গে দুটি কাজ করলে মুন্সীজীর কোন আপত্তি হবে না। এই রকম যেসব কাজ করছি সে কথা বলছি।

বোম্বাই-প্রবাস শেষে কলকাতায় আসবার কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রী পি. এন. পারিজা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমাকে তিনি বললেন সে সেখানকার ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীগোবিন্দ মালব্য (পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্র) ভারতীয় ইতিবৃত্তের পঠন পাঠনের জন্য পৃথক একটি বিভাগ খুলতে চান। তাঁর ইচ্ছা আমি যেন এই কলেজের—College of Indology—প্রথম প্রিন্সিপ্যাল রূপে কাজ করে এর গোড়াপত্তন করি।

ভারতীয় বিদ্যাভবনের ইতিহাসের কাজ তখন অনেকটা এগিয়েছে। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল লাইব্রেরী আছে, কাজেই এ কাজে যোগ দিলে আমার লেখার কাজে কোনরূপ অসুবিধে হবে না মনে হল। মুন্সীজীকে সব লিখলাম, তিনি সম্মতি দিলেন।

১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি কলেজ অফ ইণ্ডোলজির প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই। ১৯৫৩ সন পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলাম। এই তিন বৎসর ভারতপ্রসিদ্ধ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালী দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। অনেক বিষয়ে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক গোলমাল ও হাঙ্গামার কথা কাগজে দেখতে পাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এখানে দু-চারটি কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না—কেন যে আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অবনতি ও দুরবস্থা তার কিছু কারণ হয়তো আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যাবে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের এক আশ্চর্য্য কীর্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একজন মানুষ যে এত বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। শহর থেকে তিন চার মাইল দূরে একটি জায়গায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসস্থান। সমস্ত জায়গাটি ঘিরে যে প্রাচীর আছে তা ঘুরে আসলে পাঁচ মাইল হয়। ভিতরে অনেকগুলি চওড়া রাস্তা—উত্তর দক্ষিণ

এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি। ছ'সাতটি বিশাল ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের জন্য সত্তর আশিটি বাড়ি, এ ছাড়া ভাইস-চ্যান্সেলার ও অন্য কর্মচারীদের বাড়ি, লাইব্রেরী, অফিস এবং একটি ব্যাঙ্ক আছে। বস্তুতঃ এটি একটি ছোট শহর বললে অত্যুক্তি হয় না।

যতদিন ওখানে ছিলাম দেখতাম অনেক নতুন নতুন বাড়ি ও রাস্তা তৈরী হচ্ছে। প্রথমেই আমার কেমন খটকা লাগল—এত বড় জায়গা এবং এতগুলো বাড়ি, তার দেখাশোনার জন্য একজন অল্প বেতনের ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন। যা দেখেছি ও শুনেছি তাতে মনে হয় যে এই ব্যাপারে একটি মস্ত গলদ আছে। অনেকে বলত যে নতুন বাড়ি তৈরী, পুরনো বাড়ি মেরামত, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা এসবের জন্য যে টাকা ব্যয় হয়, অনেক কর্মচারী তার অংশ পান এবং এর মধ্যে ভাইস্-চ্যান্সেলারেরও নাকি অংশ আছে। এ অভিযোগ কতদূর সত্য বলতে পারিনা এখানে বাড়ি তৈরীর ব্যবস্থাও খুবই অদ্ভুত। বাড়ি তৈরী করতে হলে প্রথমে একদল কর্মচারী নিযুক্ত হত। বাড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা মাইনে পেত। বাড়ি তৈরী করত অবশ্য কনট্রাকটার। এই সব কর্মচারীরা বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে কিছুই করত না। সুতরাং বাড়ি তৈরী হতে অনেক বেশী সময় লাগত। কারণ তাতে কর্মচারীদের লাভ।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্বাহের জন্য ওখানে যে এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বা কোর্ট প্রভৃতি আছে তার সদস্যদের মধ্যে ভীষণ দলাদলি ছিল। আর সে দলাদলি কতকটা জাতি, কতকটা প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব সমিতির মিটিংএ গেলে মনে হত যে একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক যে আবহাওয়া থাকা দরকার তা এখানে নেই। আরও দেখলাম শিক্ষকদের মধ্যেও তেমন সৌহার্দ্য নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সৌহার্দ্যের কথা পূর্ব্বে বলেছি। এখানে এসে দেখলাম ঠিক তার বিপরীত অবস্থা। শিক্ষকদের একটি ক্লাব আছে, কিন্তু সেখানে খুব কম শিক্ষকই যান। এর একটি কারণ হতে পারে বেনারসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে থেকে ছাত্র এবং শিক্ষকরা এসেছেন। সুতরাং ঢাকার মতো পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বা ঘরোয়া আবহাওয়া থাকা এখানে সম্ভব ছিল না।

সবচেয়ে দুর্বোধ্য হল তখনকার ভাইস-চ্যান্সেলার গোবিন্দ মালব্যর কূটনীতি। তিনি আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কথা আমার কানে আসতে থাকে। তা পুরোপুরি সত্য না হলেও কতক যে সত্য সন্দেহ নেই। তবে তার প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। গোবিন্দ মালব্য চক্রান্তের ফলেই ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ওখানে বেশী দিন থাকতে পারেননি এবং একবার শ্যামাপ্রসাদকে যে প্রো ভাইস্-চ্যান্সেলার করার প্রস্তাব হয়েছিল তাও ব্যর্থ হয়। ভাইস-চ্যান্সেলারের মতো গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিষ্ঠিত হবার কোন যোগ্যতাই গোবিন্দ মালব্যের ছিল না। তিনি একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট রূপে কাজ করতেন—কোন শিক্ষায়তনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। কেবল মাত্র পিতার নামেই জোরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল যে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নানা পদে তিনি অযোগ্য লোক নিয়োগ করতে থাকেন। কোর্ট এবং এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে নিজের দল যাতে ভারী থাকে সেজন্য নানা রকম অসৎ উপায় অবলম্বন করেছেন। এই সব কারণে শিক্ষকদের মনে তাঁর বিরুদ্ধে ঘোর অসন্তোষ ছিল। ওখানে থাকতে থাকতে বেশ অনুভব করেছিলাম যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের যা অবস্থা তাতে কাজ ভাল চলছে না এবং অল্প কালের মধ্যেই অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়াবে। বাস্তবিক হয়েছিলও তাই। ওখানে ভাইস্-চ্যান্সেলার নিয়োগের পদ্ধতিটি ছিল বড় অদ্ভুত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদ শূণ্য হলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থেকে দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে তিনজনের নাম পাঠান হত এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তা থেকে একজনকে নির্বাচিত করতেন। গোবিন্দ মালব্য সে সময় লোকসভার সদস্য ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই জন্যেই তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলার হতে পেরেছিলেন। দিল্লী থেকেই তিনি নানা বিষয়ে কলকাঠি চালাতেন।

তিন চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। সর্বত্রই একই অভিজ্ঞতা—উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষ যদি কূটনীতির আশ্রয় নেন, সর্বস্তরেই তার প্রভাব পড়ে। কর্তৃপক্ষ যোগ্য এবং কর্মদক্ষ হলে

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং পঠন পাঠন—দুইই ভালভাবে চলে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এর নিদর্শন আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। সে কথা বিস্তৃতভাবে আর বলার দরকার নেই।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আর কয়েকটি মাত্র কথা বলব। কলেজ অফ ইণ্ডোলজিতে যোগ দেবার পর আমার দৃষ্টি পড়ল লাইব্রেরীর উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীটি বেশ বড়। ভারতের অনেক লোক—রাজা মহারাজা, ধনী, বিদ্যোৎসাহী—এই লাইব্রেরীতে অনেক বই দান করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তার একটি ভাল ক্যাটালগ নেই। কারণ অনুসন্ধান করে জানলাম এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহুদিন পর্য্যন্ত এর লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। তিনি লাইব্রেরীর বিষয়ে কিছু জানতেন না। সাধারণভাবে তিনি লেখাপড়াও বিশেষ কিছু জানতেন না। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে এই বৃদ্ধ প্রতিদিন গীতা পাঠ করে শোনাতেন। তারই পুরস্কার স্বরূপ তিনি লাইব্রেরিয়ান হয়েছিলেন। আমার যাওয়ার পূর্ব থেকেই লাইব্রেরীর অব্যবস্থা নিয়ে বেশ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। পরে একজন সহকারী লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন—লাইব্রেরীর বিষয়ে তাঁর অবশ্য বেশ জ্ঞান ছিল।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে ভাইস্-চ্যান্সেলারের ধারণা ছিল পূর্বোক্ত বৃদ্ধের মতোই। তাঁকে বললাম Epigraphica Indica লাইব্রেরীতে দেখছি না। এ বই না থাকলে তো প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পঠন পাঠন সম্ভব নয়। আরও বললাম যে এর কয়েকটি খণ্ড এখন বাজারে পাওয়া যায় না—পুরনো কপি বেশী দামে কিনতে হবে। তিনি উত্তরে বললেন—তার দরকার কি—সমস্ত বই টাইপ করে নেব। এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এর বোধহয় মাসখানেক পরে একদিন লাইব্রেরীতে ঘুরে বই দেখছি, এমন সময় দূরের একটি আলমারীতে দেখলাম Epigraphica Indicaর মতো কয়েক খণ্ড বই আছে, আলমারীর সামনে অনেকগুলি চেয়ার, টেবিল, জড়ো করা আছে, কাছে যাওয়ার উপায় নেই। সহকারী লাইব্রেরিয়ানকে বললাম যে ঐ আলমারীর বই দেখতে চাই! তিনি বললেন যে ও সব আলমারীর বই কেউ পড়েন না, সেজন্যে খোলাও হয় না। যাই হোক কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার পর তো টেবিল চেয়ার সব সরান হল। আলমারী খুলে দেখি

Epigraphica Indica-র পুরো একটি সেট আছে অথচ এটা কেউ জানত না।

কানিংহামের Archaeological Survey Report-ও একদিন এভাবে খুঁজে পেলাম। সে আলমারীও অনেকদিন বন্ধ ছিল, বইএর পাতার যা অবস্থা হাত দেওয়া মাত্রই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল। ভাইস্-চ্যান্সেলারকে বললাম যে এ সব খুব দামী বই—একবার নষ্ট হলে পাওয়া কষ্টকর, এ সব বই রক্ষার জন্য fumigation ইত্যাদি উন্নত ধরনের ব্যবস্থা করা অবিলম্বে দরকার। ভাইস-চ্যান্সেলারের সেই একই উত্তর—তার দরকার কি? সব টাইপ করিয়ে রাখব।

আমার বিশেষ বন্ধু দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতনামা পণ্ডিত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর নিজের লাইব্রেরীর সব বই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন। শুনেছি স্পষ্ট শর্ত না থাকলেও এই রকম একটা আভাস ছিল যে তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবেন। তা অবশ্য হননি। তাঁর বই সবই আছে সেখানে, তবে সে বইএর আলমারীগুলিও চাবি বন্ধ। বইএর কোন তালিকা এখনও তৈরী হয়নি। কি বই আছে না আছে তা কেউ জানে না। এত বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর এমন দুরবস্থার কথা আমি বার বার ভাইস্-চ্যান্সেলার এবং কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছি। কিন্তু কোন ফল পাইনি।

(ক্রমশঃ)

স্যার যদুনাথের পূর্বপুরুষগণ ও আদিনিবাস

বিভা সরকার

"যাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা, স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার ; ধনী জমিদার সন্তান এবং ইংরেজী শিক্ষিত হলেও তিনি কখনও ভোগসুখ বা আড়ম্বর চান নাই, চিরদিন সরল সংযত জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, আমাদের রাজশাহী জেলার সব রকম লোকহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা।'— গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার মতই সত্যভাষী দেশবরেণ্য স্বর্গীয় স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের 'আমার জীবনের তন্ত্র' নামক প্রবন্ধটি থেকে এই পংক্তি কয়টির উদ্ধৃতি না করে পারছি না। তিনি ছিলেন গোষ্ঠীপতি, বহু তরুণ ঐতিহাসিকের পথপ্রদর্শক সত্যসন্ধানী পরম গুরু, অতীত ভারতের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস মন্থন করে তার সার বস্তুটি, বহু আয়াস অধ্যবসায়ের ফল স্বরূপ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কথাই একটি অনলস দীর্ঘ সাধনার ইতিহাস। তিনি ছিলেন আমৃত্যু জ্ঞানতপস্বী, মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত তাঁর জীবনে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিখুঁত তথ্যানুসন্ধানী ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তিনি। তাঁর সাধনায় কোনও ত্রুটিবিচ্যুতির স্থান ছিল না। জীবনে তাঁর বহু দুঃসময় এসেছে। বৃদ্ধ বয়সে গভীর শোকের ছায়া নেমেছে—একের পর এক প্রিয় পুত্রদের, জামাতাদের হারিয়েছেন, কনিষ্ঠ কন্যা ও প্রিয়তম কনিষ্ঠ পৌত্রের বিচ্ছেদ বেদনা তাঁকে সইতে হয়েছে, কিন্তু অসীম ধৈর্যে অনমনীয় বনস্পতির মতই তাঁকে সব ঝড়ঝঞ্ঝায় বুক পেতে দাঁড়াতে আমরা দেখেছি, দেখেছি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দূরত্ব নিয়ে। জীবনে তিনি একান্তই একক মানুষ ছিলেন—মনে হত কিছুটা নিঃসঙ্গও বুঝিবা। বেশীর ভাগ সময়েই তিনি আপন একান্তই অনাড়ম্বর পড়াশুনার ঘরখানিতে জ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারতেন না। অত্যন্ত স্বল্পভাষী ছিলেন। মৃত্যুর দিনটিতেও তিনি নিয়মিত সান্ধ্যভ্রমণ সেরে অসুস্থ বোধ করায় পড়ার ঘর খানিতেই ক্ষণবিশ্রামের ইচ্ছায়

শয্যা গ্রহণ করেছিলেন ; সে শয্যা আর ত্যাগ করা হয়নি। অন্য কোনও বৃহত্তর তপস্যার জন্য অমৃত পথ যাত্রী হয়েছিলেন।

স্বনামধন্য এই ঐতিহাসিক মানুষটির মনীষার দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন ও করবেন উপযুক্ত বিদগ্ধ জনেরা। আমি তাঁর পূর্বপুরুষদের বিষয় নিয়েই সামান্য আলোকপাত করতে চেষ্টা করব মাত্র যা আমি যদুনাথ মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা, বারেন্দ্র রিসার্চ সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্গীয় বিজয়নাথ সরকারের ইংরাজীতে লিখিত একটি রোজনামচার মত রচনায় পেয়েছি। এই রচনাটির রচনাকাল ১৯৬১, তখনও স্যার যদুনাথের সাতভাই ও তিনটি বোনের মধ্যে তিনিই একমাত্র জীবিত। একটি বাণ্ডিলে তিনি কিছু কাগজ পত্র আমাদের কাছে রেখে যান। সার যদুনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পারিবারিক তথ্যানুসন্ধানের ইচ্ছায় সেই বাণ্ডিলটি খুলে অন্য কিছু বহু পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে, আমি এই তথ্যগুলি পাই।

যদুনাথের পূর্বপুরুষদের জীবন আলোচনায় আমরা যে মানুষটিকে ব্যক্তিত্বে ও মহানুভবতায় প্রোজ্জ্বল দেখি তিনি ছিলেন তাঁর পিতা স্বর্গীয় রাজ কুমার সরকার। আপন পিতার কথা বলতে তিনি বলছেন, "ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালক চিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে প্লুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে আমার যেন চোখ খুলে গেল। আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হল, কি করলে কোন জাতি বড় হয়···স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করা যে আমাদের নৈতিক কর্তব্য তা তিনি পুরাতন পার্টিশান আন্দোলনের যুগে নিজ বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছেন। এই রূপে আমি পেয়েছি আমার জীবনের মূল মন্ত্রটি।" উপযুক্ত পিতার যোগ্যতম পুত্র তিনি এমন একটি আদর্শবান মহান ব্যক্তিত্বের ছায়ায় বড় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বলেই হয়ত আমরা যদুনাথকে পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

উত্তর বঙ্গের এক বারেন্দ্র কায়স্থ পরিবারে অধুনা আত্রাই ঘাট ষ্টেশন থেকে দশ মাইল পূর্বে, করচমাড়িয়া গ্রামে যদুনাথের জন্ম ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার, ১৮৭০। যে গৃহে তাঁর জন্ম, ও লাল বেলে পাথরের প্রস্তুত

শিব মন্দির যেটি তাঁর পিতা রাজকুমার আরম্ভ করেন এবং ১৯১৬য় তাঁরা সমাপ্ত করান. আজও করচমাড়িয়ায় বিরাজমান।

ছাত্র দীঘি মৌজার কৌশাম্বী কাচারীর মাইল খানেক দক্ষিণে এবং পাতিসর কাচারির প্রায় মাইল দুই উত্তরে এই করচমাড়িয়া জায়গাটি। এ দুটি কাচারীই নাগর নদীর দুই পারে অবস্থিত। এই নাগর নদীটিই এক সময়ে এই জেলার যোগাযোগের প্রাণ স্বরূপ ছিল। অধুনা বোগরা (Bogra) সহরের দশ মাইল উত্তরে মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের উজানে করতোয়া নদী থেকে এই শাখা নদীটির উত্থান। পতিসর ছাড়িয়ে নাগর নদী কিছুদূর দক্ষিণ প্রবাহিনী হয়ে তেমুখ গ্রামের কাছে আত্রাই নদীর শাখা হুর নদীতে মিলে গেছে।

সরকার পরিবারের আদি নিবাস কিন্তু এই করচমাড়িয়ায় ছিল না। এখান থেকে মাইল খানেক উত্তরে নাগর নদীতীরস্থ ছাত্র দীঘিতেই ছিল আদি নিবাস। সেই সব পূর্বপুরুষদের বাসস্থান আজও কিছু কিছু সেখানে আছে। এই পরিবার বন্দকী কারবার সূত্রেই কিছু লাখেরাজ জমী লাভ করেন স্বনামধন্যা রানী ভবানী ও তাঁর পোষ্যপুত্র রাজা রামকৃষ্ণের দেওয়া কিছু সনদ পুরাণ দলিলপত্র সহ এর সাক্ষ্য বহন করছে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সূর্য্যাস্ত আইন নাটোর জমীদারীতে বিচ্ছিন্নতা আনে। ফলস্বরূপ অরাজকতা ও ডাকাতি আরম্ভ হয়। এই সময়সময়ে ছাত্রদীঘির এক পরিবারের কর্তা মাণিকচাঁদ মহাশয়ের ঘরেও ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা তাঁর শিশুপুত্র ও বিশ্বস্ত ভৃত্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি নিজেও নিদারুণ আহত অবস্থায় নৌকাযোগে গৌরের কানসাতে নীত হন এবং সেইখানেই দেহরক্ষা করেন। এই মর্মান্তিক কাহিনী দীর্ঘদিন বংশপরম্পরায় পরিবারে আলোচিত হয়ে আসে। এই মাণিকচাঁদের পত্নীর নাম ছিল কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী। মাণিক চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমাইচাঁদ তিনজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ছাত্রদীঘির সম্পদ দিয়ে তাঁর পত্নী বা পত্নীদের ও পুত্র রামকুমার সহ নদী থেকে মাইল খানেক দূরবর্তী করচমাড়িয়া গ্রামে বসতি ও সরকার পরিবারের বাড়ীর পত্তন করান। এই বাড়ীর চারিধারে দুর্গের অনুকরণে সুরক্ষিত করার জন্য পরীখা কাটানো হয়। রামকুমার

সরকারের মায়ের নাম গৌরীদেবী। করচমাড়িয়া গ্রামটি আট মাইল পূরবর্তী কল্যাণ নগরের রায় পরিবারের ছিল। এই ব্রাহ্মণ পরিবার নাটোর রাজাদের আত্মীয় ছিলেন। ডাকাতের ভয়ে এই পরিবারের লোকেরা তাঁদের জমিদারী ও বিষয়সম্পদ বিক্রয় করায় নিমাইচাঁদ সে সমস্ত কিনে নেন এবং ক্রমে বিশেষ প্রতিপত্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। নিমাই চাঁদের কন্যা ত্রিপুরা সুন্দরী অল্পবয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসায় এই কন্যার জন্যই সরকার পরিবারের গৃহদেবতা গোপীনাথের পরিবারে আগমন ঘটে। পতিসরের এক কায়স্থ পরিবারের কাছে কিছু দেবত্রসহ এই দেবতাকে তিনি আদরিণী কন্যার জন্য গ্রহণ করেন। এই সমসময়েই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ও পতিসরে জমিদারী খরিদ করেন।

রামকুমার দুই বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী কৃষ্ণসুন্দরী বরাইহাটির মেয়ে। তাঁর সন্তান না হওয়ায় রামকুমার কৃষ্ণময়ীকে বিবাহ করেন। নিমাইচাঁদ পৌত্র রাজকুমার (১৮৩৯) পৌত্রী বরদাসুন্দরী (১৮৪২) পৌত্র নবকুমার, যিনি অতি শৈশবেই মারা যান, ও সর্ব কনিষ্ঠ পৌত্র হরকুমারকে (১৮৪৫) দেখে যান এবং দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধনেজনে সমৃদ্ধ জীবন যাপন করার পর প্রথানুযায়ী জিয়াগঞ্জে বা বালুচরের (মুর্শিদাবাদে) গঙ্গাতীরে ১৮৫৩য় ইহলোক ত্যাগ করেন।

নিমাইচাঁদের একমাত্র পুত্র রামকুমার পিতার মৃত্যুর পর মাত্র সাতবছর জীবিত ছিলেন। জমিদারী পত্তনী ও মাছের ইজারা ইত্যাদিতেও তিনি পিতৃদত্ত সম্পত্তির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু সে সময়ে দক্ষিণ বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়নের যে নবজাগরণের আন্দোলন উঠেছিল তার সঙ্গে তাঁর কোনও সংস্রব ছিল না, যদিও তিনি পুত্র রাজকুমারকে রাজশাহীর ইংরাজী শিক্ষার স্কুলে পাঠান। রাজকুমার অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫৩ সালে তিনি শিক্ষায় পারদর্শিতার জন্য Sketch of Literature, and Learning in English (George L. Crick) (১৮৪৪) ছয় খণ্ডের পুস্তকটি পুরস্কার পান। এর পর Sir Charles Wood এর বিখ্যাত Education Despatch of 1853 আরম্ভ হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন এবং সেই সঙ্গে বহরমপুরেও একটি কলেজ (Krishna Nath college) স্থাপিত হয়। রাজকুমার বহরমপুর কলেজেই First Arts অধ্যয়ন

করেন। রাজকুমার অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ পুরস্কৃত হন। এই সময়ে রামকুমার, জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকুমার ও কন্যা বরদাসুন্দরীর বিবাহ দেন। রাজকুমারের বিবাহ ১৮৫৪ সালে হরিসুন্দরীদেবীর সহিত হয়; ইনি পাবনার মালঞ্চী গ্রামের শ্যামচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা। শ্যামচন্দ্র রায় অতি সজ্জন ও সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থ বা পুঁথী নকল করায় জীবনের শেষদিন অতিবাহিত করে ১৮৭০ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দৌহিত্র যদুনাথের জন্মও এই সময়ে। রামকুমার প্রথানুযায়ী মৃত্যুর পূর্বে বালুচরের গঙ্গাতীরে আনীত হয়ে ১৮৫৭ সালে মিউটিনির ঠিক কিছু পূর্বে দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার তখন ১৭ বছরের ও কনিষ্ঠ হরকুমার বার বছরের মাত্র। তিনি ৫ই পত্নী রেখে যান। জ্যেষ্ঠা কৃষ্ণসুন্দরী ১৮৮৫-তে ও কনিষ্ঠা রাজকুমারের জননী কৃষ্ণময়ী চুঁচুড়ার ভাগীরথী তীরে ১৯০৪ সালে পরমগতি প্রাপ্ত হন।

পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রাজকুমার বহরমপুর ত্যাগ করে করচমাড়িয়ায় ফিরে যান ও করচমাড়িয়াকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। প্রতিবেশী জমিদারগনের সহায়তায়, সহৃদয় লোকহিতব্রতী সজ্জন ও রাজকর্মচারীদের আনুকূল্যে ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, ও প্রাইমারী স্কুলের পত্তন করান। "রাজসাহীবাসী" নামে একটি সংবাদ পত্রেরও সম্পাদনা করেন। রাজকুমার মহাশয়ের প্রগতিশীল সংসার মুক্ত উদার মনের পরিচয়ে সকলেই প্রীত হন। শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, লালোরের কালা চৌধুরী, রঙ্গেসাহীর জেলা শাষক Mr. N. L. Heeley নাটোরের ফজলুর রহমান খাঁন চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও প্রশংসাভাজন হন। সর্বোপরি দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় মহাশয়ের আস্থাভাজন হন ও সহায়তা লাভ করেন। এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তৈলচিত্র তিনি নিজ খরচে প্রস্তুত করিয়ে কিছুকাল নিজের কাছে রেখে রাজশাহী কলেজে দান করেন। এরপর রাজা প্রমথনাথের সহায়তায় ১৮৭২ সালে Rajshahi Association স্থাপনা করিয়ে, সম্পাদক রূপে যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন ও দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে রাজশাহী কলেজে B. A. পর্যন্ত পাঠের ব্যবস্থা ১৮৭৪এর মধ্যেই সম্ভব করেন। এই সব নানা জনহিতকর কাজের জন্য রাজকুমার মহাশয়ের সুনাম ছড়িয়ে

পড়ে। যদিও তিনি রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন তথাপি তাঁর উদার মনের পরিচয়ে শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকেই রাজশাহী ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাষ্টি করেন। দুই পরিবারের এই সম্প্রীতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যদুনাথের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল যার নিদর্শন স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অচলায়তন' পুস্তকটি বন্ধুবর যদুনাথ মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করেন। ১৮৮০তে পুঁটিয়ার রানী শরৎসুন্দরী দেবী তাঁর এষ্টেট দেখা শুনার ভার রাজকুমারকে অর্পন করেন। পুঁটিয়ায় তখন Natson and Company র সঙ্গে মরিচাদুয়ার নিয়ে বিবাদ চলছিল। তিনি দক্ষতার সঙ্গে এটি পরিচালনা করেন। এই সময়ে রাজকুমার মহাশয়ের শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাজা প্রমথনাথ রায় মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পাঁচটি নাবালক সন্তান রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। Court of Wards এর অধীনে রাজকুমার সরকার ১৮৮৪-১৮৮৬ এই দুই বছর দীঘাপতিয়ার ম্যানেজার হন। এই সময়ে রাজকুমার ও অনুজ হরকুমার পৃথক হন। করচমাড়িয়া যৌথ সম্পত্তি থাকে। নাটোরের বাড়ী ও নওগাঁর বাড়ী হরকুমারের অংশে এবং রাজশাহী সহরের বাড়ী রাজকুমারের অংশে বর্তায়। পদ্মাতীরস্থ এই গৃহ ১৮৮৩ তে নদীগর্ভে চলে যায়। এর পর রাজকুমার রাজশাহীর রানীবাজারে চলে আসেন। সেখানে যে ভদ্রাসনটি করেন অদ্যাবধি সেটি করচমাড়িয়া বড় তরফ বা বড় বাসা নামে পরিচিত।

করচমাড়িয়া ত্যাগ করে সরকার পরিবার ১৮৮৫ তে চলে আসেন। সেই সময়ে রাজকুমার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শশীশেখর সরকার Goldsmith এর Descrted Village অনুকরণে "এক ফোঁটা জল" নামে একটি কবিতা রচনা করেন যার মধ্যে সেকালের গাঁয়ের ও গ্রাম্য জীবনের ছবি জেগে আছে।

করচমাড়িয়া ছেড়ে এসেও রাজকুমার এর সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যোগাযোগ রেখেছিলেন। জীবনের অধিককাল তিনি সেইখানেই অতিবাহিত করেন। নিজ ব্যয়ে একটি কবিরাজী দাতব্য ঔষধালয় করান। রাজশাহীর Executive Engineer Mr. Matadin Sukul এর সহায়তায় বেলে পাথরের শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করান। এই মন্দির নির্মাণের কারিগর ও পাথর ইত্যাদি মালমশলা তিনি এলাহাবাদ থেকে

আনানোর ব্যবস্থা করেন। দুঃখের বিষয় এটি তিনি সম্পূর্ণ করিয়ে যেতে পারেন নি। জীবনের শেষ তিরিশ বছর বিশেষ ভাবে তিনি সাতটি পুত্রের শিক্ষায় ও নানা লোকহিতকর কাজে অতিবাহিত করেন। আত্রেয়ীর ভবানীপুরের রাজকুমার মহাশয়ের বন্ধুবর কালীনাথ চৌধুরী মহাশয়ের রাজশাহীর ইতিহাস গ্রন্থে রাজকুমার সরকারের জীবন কথার কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর জীবিত কালের (১৮৩৯-১৯১৪) মধ্যে বহু স্মরণীয় ঘটনা ঘটে তার মধ্যে সিপাহীবিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য (১৮৫৭)। তখন তাঁর ছাত্রাবস্থা। নীলকর বিদ্রোহে (১৮৬০) তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। যদুনাথের 'আমার জীবনের তন্ত্র', নামক প্রবন্ধে এর সবিশেষ উল্লেখ আছে।

স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার ও হরিসুন্দরী দেবীর সাত পুত্র তিন কন্যা। যদুনাথ তৃতীয় পুত্র ও পঞ্চম সন্তান। রাজকুমার সরকারের প্রথমা কন্যা সুশীলা সুন্দরী ১৯০৭ সালে মারা যান, এর পাঁচ পুত্রের মধ্যে ডঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ ও ডঃ হরিশচন্দ্র সিংহ সুপরিচিত। রাজকুমারের কনিষ্ঠা কন্যা সুরবালা অতি অল্পবয়সে বিধবা হন (১৮৯৫)। এছাড়া তাঁর মৃত্যুকালে পরিবারের আর সকলেই জীবিত ছিলেন। রাজশাহীর গৃহেই তাঁর মৃত্যু হয়। হরিসুন্দরীদেবী স্বামীর মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন, ইনিও রাজশাহীতে মারা যান।

রাজকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদ সাতভাই ও কুলদেবতা গোপীনাথ এই আটভাগে ভাগ করে নিয়ে যদুনাথেরা সম্প্রীতির সঙ্গেই বসবাস করেন। করচমাড়িয়া যৌথ সম্পত্তি থাকে। রাজকুমারের পুত্রেরা নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কর্ম উপলক্ষ্যে তাঁরা নানাস্থানে বাস করতেন। অনেকেরই রাজশাহীতে বসবাস ছিল না। কেহ কেহ কলকাতায় ঘরবাড়ী করেছিলেন। রাজশাহীতেও রাণীবাজারে সকলের পৃথক গৃহ ছিল তথাপি রাজশাহী গৃহের একটি যৌথ রূপ ছিল। কুলদেবতা গোপীনাথের ঠাকুরবাড়ী ও সেই গৃহগুলি একই চত্বরের মধ্যে থাকায় একটী বৃহৎ পরিবারের পরিচয় পাওয়া যেত। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের ফলে রাজশাহীর গৃহ ত্যাগ করে একে একে সকলেই চলে আসতে বাধ্য হন। দীর্ঘদিনের সরকার পরিবারও আর পাঁচটী পরিবারের মতই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। গৃহদেবতা গোপীনাথকে

তাঁর যথাসম্ভব সম্পদসহ কৃষ্ণনগরের এক মন্দিরের সেবাইতের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়।

যদুনাথের ভ্রাতা ভগ্নীগণ

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—কুমুদনাথ B. L (১৮৬০-১৯৩০), রাজশাহী গৃহে মৃত্যু
তরঙ্গিণীদেবী

দ্বিতীয় ভ্রাতা—শশীশেখর F. A. (১৮৬২-১৯৫১), বহরমপুর সহরে মারা যান।
রাজবালা দেবী
সুরবালা দেবী

তৃতীয়—ভগ্নী সুশীলা সুন্দরী (১৮৬৫-১৯১০)
বিশ্বনাথ সিংহ (১৮৬০-১৯২৫) পোড়াদহের সিংহ পরিবার

চতুর্থ—ভগ্নী সুকুমারী দেবী (১৮৬৮…)

পঞ্চম—যদুনাথ (১৮৭০-১৯৫৮) M.A P.R.S.IES. 'নাইট' (kt) ১৯২৯ জুন
কাদম্বিনী দেবী (১৮৮০-১৯৬৪) মৃত্যু ১০ লেক টেরেস, কলিকাতা

ষষ্ঠ—বিজয়নাথ (১৮৭৩-১৯৬৩) B. A. C. E. Executive Engineer
মাধবীলতা দেবী, মৃত্যু পাম এভিন্যু, কলিকাতা

সপ্তম—সুরবালা দেবী (১৮৭৬-১৯৬০), মৃত্যু বহরমপুর সহরে।
ক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত।

অষ্টম—অনাদিনাথ (১৮৮০-১৯৫৫) Advocate, মৃত্যু বি টি রোড কলিকাতা।
নির্মলা বালা দেবী।

নবম—বীরেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯৫৪) অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান, Bengal Engineering College, Sibpur and Krishna Nath College Berhampur, মৃত্যু বহরমপুর।
শৈলবালা দেবী।

দশম ও কনিষ্ঠ—অখিলনাথ (১৮৮৫-১৯৫১) Prof of Gynaecology & obstetric, Patna Medical College, মৃত্যু Katrasgarh, Manbhum
বীণাপানি দেবী।

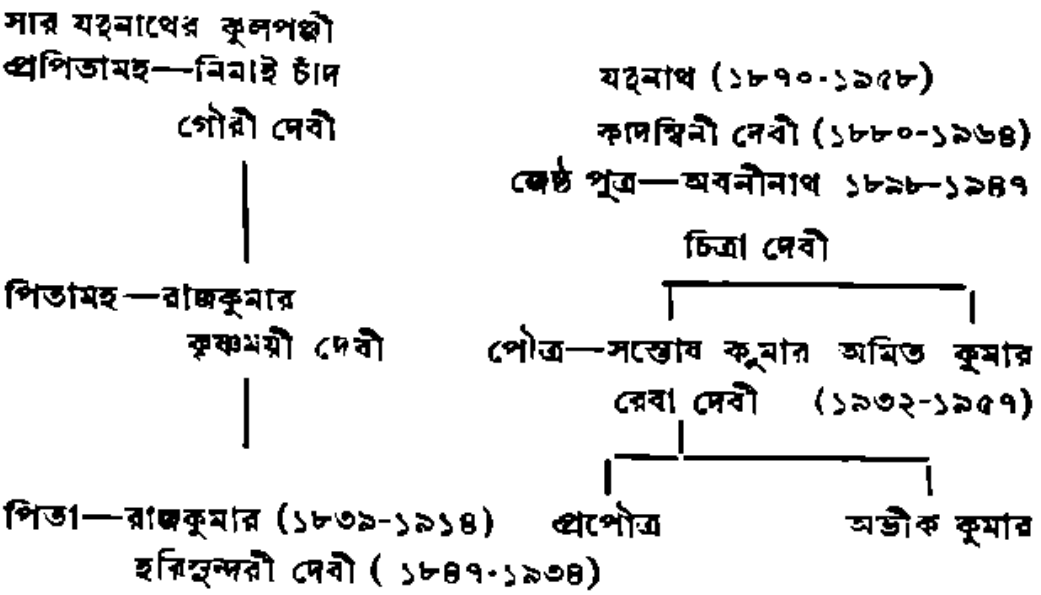

স্যার যদুনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জী

যদুনাথের জন্ম ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার, ১৮৭০, কবচমাড়িয়া গ্রাম, জেলা রাজসাহী। মৃত্যু ১৯৫৮ ১০ নং লেকটেরেস, কলিকাতা। বিবাহ ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ কাদম্বিনী চৌধুরীর সহিত। কাদম্বিনী দেবীর জন্ম (১৮৮০), মৃত্যু ১৯৬৪, ১০ নং লেকটেরেস, কলিকাতা। প্রথম সন্তান—অবনীনাথ, জন্ম সোমবার ৮ই জুন ১৮৯৬। Msc (cal) Phd. (London)। University, Reader Dept. of Physics Aligar Muslim মৃত্যু ১৯৪৭. কলিকাতা। পত্নী চিত্রা দেবী,

দ্বিতীয়া কন্যা—জন্ম শনিবার ১০ই অক্টোবর, ১৮৯৮। মৃত্যু ২রা জানুয়ারী, ১৮৯৯। তৃতীয়া কন্যা—উষাবালা বা তপমনি, ১০ই জানুয়ারী, রবিবার, ১৯০০, মৃত্যু, মে ১৯০৩। চতুর্থ সন্তান—মনীন্দ্রনাথ. জন্ম ১৭ই মার্চ, সোমবার, ১৯০২ মৃত্যু, ১৯ শে মে, ১৯২০। Iso পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করেন।

পঞ্চম—সত্যেন্দ্রনাথ, জন্ম ৭ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, ১৯০৭, মৃত্যু

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, ইংলণ্ডে Sandhurst Military Academy তে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

ষষ্ঠ কন্যা—প্রিয়ম্বদা, জন্ম ৩১শে আগষ্ট, ১৯০৫। স্বামী ডাঃ সৌরীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৯৭) মৃত্যু-১৯৪৭ ১০নং লেক্‌টেরেস. কলিকাতা

সপ্তম কন্যা—জন্ম ২রা জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯০৭, মৃত্যু ২২মে শুক্রবার ১৯০৮

অষ্টম কন্যা—দীপিকা বা হাসি, জন্ম ৬ই মার্চ, শুক্রবার, ১৯০৯, স্বামী বীরেন্দ্রনাথ বোস, এম এ বি,এল (১৮৯৬-১৯৬৪)

নবম কন্যা—সুধা, ১৯শে নভেম্বর, ১৯১১ স্বামী Major সুশীল কুমার ঘোষ। মৃত্যু ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২

দশম কন্যা—রমা, ১৮ই নভেম্বর ১৯১৬। ISCতে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান, MSC (Cal), মৃত্যু ১৯৪৯।

যদুনাথের কর্মজীবন

জন্ম করচমাড়িয়া গ্রাম, জেলা রাজশাহী, ১৮৭০, ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার। বি, এ পরীক্ষায় ইংরেজী ও ইতিহাসে অনার্স, মাসিক ৫০ বৃত্তিলাভ। মার্চ ১৮৯১। এম এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম. (with record marks) ১৮৯২ ডিসেম্বর। রিপন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক, জুন, ১৮৯৩। বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক, মার্চ ১৮৯৬-১৮৯৮। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ—ডিসেম্বর ১৮৯৭। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক—জুন, ১৮৯৮—জুন ১৮৯৯। পাটনা কলেজে প্রথমে ইংরাজী, পরে ইতিহাসের অধ্যাপক, ১৯০২ জানুয়ারি হইতে আগষ্ট ১৯১৭। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতেতিহাসের প্রধান অধ্যাপক—আগষ্ট ১৯১৭—জুলাই ১৯১৯। আই এ. এস স্তরে উন্নীত—১৯১৮। কটক র‍্যাভেনশ কলেজে ইতিহাসের তথা ইংরেজীর অধ্যাপক—জুলাই ১৯১৯—অক্টোবর ১৯২৩। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেনের অনারারি মেম্বার এপ্রিল, ১৯২৩। পাটনা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক—অক্টোবর ১৯২৩—আগষ্ট ১৯২৬,সি আই ই, ১৯২৬—, জানুয়ারি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার—১৯২৬-১৯২৮। নাইট উপাধি লাভ জুন, ১৯২৯। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বোম্বাই শাখার স্যার

জেম্‌স্‌ ক্যাম্বেল স্বর্ণপদক লাভ—জুলাই, ১৯২৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি—১৯৩৫-৩৬, ১৯৪০-৪৪, ১৯৪৮। ডি, লিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য—১৯৩৮। এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি ফেলো—৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। ডি. লিট, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৪৪।

[লেখিকা যদুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ। বর্তমান রচনাটি পারিবারিক তথ্যের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে—ইঃ সঃ]

আচার্য যদুনাথের প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়

আচার্য যদুনাথ জন্মেছিলেন ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তিনি ৮৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ১৯৭০ -এর ১০ই ডিসেম্বর তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

যদুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন রাজশাহী জেলার নাটোর থেকে দশ মাইল পূর্বে করচমাড়িয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম রাজকুমার সরকার। যদুনাথের ছাত্র জীবন আরম্ভ হয় রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে। ১৮৮৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ঐ কলেজ থেকেই তিনি এফ, এ, পরীক্ষা পাশ করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। যদুনাথ এলেন কলকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে লাগলেন। আর থাকতেন হিন্দু হোষ্টেলে।

যদুনাথের পিতামাতা ছিলেন সুস্থ, সবল আর কর্মঠ। মানসিক প্রতিভা, কর্মঠ দেহ আর দীর্ঘ জীবন তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই।

যদুনাথ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বি, এ পরীক্ষা দিয়ে ইংরাজী ও ইতিহাসে অনার্স পেলেন। তার ওপর ৫০ টাকা বৃত্তি। তারপর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সাহিত্যে তিনি এম, এ, পরীক্ষা দিলেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ইংরাজ অধ্যাপক এইচ, আর, জেনস তাঁর ইংরাজী প্রশ্নপত্রে দিলেন ৯৫ নম্বর। অধ্যাপক পার্সিভ্যাল দিলেন একপত্রে ৯০, আর একপত্রে ৮৭।

পিতামাতাই ছিলেন যদুনাথের আদর্শ। ইতিহাস ছিল তাঁর পিতার প্রিয় পাঠ্য বিষয়। তাঁর কাছেই তিনি পেয়েছিলেন ইতিহাস পাঠের প্রেরণা।

দীর্ঘ সাধনা ছাড়া সিদ্ধিলাভ হয় না। যে প্রতিভাবান যদুনাথকে আমরা পেয়েছিলাম তার পিছনে লুকিয়ে ছিল দীর্ঘ প্রস্তুতির ইতিহাস ; সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালার পেছনে যেমন থাকে তার দিনের বেলার আয়োজন। মেট্রোপলিটন

কলেজের অধ্যক্ষ ও 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষের অসাধারণ ইংরাজি লেখার ভঙ্গী (style) যদুনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। মুগ্ধ করেছিল। যদুনাথ তাঁর লেখার ভঙ্গীকে অনুসরণ করতে লাগলেন। লিখতেন আর কাটতেন। সেই আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনার ফলে তিনি পেয়েছিলেন অল্প কথায় বক্তব্য প্রকাশ করবার শক্তি। এই রকম সাধনা ও অধ্যবসায়ে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বাংলা ও ইংরেজি ভাষা।

এম. এ. পাশ করার পর আরম্ভ হল তাঁর অধ্যাপক জীবন। ১৮৯৩ হতে ১৮৯৯ পর্যন্ত যদুনাথ ইংরাজি সাহিত্য অধ্যাপনা করলেন। প্রথম রিপন কলেজে (জুন, ১৮৯৩-১৮৯৪) তারপর বিদ্যাসাগর কলেজে ছিলেন (১৮৯৮ জুন—১৮৯৯ জুন)।

সে আজ ৭৬ বৎসর আগের কথা। সেটা বাংলা ১৩০১ সাল। হিন্দু হোষ্টেল থেকে 'সুহৃদ' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হল। তার সম্পাদক হলেন কবি রজনী মোহন ঘোষ। আর এর লেখক ছিলেন শ্রীমতি সরলাবালা সরকার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রজনীকান্ত সেন (কান্ত কবি) গিরিবালা দেবী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দীনেন্দ্রকুমার রায়, মানকুমারী দেবী অবিনাশচন্দ্র দাস, জলধর সেন, সতীশচন্দ্র আচার্য (মহামহোপাধ্যায়), হৃষীকেশ শাস্ত্রী, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি।

যদুনাথ তখন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। হিন্দু হোষ্টেলেই থাকেন।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র, রবিবার সুহৃদ প্রকাশের কয়েক দিন পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। সুতরাং এই সংবাদ বুকে বহন করেই মাসিকপত্র খানি প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম সংখ্যাতেই আচার্য যদুনাথ **Fall of Tipu Sultan"** নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করলেন। এইটি যদুনাথের প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধটি তিন সংখ্যায় সম্পূর্ণ হল। তারপর তিনি লিখলেন **"New Leaven in Bengal"** ; আর লিখলেন, **"Sonnet on Despondency"** শীর্ষক একটি চতুর্দশ পদাবলী ইংরাজি কবিতা।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যদুনাথ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান।

তিনি এই উপলক্ষে "ইণ্ডিয়া অব আওরঙ্গজীব" শীর্ষক একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেখানি প্রকাশিত হয়। যদুনাথ ইংরাজীতে এম এ. পরীক্ষায় (১৮৯২) উত্তীর্ণ হয়েও. পি আর এস পরীক্ষার জন্য ঐতিহাসিক গবেষণা মূলক পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেন।

টমাস এলভা এডিসন বলেছেন, প্রতিভা হল "Ten percent inspiration, the rest perspiration" অর্থাৎ প্রতিভার দশভাগ হল প্রেরণা, আর অবশিষ্ট হল পরিশ্রম। যদুনাথ যে পরে অসাধারণ ঐতিহাসিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তার মূলসূত্র পরিশ্রমের এইখানেই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পরিণত বয়সের পাকা লেখার সঙ্গে তাঁর এই প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধের কোন পার্থক্য করা যায় না। অবশ্য এই প্রবন্ধটি ইংরাজ ঐতিহাসিকদের পুস্তক অবলম্বনে লেখা। তিনি তখনও আরবী বা ফার্সী—হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বনে ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেন নি।

সেরিঙ্গাপত্তন

এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, কাবেরী নদী পরিবৃত এই সেরিঙ্গাপত্তন দ্বীপ। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ভারতের শ্রেষ্ঠ ও জনবহুল নগরী এই সেরিঙ্গাপত্তন। তখন ভারতে সর্বত্র অরাজক অবস্থা। মোগল রাজত্বের অবসান হয়েছে। মারাঠা, নিজাম, রাজপুত, ইংরেজ ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি সকলেই সমগ্র ভারত জুড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। শুধু দাক্ষিণাত্যে হায়দার আলির দৃঢ় শাসন ও অসীম প্রতাপে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে। শিল্পকলা একমাত্র এই রাজ্যে নির্বিঘ্নে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আর মহীশূরের রাজধানী সেরিঙ্গাপত্তন শহর চারিদিকে কাবেরী নদী পরিবৃত, সুদৃঢ়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলির দেহাবসান হয়। দৃঢ় ও কর্মঠ, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী, সাহসী ও রণকুশল টিপু কোন দিন বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হন নি। কঠোর সৈনিকের জীবনেই তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

ইংরেজের আক্রমণ।

ইংরেজ বিদ্বেষী বীর টিপু সুলতানকে দমন করবার জন্য ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের

৫ই এপ্রিল সেনাপতি হ্যারিসের অধীনে মাদ্রাজ সৈন্য এসে উপস্থিত হল। তাতে ছিল কোম্পানীর ৩০,৯৫৯ জন সৈন্য। আর নিজামের ৬০০০ অশ্বারোহী সৈন্য। এই বাহিনী সেরিঙ্গাপত্তন দুর্গের দুমাইল পশ্চিমে এসে উপস্থিত হল। ১৪ই এপ্রিল বোম্বাই থেকে ৬৪২০ জন সৈন্য এসে এই বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। এই অবরোধকারী সৈন্যের মোট সংখ্যা হল ৪৩,৩৭৯। ২৮শে এপ্রিল, রবিবার রাত্রে যেখান দিয়ে সেরিঙ্গাপত্তন দুর্গ আক্রমণ করা স্থির হয়, সেখানে পরিখা কাটা হল। দুর্গের নিকটতম স্থানে ৬টি কামান বসান হল।

৩০শে এপ্রিল প্রভাতে কামান গর্জন সুরু হল। সমস্ত দিন কামান গর্জন শোনা গেল। দুর্গ প্রাকারের যে স্থানটি আক্রমণের উপযুক্ত বলে স্থির হয়েছিল মঙ্গলবার ২রা মে নিজামের কামানও সেখানেই আক্রমণ সুরু করল। দুর্গের সেই কোনের উপর এক সঙ্গে ২৯টি কামান আর ৬টি হাউইটজার থেকে এক সঙ্গে গোলা বর্ষণ চলতে লাগল। সমস্ত কামান গর্জনের পর সন্ধ্যাগমে দুর্গ প্রাকারের সেই স্থানটি ভেঙে পড়ল। তার পরদিন দুর্গের প্রধান প্রাকারেরও সেই অবস্থা হল।

পরদিন ৩রা মে রাত্রির গোপন অন্ধকারে ইংরেজ দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল। সেনাপতি স্যার ডি বেয়ার্ড ২৩৯৪ জন ইউরোপীয় ও ১৮৮২ জন সিপাহী নিয়ে ট্রেঞ্চের ভেতর আশ্রয় নিলেন। এই সৈন্য ৫ভাগে ভাগ হল; এক দলের নেতা হলেন কর্ণেল সেরক্রুক আর এক দলের নেতা হলেন লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল ডানলপ। ভগ্ন প্রাকারের ভেতর প্রবেশ করে দুদল দুদিকে যাবে স্থির হল। একদল ডান দিকে, আর এক দল বাঁ দিকে। আর একদল সৈন্য নিয়ে পেছনে থাকলেন কর্ণেল আর্থার ওয়েলেসলি।

কর্ণেল ডানলপ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ভগ্ন দুর্গ প্রাকারের ভেতর প্রবেশ করে ডান দিকে টিপুর এক সরদারের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। উভয়েই আহত হলেন। সরদার ইংরেজের সঙ্গীনের খোঁচায় সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন। আর ডানলপ অত্যধিক রক্তক্ষয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

ক্যাপ্টেন মট তখন টিপুর সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। সৈয়দ সাহেব নামে টীপুর একজন প্রিয় সেনাপতিও যুদ্ধে নিহত হলেন। ভয়ে টিপুর এখানকার সৈন্য পূর্বদ্বারে পালাবার জন্য সমবেত হল। কয়েকজন ফরাসী সেনাপতি তাদের উৎসাহিত করে ফেরাবার জন্য সচেষ্ট হল। কিন্তু কৃতকার্য হল না।

কর্ণেল সেরক্রুকের অধীনে যে সৈন্যদল বামদিকে আক্রমণ করেছিল তারা কঠোর বাধার সম্মুখীন হল। স্বয়ং টিপু সেখানে তাঁর সেনানী নিয়ে বাধা দিলেন। তখন ভীষণ যুদ্ধ বাধল। অনেক ইংরেজ নিহত হল। লেফ্‌টনেণ্ট ফারকার অসম সাহসে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ গুলির আঘাতে নিহত হলেন।

ইংরেজ সৈন্য থেমে গেল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পিছন থেকে আর একদল ইংরেজ সৈন্য ইতিমধ্যে দুর্গে প্রবেশ করে তাদের সাহায্যে এল। তখন যুদ্ধ পুরোদমে আরম্ভ হল। উভয় পক্ষে অসংখ্য সৈন্য হতাহত হল।

এতক্ষণে সেরিঙ্গাপত্তন অবরোধ সম্পূর্ণ হল। দুর্গের মধ্যে টিপুর ১৩,৮০০ সৈন্য ছিল। তার মধ্যে হাজার হাজার সৈন্য নিহত হল। আর বাকি সৈন্য পালিয়ে গেল। টিপুর সরদার ও সেনাপতিদের মধ্যে ৩১জন নিহত ও ১৭ জন আহত হল।

মেজর এ্যালেন এক দল সৈন্য দ্বারে রেখে নিজে টীপুর সন্ধানে দুর্গের ভেতর প্রবেশ করলেন। দুর্গের কিল্লাদার বললেন সুলতান টিপু দুর্গের মধ্যে নেই। তিনি উত্তর দিকের একটা ছোট দ্বারের নিচে আহত হয়ে পড়ে আছেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। ক্যাপ্টেন বেয়ার্ড টিপুর দুই নাবালক পুত্রকে রক্ষী পরিবৃত করে ইংরেজ শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন।

ক্যাপেটন বেয়ার্ড, কর্ণেল ওয়েলেসলি, মেজর এ্যালেন আর ৭৪ হাইল্যাণ্ডার দলকে নিয়ে উত্তর প্রাকার দ্বারে চললেন। কিল্লাদার তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, একটু অল্প পরিসর স্থানে ৪০০ লোক আহত রক্তাক্ত, পদদলিত হয়ে পড়ে আছে।

রাত্রির অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়েছে। কাউকে চিনবার উপায় নেই। মশাল আনা হল। সেই আলোয় সুলতানের পালকি আর ঘোড়া দেখতে পাওয়া গেল। অনুমান হল যে সুলতান নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও আছেন। একে একে মৃতদেহের মধ্যে খুঁজে তাঁদের অনুচরেরা একটি হৃষ্ট পুষ্ট মাঝারি আকারের মৃতদেহ নিয়ে এল। ইংরাজ সৈন্য তার পাগড়ি, জামা ও তরবারি সমেত কোমরবন্ধ লুঠ করেছে। মৃতের ডান দিকের কপালে একটি গুলি বিদ্ধ রয়েছে। শরীরে আরও তিনটি আঘাতের চিহ্ন বর্তমান। কিন্তু কঠোর মৃত্যু সেই শান্ত মুখে কোন বিকৃতি ঘটাতে পারে নি। চোখ দুটি তখনও খোলা।

ওয়েলেসলি ও এ্যালেন শরীরের উত্তাপ অনুভব করলেন। তাঁদের সন্দেহ হল, হয়ত সুলতানের তখনও মৃত্যু হয়নি। কিন্তু নাড়ী ও বুক পরীক্ষা করে তারা সুলতানকে মৃত বলেই স্থির করলেন।

ফতে আলি টিপু ছিলেন একজন কঠোর সৈনিকের পুত্র। আর নিজেও একজন সৈনিক। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯ বৎসর বয়সে তাঁর পিতার নিকট যুদ্ধে তাঁর দীক্ষালাভ হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, সেপ্টেম্বর মাসে কর্ণেল বেলির অধীনস্থ একদল বৃটিশ সৈন্যকে তিনি কেটে কুচি কুচি করে ফেলেন। তিনি বলতেন, আমি বাঘের মত দুদিন বাঁচি সেও ভাল, কিন্তু ভেড়ার মত দুশ বছর বাঁচতে রাজী নই। সেরিঙ্গাপত্তনের দুই যুদ্ধে, তিনি তাঁর চরিত্রের এই বীরত্বের কঠোর প্রমান দিয়েছেন।

এই অবরোধের পূর্বে ১৪ দিন টিপু বোধ হয় একদিনও প্রাসাদে বাস করেন নি। উত্তর প্রাকারের "কুলালি দিদি" নামে একটি ছোট ঘরে তিনি আহার নিদ্রা সম্পন্ন করতেন। আর অধিকাংশ সময় এখানেই অতিবাহিত করতেন। অর্ধ দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর হয়েও তিনি একজন সেনাপতির কঠোর জীবন যাপন করতেন। তাঁর আহার্য ছিল অতি সাধারণ। পোষাক পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে কোন বাহুল্য ছিল না। একখানি পালকিই ছিল তাঁর সিংহাসন আর তাঁর শয্যা। চারটি তাঁবুতে তাঁর অনুচরেরা আর তার জিনিষপত্তর থাকত। তিনি বলতেন মানুষ একবারই মরে। তা সে কখন মরে তাতে কিছু আসে যায় না।

টিপুর শেষদিন

৪ঠা মে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ। প্রভাত। একদল জ্যোতিষী সেই "কুলালী দিদ্দি" নামক ঘরে এসে টিপুর সঙ্গে দেখা করল। সেই দিনটি ছিল চান্দ্র মাসের শেষদিন। অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। সেইদিন তাঁর এক ভীষণ অমঙ্গল ঘটতে পারে বলে তাঁরা গণনা করে দেখেছেন। জ্যোতিষের গণনার এই ভবিষ্যৎ বাণী তাঁর অন্তরে এক আশ্চর্য পরিবর্তন এনে দিল। হিন্দু ব্রাহ্মণদের তাঁর সামনে উপস্থিত হতে দেখে তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী সত্য বলে তাঁর মনে হল।

তিনি তৎক্ষণাৎ (তখন সকাল ১০টা) প্রাসাদে গিয়ে ব্রাহ্মণরা যা যা করতে বললেন, সেগুলি সব পালন করতে আদেশ দিলেন। ভিক্ষুকদের প্রচুর দান করলেন। আর সেই ব্রাহ্মণদের মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, হাতী দান করে তাঁর জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বললেন। তিনি প্রাসাদে কারও সঙ্গে দেখাও করলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি আবার "কুলালি দিদি"তে ফিরে এলেন।

তখন দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গিয়েছে। সুলতান এইবার তাঁর খাবার আনতে বললেন।

দুজন গুপ্তচর তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা খবর দিল যে ইংরেজ তাঁদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু সুলতান বিশ্বাস করতে পারলেন না যে ইংরেজ এই দিন দুপুরে বৈশাখ মাসের কাঠফাটা রোদ্দুরে আক্রমণ করবে। যখন তাঁর এক সেনাপতি সৈয়দ গফুর এই সংবাদই পাঠিয়ে তাঁর সৈন্যদের প্রস্তুত রাখতে অনুরোধ জানাল তখনও তাঁর মন একথা বিশ্বাস করতে পারল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সেরিঙ্গাপত্তনের প্রস্তর প্রাকার ছিল দুর্ভেদ্য আর ইংরেজ খাদ্যাভাবে অবরোধ সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

শত্রুবিধ্বস্ত পশ্চিম প্রাকার, ব্রাহ্মণদের অমঙ্গলসূচক ভবিষ্যৎবাণী, বিশ্বস্ত গুপ্তচরের সংবাদ, সৈয়দ গফুরের কথা—কিছুতেই তিনি বিচলিত হলেন না। সেই সময় তিনি তাঁর সৈন্যদের খাবার ছুটি দিলেন। নিজেও খেতে বসেছেন। তাঁর আহার তখনও শেষ হয়নি। এমন সময় শত্রুর আক্রমণের শব্দ তাঁর কানে এসে পৌঁছল। সুলতান আহার অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়লেন।

তিনি যখন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করছেন তখন তাঁর কাছে সংবাদ এল যে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি সৈয়দ গফুর নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন সাহসী বীর সৈয়দ গফুর যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। সে বেহেস্তে যাবে। মহম্মদ কাসিমকে তার স্থানে যেতে বল।

এইবার তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের সশস্ত্র হয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি নিজেও সরদারদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। সেখানে নিজের হাতে পরপর আটবার গুলি চালালেন। তাঁর গুলিতে চারজন ইউরোপীয় নিহত হল। তাঁর সৈন্যরা তখনও সমবেত হতে পারেনি। অথচ ইংরাজ সৈন্য সামনে অগ্রসর হয়ে আসছে। সুলতান দেখলেন তাঁর নিকটে কোন সৈন্য নেই। তিনি প্রায় একাকী। মাত্র কয়েক জন বিশ্বস্ত সেনাপতি তাঁর কাছে আছে।

নির্ভীক টিপু

ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে তিনি একাকী অসম সাহসে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর আক্রমণ ও অগ্নিবর্ষণ এতই কঠোর হয়ে উঠল যে ইংরেজ সৈন্য পশ্চাৎপদ হবে কিনা ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু আর একদল ইংরেজ সৈন্য (১২নং রেজিমেন্ট) তাদের সাহায্য করতে এসে পড়ল। সুলতান দুই দল সৈন্যের মধ্যে পড়লেন।

তাঁর সৈন্য পশ্চাদপসরণ করল। সকলের শেষে সুলতানও পশ্চাদপদ হলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর প্রিয় অশ্বকে সামনে পেয়েই তাতে আরোহণ করে তিনি ফটকের দিকে চলে গেলেন। গেটে ঢুকতেই তাঁর ডান দিকে একটা গুলি লাগল। তিনি এই গুলির আঘাত গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু কি করে অগ্রসর হবেন? সেই স্বল্প পরিসর দ্বার মৃত ও মুমূর্ষুতে পরিপূর্ণ। গেটের একদিকে ইংরেজ সৈন্য বেয়নেট উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। আর একদিকে ১২ নং রেজিমেন্টের সৈন্য তাঁদের ওপর গুলি বর্ষণ করছে। এই উভয় দলের মধ্যে পড়ে কেউ অগ্রসর হতে পারছে না। গেটের খিলানের নিচে সুলতান ও আর সকলেই আটকে পড়লেন। তার ওপর তিনি প্রথমে যেখানটায় আঘাত পেয়েছিলেন, তারই

কাছে তিনি আর একটা আঘাত পেলেন। তাঁর ঘোড়াও আহত হয়ে মাটীতে পড়ে গেল। তাঁর পাগড়ী মাটীতে লুটিয়ে পড়ল। তাঁর বিশ্বস্ত পার্শ্বচর রেজাখান তখনও তার পাশেই ছিল। সে তাঁকে ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলল। কিন্তু পুরুষসিংহ টিপু একথায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কঠোর তিরস্কারে তার মুখ বন্ধ করলেন।

কয়েকদিন আগে ইংরেজদের কামানের গোলার শব্দ শুনে সুলতান তাঁর সর্দারদের বলেছিলেন আমাদের শেষ দিন সমাগত। তোমরা কি করবে? তারা সকলেই একবাক্যে বলেছিল, আপনার সঙ্গে আমরাও একসঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করব।

টিপুর মৃত্যু

সুলতান ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আহত হয়ে সেখানে পড়ে রইলেন। সেখানে ৪০০ মহীশূরবাসী মৃত ও মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। কয়েক জন ইংরেজ সৈন্য লুটপাটের আশায় সেখানে এসে প্রবেশ করল। সুলতানের তরবারি সমেত রত্নখচিত কোমরবন্ধটি তাদের চোখে পড়ল। একজন কোমর বন্ধটি নেবার জন্য হাত দিয়েছে। "সেরিঙ্গাপত্তনের সিংহ" তখন আঘাতের পর আঘাতে দুবার গুলি বিদ্ধ হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে আছেন। তখনও তাঁর মৃত্যু হয় নি। তিনি শুয়ে শুয়েই তরবারি নিয়ে সেই সৈন্যের পায়ে এক আঘাত করলেন। তাঁর হাত তখনও নিস্তেজ। সুতরাং সেই সৈন্যের পায়ে তরবারির একটা আঘাত লাগল মাত্র। সাংঘাতিক কিছু হলনা। মুমূর্ষুর এই অস্ত্রাঘাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই ইংরেজ সৈনিক এক বন্দুকের গুলিতে তাঁর রগ বিদ্ধ করল। সেই আঘাতেই সুলতান টিপুর প্রাণবায়ু বহির্গত হল। বেলা তখন সাড়ে তিনটা। তার তিন ঘণ্টা পরে সেনাপতি বেয়ার্ড সুলতানের মৃতদেহ আবিষ্কার করেন।

সুলতান টিপুর মৃতদেহ একখানি পাল্কির ভেতর স্থাপন করে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হল। ইংরেজ সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণে সমস্ত রাত মৃতদেহ সেই অবস্থায় প্রাঙ্গণেই থাকল।

সমস্ত সহরে ইংরেজ সৈন্যের লুঠপাট চলছে। স্যার ডেভিড বেয়ার্ড সহরের লুঠপাট বন্ধ করবার জন্য সৈন্য পাঠালেন। তারপর টিপুর প্রাসাদে জেনানা

রক্ষার জন্য গার্ড বসালেন। সেখানে ছিলেন সাড়ে ছয়শত ভীত ত্রস্ত নারী এবং সরদারদের পরিবারবর্গ।

এই সব গোলমালের মধ্যে প্রাসাদের খাঁচায় আবদ্ধ কয়েকটী বাঘ খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ে প্রাসাদের উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের গুলি করে মারা হল।

প্রাসাদের প্রাঙ্গনে ৭৪ নং ও ১২ নং রেজিমেণ্টের সৈন্যগণ তাদের অস্ত্রশস্ত্র এখানে স্তূপাকার করে জেনানা রক্ষায় নিযুক্ত থাকল। আর ইংরেজ সেনাপতি স্যার ডেভিড বেয়ার্ড তাঁর কয়েকজন অনুচর নিয়ে এই প্রাসাদের বারান্দায় একখানি কার্পেটের ওপর শুয়ে থাকলেন।

কি বিস্ময়কর পরিবর্তন! প্রভাতে সহস্র সহস্র লোক যাঁর ভয়ে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত ছিল, দ্বিপ্রহরে যিনি এই ভীষণ সমরের প্রাণস্বরূপ ছিলেন, তাঁর প্রাণহীন দেহই তাঁরই প্রাসাদের উঠানে এক ডেলা মাটির মত নিস্পন্দ ও নিথর হয়ে পড়ে আছে। তাঁর রাজত্বের আজ অবসান হয়েছে। তাঁর গৃহের আজ আর তিনি অধীশ্বর নন। তাঁর পুত্রগণ আজ ইংরেজের হাতে বন্দী। কিম্বা হয়ত পিতৃহারা পুত্রগণ গৃহহারা, নিরাশ্রয় হয়ে ইতস্তত পদচারণা করে বেড়াচ্ছে। টিপুর মনোরম নদীমেখলা রাজধানী আজ বিজয়ী ইংরেজের পদানত। সূর্যোদয়ে যে দুর্গ নবাবের সাজসজ্জা ও আড়ম্বরে পরিপূর্ণ ও মুখরিত ছিল দ্বিপ্রহরে কামান বন্দুকের শব্দে নিনাদিত ছিল, আজ নিশায় সেখানে বিজেতার জয়োল্লাস, বিজিতের হাহাকার ও ক্রন্দন ধ্বনিকে ঢেকে দিচ্ছে।

প্রাসাদে আজ মৃত্যুর বিভীষিকা। সেখানে বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। শুধু মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে ইংরেজ সৈন্যের পদচারণার পদধ্বনি। আজ যারা তাদের সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত, পথের ভিখারী হয়েছে তাদের মৃদু ও করুণ ক্রন্দন ধ্বনি। আর দূরে সহর লুণ্ঠনের চীৎকার মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। কখনও বা কোন সৈনিক এসে সেনাপতির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে সংবাদ দিচ্ছে যে সহস্র সহস্র সৈন্য বিজয় উল্লাসে উন্মত্ত। তাদের লুঠপাট থেকে বিরত করা সম্ভব নয়। তারা সহরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তারই লেলিহান শিখা আকাশে বাতাসে দিগন্ত বিস্তার করছে।

টিপুর রাজকোষ লুণ্ঠন

যথাযথ হুকুম দিয়ে সেনাপতি আবার নিদ্রিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। এবার সংবাদ এল যে টিপুর রাজকোষ ভেঙ্গে লুণ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে দেখা গেল এমন কি ইংরেজ সেনাপতিরাও স্বর্ণ ও মণিমুক্তা থলে ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে।

সমস্ত রাত্রি লুঠপাট চলল। প্রত্যেক বাড়ী লুণ্ঠিত হল। ধনী ব্যবসায়ী ও সরদারদের মহিলাগণ সম্মান হানির ভয়ে মণিমুক্তা রত্ন স্বর্ণ সব বিলিয়ে দিলেন। পরদিন প্রভাতে সৈনিকরা বহুমূল্য হীরা মুক্তা ও সোনার তাল পথে পথে বিক্রী করতে লাগল। ইউরোপীয় অফিসারগণ সৈন্যদের রাজকোষ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিয়ে তাদের নিকট থেকেই সেই সব বহুমূল্য রত্নাদি নাম মাত্র মূল্যে কিনে নিলেন।

তারপর দেখা গেল দুর্গের মধ্যে ছোট বড় ৯২৯ টি কামান, ৯৯০০ প্রয়োজনীয় অস্ত্র, ৪২৪,০০০ গোলা, ৫২০,০০০ পাউণ্ড বারুদ রয়েছে। কামান বন্দুক তৈরির কারখানা ২টি, ১১টি বারুদাগার, ৪টি কামান বন্দুকাগার। আর অসংখ্য খাদ্যপূর্ণ শস্যাগারও দুর্গমধ্যে দেখা গেল।

ধনাগার লুণ্ঠনের পর যে ধন সঞ্চিত ছিল ইংরেজরা তার মূল্য স্থির করলেন ১ মিলিয়ন পাউণ্ড ষ্টার্লিং। আরও দেখা গেল ৫০০ উট বোঝাই হয় এমন মূল্যবান বস্ত্র।

সোনা রূপার থালা, রূপার হাওদা এবং বহু ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়েছিল। বহু রাজা মহারাজার বংশ পরম্পরাগত সঞ্চিত ধনরত্ন হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের ধনগারে স্থান পেয়েছিল। সেগুলিও একদিনে ইংরেজের হস্তগত হল। সঞ্চিত হতে যা যুগ যুগ সময় লেগেছিল সেগুলি অন্তর্হিত হতে মাত্র একদিন সময় লাগল।

হায়দারের একখানি বহু মূল্য স্বর্ণ সিংহাসন ছিল। অতি মনোরম। তার মূল্য নির্ণয় করা অসম্ভব। আর ছিল একটি বিরাট স্বর্ণ সিংহ, বহুমূল্য মণি মুক্তা খচিত। সেই সিংহটি সিংহাসন খানিকে মাথায় করে ছিল। সিংহাসনের মাথার উপর চন্দ্রাতপ ও ঝালর বহুমূল্য মণিমুক্তা খচিত। সিংহাসনের চাঁদোয়ায় সন্নিবেশিত একটি বহু মণি মুক্তা খচিত পাখী। সেটি সৌন্দর্যে

সিংহাসনকেও হার মানিয়েছে। এর ঠোঁট দুটি ছিল পান্নার (emerald) চোখ দুটি ছিল carbuncles। বুক আর প্রসারিত ডানা দুটি আর তার লম্বা লেজ বহুমূল্য মণিমাণিক্য খচিত—বড় বড় হীরা, মুণিমুক্তা সোনাকে ঢেকে দিয়েছে। পৃথিবীতে এ ছিল অতুলনীয়।

এই বিশাল সংগ্রহ শাসায় অর্থ ও শক্তিতে যা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব, সবই ছিল। যদুনাথ বলেছেন—"In short, there was everything that power could command or money could purchase in this stupendous collection."

টিপুর সমাধি

এই সব সংগ্রহের পর সুলতানকে ইংরেজ তাঁর প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে সমাধি দিল। সেরিঙ্গাপত্তনের কাজী যেমন যেমন আদেশ করল, সেই মত সব ব্যবস্থা হল।

৫ই মে দুর্গ থেকে টিপুর মৃতদেহ সমাধি দিতে নিয়ে যাওয়া হল। দুদল ইউরোপীয় সৈন্য গার্ড অব অনার দেবার জন্য আগে আগে মার্চ করে চলল। তারপর চলল টিপুর ১৯ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল খালেক —প্রধান শোকযাত্রী হিসেবে। তার সঙ্গে চলল কিল্লাদার। তারপর প্রধান কাজী কোরানের বয়েদ আবৃত্তি করতে করতে চলল। তারপর অনুচরগণ সেই বয়েদগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হতে লাগল। এই শোভাযাত্রার পিছনে দুদল বন্দুকধারী ইউরোপীয় সৈন্য মার্চ করে চলল।

তখন দুর্গের প্রাকার থেকে প্রতি মিনিটে কামানের গর্জন শোকযাত্রাকে এক গুরু গম্ভীর অনুষ্ঠানে পরিণত করল।

লালবাগ উদ্যানের মধ্যে হায়দার আলির প্রাসাদ দৌলতখানা। সেইস্থানে সমাহিত ছিল হায়দার আলির মৃতদেহ। বীর পিতার সমাধির পাশেই সমাহিত হবে বীর পুত্রের মৃতদেহ। এইবার শেষকৃত্য সমাপ্ত হল। কাজী টিপুর সমাধি অনুষ্ঠানে জনসাধারণের মধ্যে ৫০০০ টাকা বিতরণ করলেন।

সমাধি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বুক বিক্ষুব্ধ করে উঠল ঝড়। কি ভীষণ ঝড়! সেই ঝড়ে মুহুর্মুহু কামানের গর্জনও ডুবে গেল। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকাতে লাগল। প্রবল বারিধারায় পৃথিবী ভেসে গেল। কাবেরী নদীতে এল প্লাবন। ভারতের শেষ বীরের পতন হল। সমগ্র ভারতের বুকে বিশাল রাজ্য স্থাপনে ইংরেজ আর কোথাও এত বড় বাধা পায় নি। ভারতের ভাগ্যাকাশে এই ঝড় ও দুর্যোগ ইংরেজ শাসন ও শোষণের ইঙ্গিত জ্ঞাপন করল।

ইতিহাসচর্চার প্রণালী

যদুনাথ সরকার

(বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ)

এই যে দেশময় ইতিহাসচর্চার একটা প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়াছে, এই যে কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছোট গল্পকে বাঙ্গলা মাসিকের পৃষ্ঠা হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছে' এ সুখবর যদি সত্য হয়, তবে জাতীয় মনের এই বিকাশ সম্বন্ধে সাহিত্য নেতা ও পরিষদ গুলির এক গুরুতর কর্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বেশীদিন অবহেলা করিলে চলিবে না। আমাদের কর্তব্য, এই নব জাগ্রত ইতিহাসসেবার চেষ্টাকে সমবায় সূত্রে বাঁধি, এই উদ্যমকে উপদেশ দ্বারা সংযত ও উচিত পথে চালিত করি, যেন বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যয় না হয়, যেন শ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন হয়, যেন যন্ত্রের বা প্রণালীর দোষে ঐতিহাসিক কারিগরের প্রস্তুত দ্রব্যগুলি অঙ্গহীন বা ভঙ্গুর আকার ধারণ না করে। সুধী মণ্ডলীই এই কাজ করিতে পারেন। ব্যক্তি বিশেষ একাকী এই কাজ করিতে সক্ষম নহেন। তাঁহার অধিকারও সাধারণে স্বীকার না করিতে পারেন। সকলেই জানেন যে কারিগর যেমন যন্ত্র হাতে পায় এবং যেরূপ প্রণালীতে কাজ করে, তাহার প্রস্তুত দ্রব্যও তেমনি হয়। মহামেধাবীর সুদীর্ঘ পরিশ্রমের ফলও যন্ত্রের দোষে বিশ্রী ও আশ্চর্যকর হয়। আর উচিত প্রণালী অবলম্বন না করিলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইতিহাসচর্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থা। দেশ কাল ভেদ বা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইহা সমান কার্যকর এবং সর্ববিধ সত্যের অন্তরে ইহা নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি জাতীয়তার অভিমানে মত্ত হইয়া এই প্রথা নব্য ইউরোপীয়গণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অবহেলা করি, তবে আমাদেরই ক্ষতি হইবে। জগৎ অগ্রসর হইবে; শুধু আমরা মধ্যযুগে পড়িয়া থাকিব। আমাদের রচিত ইতিহাস বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ হইবে এবং

বিদেশীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতেছেন তাহাই সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া কিছু দিন পরে আমাদের প্রাচীন ধরণের ঐতিহাসিক জল্পনা কল্পনাকে পরাস্ত করিবেই করিবে। কারণ ঋষিবাক্য মনে রাখিবেন, "সত্যই জয়লাভ করে, অসত্য করে না।"

ঐতিহাসিকের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিলে ইতিহাস লিখিবার শ্রেষ্ঠ প্রণালী জানিতে পারা যায়। প্রকৃত ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করিয়া চোখের সামনে উপস্থিত করে; আমরা যেন সেই সুদূর কালের লোকদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাবে ভাবি, তাহাদের সুখ দুঃখ আশা ভয় আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি। এইরূপ অতীত কাল সম্বন্ধে অবিকল ও পূর্বাঙ্গ সত্য উপলব্ধি করাই ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকে। যদি সেই সত্য নির্ধারিত না হইল, যদি অতীতের একটা মনগড়া ছবি খাড়া করি অথবা আংশিক ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হই, তবে ত কল্পনার জগতেই থাকিলাম। তারপর যে বিষয়ে যাহাই লিখি বা বিশ্বাস করি তাহা বালুকার ভিত্তির উপর তেতলা বাড়ী নির্মাণের চেষ্টা মাত্র।

সত্য নির্ধারণের প্রণালী কি? সর্বপ্রথমে নিজের মনকে এই কার্যের উপযোগী করিয়া তোলা। যশ, ধন বা প্রতিপত্তি লাভের লালসা দূর করিয়া নিজের অন্তরের অনুরাগ বিরাগ দমন করিয়া, সব পূর্বসংস্কার ত্যাগ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন!

সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব; কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের

প্রতিজ্ঞা। ভারতের অতি প্রাচীনকালের কথা, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতির রাজকাহিনী যদি কাল্পনিক বলিয়া ধরি তবে হিন্দুধর্মের গ্লানি হইবে, এই যে আমাদের একটা স্বাভাবিক ধারণা আছে, তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।

প্রামাণিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। এই জন্য ইউরোপে ইতিহাস রচনায় এক ক্রমোন্নতির ধারা দেখিতে পাই। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত পুরাতন মত, পুরাতন গ্রন্থ ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। আইনের পুস্তকের মত ইতিহাসের ক্রমাগত নূতন সংস্করণ কিনিতে হইতেছে। পিতামহদের সময় হইতে আগত বিশ্বাসের মূল পরীক্ষা করিয়া সেই পুরাতন অট্টালিকাগুলি ক্রমাগত নির্মম ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে নূতন নূতন গৃহ রচিত হইতেছে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত কিছু পরে দিতেছি।

সভ্যতা, সমাজ ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ইতিহাসের বিষয়ের মধ্যে বটে। ইহার মানবের লিখিত সাক্ষী না পাইলেও মানুষের হাতের কাজ কত যুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চিত আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি তাহার আরম্ভ প্রামাণিক ঘটনা হইতে। প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা ঐতিহাসিকের সর্বপ্রথম কার্য। এই মূল মন্ত্রটি এত সহজ, আপনারা প্রত্যহ আদালতে সাংসারিক কাজে ইহার এত ব্যবহার করেন যে ইহার ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নানা প্রদেশে লিখিত আধুনিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম আমরা এখনও স্বীকার করি নাই।

সাক্ষ্য পাইলেই আপনারা তিনটি প্রশ্ন করেন—(১) সর্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে? সেই first information অর্থাৎ প্রথম সাক্ষ্যের নকলটা সংগ্রহ হইয়াছে ত? পুলিস ডায়েরীর নকল কি করিয়া পাওয়া যায়?

(২) এই সাক্ষীটি ঘটনার জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? একি স্বচক্ষে দেখিয়াছে? না পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে?

(৩) মোকদ্দমার কোন পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ জড়িত আছে কি?

প্রত্যেক ইতিহাস লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, শ্রেণী বিভাগ, পরস্পরের উক্তির বিরোধ ভঞ্জন ও সমালোচনা করিয়া তবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা উচিত। প্রথমে এইরূপ তালিকা critical bibliography সংগ্রহ না করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যে মহাভ্রম তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝি না।

বর্ণিত ঘটনার সর্বপ্রথম ও প্রধান সাক্ষীর উক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সমসাময়িক লেখক না থাকিলে, ঘটনার যত অনুরবর্তী সাক্ষী পাওয়া যায় ততই ভাল। পুরাতন বিবরণ সংক্ষিপ্ত বা কর্কশ ভাষায় লিখিত হইলেও আধুনিক সময়ের সুদীর্ঘ ও সুললিত বর্ণনার উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে। আদি গ্রন্থ পাইলে অনুবাদ ব্যবহার করা অনুচিত।

অথচ আমাদের দেশের অনেক ঐতিহাসিকের নিকট মুড়ি মুড়কি এবং সীতাভোগের একই দর। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারাই দুকথা লিখিয়া গিয়াছে সকলেই সমান বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমরা মানিয়া লই; বিচার করি না, সমালোচনা করি না, সত্যের আদি উৎসে পৌঁছিতে চেষ্টা করিনা।

এই দেখুন পাঠান যুগের ভারত ইতিহাস লিখিতে গিয়া আমরা ফিরিস্তা এবং আলবাদায়ুনীর উপর এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল সম্রাটগণ সম্বন্ধে খাফি খাঁর উপর অন্ধ ভক্তি করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করি। অথচ এই তিন লেখকই বর্ণিত ঘটনার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ ঐ যুগের সমসাময়িক বিবরণ হইতে শুধু সংকলন করেন। আমরা সেই সব সমসাময়িক বিবরণ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি না, তাহা যে গ্রহণের যোগ্য একথাও মনে মনে বিশ্বাস করি না। একজন সমসাময়িক সাক্ষীর বিরুদ্ধে হাজার জন পরবর্তী যুগের নকল নবিশ খাড়া হইলেও ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই। তাহাদের কথা সমালোচনা হইতে পারে, ইতিহাসের মূল উপাদান নহে — এই সত্যটি কার্যত মানিয়া লই না।

আবার সাক্ষীটি সত্য জানিবার কতটুকু সুযোগ পাইয়াছিল তাহা দেখা আবশ্যক। এই যেমন সাজাহানের পুত্র সুজা আরাকানে মারা যান। সেখানে হিন্দু মুসলমানের যাতায়াত নিষেধ ছিল, মগরাজ ওসন্দাজ ও

পর্তুগীজ ভিন্ন অন্য বিদেশীকে তাঁহার রাজ্যে ঢুকিতে দিতেন না। এই ইউরোপীয় বণিকগণ সুরাটের শেষ দশা সম্বন্ধে যে সংবাদ ভারতে তাহাদের কুঠিতে প্রেরণ করে তাহা বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে কিছু কিছু এবং অর্ম্ভিন অনূদিত মানুশীর আত্মজীবনীতে বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। অথচ আমাদের লেখকেরা অন্য সব স্থান হইতে নানা গুজব সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ পূরণ করেন. এই দুই গ্রন্থ দেখেন না, দেখিলেও ইহাদের উক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন না।

আদি সাক্ষীর অনুসন্ধান করায় বিলাতে ইতিহাসক্ষেত্রে কি রাষ্ট্র বিপ্লবের ন্যায় পরিবর্তন হইতেছে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চারিশত বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় রিচার্ড ইতিহাসে নরপিশাচ বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছেন। অধুনা সার ক্লেমেন্টস মার্কহাম এই বিশ্বাসের ভিত্তি পরীক্ষা করিয়া ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পড়িয়া আসিতেছি যে স্পেনের ভিসিগথ বংশীয় শেষ রাজা রডেরিক তাহার সেনাপতি জুলিয়ানের কন্যার প্রতি অত্যাচার করায় জুলিয়ান মুসলমানদের ডাকিয়া রাজাকে বিনষ্ট করেন। কিন্তু ডোজি প্রভৃতির অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণ হইয়াছে যে এই বিবরণটি উপন্যাস মাত্র; ঘটনার প্রতি অত্যাচারের গল্প ঘটনার ছয়শত বৎসর পরে একজন ইটালীয় সন্ন্যাসী প্রথম রচনা করে। জুলিয়ান বলিয়া কেহ ছিল না। স্পেন দেশীয় যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুসলমানদের পক্ষ লয় তার নাম আর্বান। রডেরিক স্পেন রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন না, ইত্যাদি। ফলত আরবদের স্পেন বিজয় কাহিনী একেবারে নূতন করিয়া লিখিত হইতেছে। পুরুষগণের নাম ও চরিত্র, ঘটনা পরম্পরা, ঘটনার কারণ পর্যন্ত বদলাইয়া দিতে হইতেছে। নেপোলিয়ান সম্বন্ধে তিয়র (Thiers) যে ইতিহাস লিখিয়া যান এবং যাহা আমাদের দেশে আদৃত য়্যাবটের নেপোলিয়ান চরিতের মূল, তাহা নানা দেশের সরকারী কাগজপত্র ও গোপনীয় চিঠি অনুসন্ধানের ফলে এখন শিক্ষিত সমাজে কাব্য বলিয়া ঘৃণায় পরিত্যক্ত হয়। অথচ এই নব অনুসন্ধানের ফল যেখানে একত্রীভূত করা হইয়াছে সেই Holland Rose's Life of Napolen I এর নাম পর্যন্ত আমরা অনেকে শুনি নাই। সেই

য়্যাবট লইয়াই আমরা নেপোলিয়ান জোসেফিন প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিতেছি। আমাদের দ্বিতীয় নীলমনি টডের 'রাজস্থানও' যে অনেক স্থলে অবিশ্বাসযোগ্য উপন্যাস মাত্র একথা আমরা ভাবি না।

আসল গ্রন্থ বর্তমান থাকিতে অনুবাদের উপর নির্ভর করা যে কি ভুল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্র্যাণ্ট ডাফের "মারাঠা জাতির ইতিহাস" এক উপাদেয় গ্রন্থ; অথচ ডাফ সাহেবের মত পণ্ডিত ভুল করায় আফজল খাঁর দূতের নাম শিবাজীর দূতকে দেওয়া হইয়াছে। এটি নগণ্য বিষয় নহে; আফজল খাঁর দূত যদি শিবাজীর টাকা খাইয়া নিজ প্রভুকে বধ্যভূমিতে ভুলাইয়া আনিত তবে সে বিশ্বাসঘাতক হইত; শিবাজীর দূতের পক্ষে ঐ কাজ ততদূর নীতিবিগর্হিত নহে। সেই মত Dow's History of Hindostan নামক একখানি ইংরাজি গ্রন্থ অনেক মুঘল সম্রাটদের অতি বিশ্বাস যোগ্য ইতিহাস মনে করিয়া তাহার মত উদ্ধৃত করেন; অথচ ডাও সাহেব সমসাময়িক ও প্রামাণিক কোন ফার্সী গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই এবং যে সব নবা ফার্সী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন তাহারও বিশুদ্ধ বা অবিকল অনুবাদ দেন নাই। অধিকাংশ স্থলেই নিজের কল্পনা বলে সুরঞ্জিত কাহিনী লিখিয়াছেন। এখন পণ্ডিত সমাজে কেহই ডাওএর গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া মানেন না। সমসাময়িক লেখককে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া পূর্বে গ্রীস দেশের ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন প্রস্তর ফলক, মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে এবং যুক্তি সঙ্গত সমালোচনার ফলে গ্রীস ইতিহাসে যে কি মহা পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বিউরী (Bury) প্রণীত History of Greece পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ, ইসলামের অভ্যুদয় ও আদি যুগের বিশুদ্ধ ইতিহাস নব প্রকাশিত Cambridge Medieval Historyতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে অনেক ভ্রম দূর করে।

অতএব যদি মারাঠা ভাষাবিদ লেখক শুধু গ্র্যাণ্টডাফ অবলম্বনে এবং ফার্সী জানা লেখক ডাও অবলম্বনে ইতিহাস লেখেন তবে সে পুস্তকের মূল্য কি? তাহা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে না। এরূপ গ্রন্থের আমরা কেন আদর করিব? এরূপ উপগ্রন্থকে মহাগ্রন্থের গায়ে পরগাছা গ্রন্থকে বিলাতে rechauffee বলে. অর্থাৎ বাসি চপ কাটলেট পরদিন গরম করিয়া

বেচিবার চেষ্টা করা হইতেছে এরূপ নালশ। বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি এইরূপ গরম করা বাসি কাটতি হইতে দেওয়া যায় তবে সাহিত্যভোক্তাদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হইতে হইবে। এইরূপ গ্রন্থের নির্মম সমালোচনা করা একটি অবশ্য কর্তব্য কার্য যদিও ইহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এ কাজ ব্যক্তি বিশেষ না করিয়া সুধী মণ্ডলী করিলে ভাল দেখায় এবং তাহাতে বেশী ফল হয়।

যেখানে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চলে না সেখানে সর্বশেষে রচিত অথচ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদটি অবলম্বন করিতে হইবে। এই দেখুন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর দুই অনুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাইস ও এণ্ডারসন নামক দুই সাহেব বাহির করেন; তাহা অপেক্ষাকৃত অশুদ্ধ ফার্সী পুঁথি অবলম্বনে লিখিত এবং অনুবাদকেরাও অনেক স্থলে অর্থ ভুল বুঝিয়াছেন। এই পুস্তকের বিশুদ্ধ ফার্সী পাঠ অবলম্বন করিয়া রজার্স সাহেব যে ইংরাজী অনুবাদ রচনা করেন তাহাতে মূল্যবান ভৌগলিক টীকা ও সংশোধনী যোগ করিয়া দিয়া বিভারিজ সাহেব তাহা কয়েক বৎসর হইল প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আমরা প্রথমোক্ত অশুদ্ধ ইংরাজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ করি, রজার্সের অনুবাদ দেখা আবশ্যক বিবেচনা না করি তবে এরূপ অনুবাদে বঙ্গসাহিত্য পরিপুষ্ট হইল একথা বলা যায় না। সেই মত চীন পর্যটকদিগের ভ্রমণ কাহিনীর, মানুশীর গ্রন্থের এবং অশোকের অনুশাসনের একাধিক ইংরাজী অনুবাদ আছে। তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদটিই বাঙ্গলা লেখকেরা ব্যবহার করুন এই বলিয়া জেদ করা সুধীমণ্ডলীর কর্তব্য।

কখনও কখনও বাধ্য হইয়া অনুবাদের অনুবাদ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কোটেশনের কোটেশন তথা কোটেশন কেন ব্যবহার করিব? ইংরাজীতে একটা বড় কাজের কথা আছে "always verify your references" অর্থাৎ যাহার মত উল্লেখ করিলে তিনি ঠিক সেই কথাগুলি বলিয়াছেন কিনা তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। আমি যে পরের বচনটি তুলিয়া দিলাম, তাহা কাহার বচন এবং কোন গ্রন্থ হইতে আমি পাইয়াছি তাহা নির্দেশ না করিলে সাহিত্যিক অসাধুতা এবং ভ্রম সংশোধনেও বাধা পড়ে।

ইতিহাস লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণপঞ্জী দিতে বাধ্য। আইনের পুস্তক যেমন গুড়ি গুড়ি অক্ষরে ছাপা নজীরের উল্লেখ পূর্ণ না হইলে চলে না, তেমনি ইতিহাসও বর্জাইস অক্ষরের ফুটনোটে আবৃত হওয়া আবশ্যক ; ইহা পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে, উপায় না থাকিলে গ্রন্থের মূল্য হানি হয়। প্রত্যেক প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রতিপৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা দিয়া তাহাতে প্রামানিক গ্রন্থের নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুদ্ধ করিয়া উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। আমাদের বড় দোষ যে আমরা অনেকেই নিজের রচিত ইতিহাস বা প্রবন্ধে এইরূপ আদি বৃত্তান্তের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করার পরিশ্রমটুকু সহিতে চাহি না। হয়ত প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থের নাম মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিই। ইহাতে আমাদের জ্ঞান পিপাসু পাঠকও নিজে আদি বৃত্তান্ত পড়িয়া কোন বিষয়ে বেশী জানিবার পথ দেখিতে পান না।

এই যে সব প্রণালী এ পর্যন্ত নির্দেশ করিলাম, তাহা হিসাব রাখার মত শুধু পরিশ্রমের কাজ. ইহাতে বিশেষ মেধার আবশ্যক নাই। আমরা যদি এই কাজ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি এবং আলস্য ত্যাগ করি তবে আমাদের মধ্যে সকলেই একাজ করিতে পারেন।

এখন ইতিহাস রচনার আরও উচ্চতর সোপানে চড়া যাউক। ইতিহাস লেখক ব্যক্তিগত ভ্রম সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। একই ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রুপক্ষ ইহা বলিয়াছে, মিত্রপক্ষ উহা বলিয়াছে. বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী কবি ওরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন সাক্ষীটি বিশ্বাসযোগ্য এবং কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে তবে অতীত ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। যদি ইতিহাসে কোন পক্ষ প্রথমে এক তরফা ডিক্রী পান, তবে তাহা একদিন আপসেট হইবেই হইবে, কারণ জগতের জ্ঞানের আদালতে আপীল কখনও তমেয়াদি দোষে বারিত হয় না। শত শত বৎসর পরেও অন্যায় মতে বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে। আপীলের চূড়ান্ত সীমা সত্য নির্ধারণ পর্যন্ত গিয়া তবে থামে। যদি মার্জনা করেন তবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দুটি দৃষ্টান্ত দিতে

চাই। আমি এখন মীর জুমলার আসাম ও কুচবিহার জয়ের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত আছি। এজন্য একপক্ষে মুঘল সংবাদ দাতার ফার্সী গ্রন্থ ও বাদশাহী ফার্সী ইতিহাস, অপর পক্ষে আসামীদের লিখিত বুরঞ্জী এবং একজন ডাচ জাহাজী সৈন্যের কাহিনী ব্যবহার করিতে হইতেছে। সেইমত, শিবাজীর ও শম্ভাজীর কার্যকলাপের জন্য মুঘল বাদশাহদিগের পক্ষে লিখিত ফার্সী ইতিহাস, দুইজন সমসাময়িক নিরপেক্ষ হিন্দুর লিখিত ফার্সী ইতিহাস, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের জন্য লিখিত ফার্সী ইতিহাস, মারাঠী ভাষায় লিখিত বখর ও পত্রাদি এবং ইউরোপীয় বণিকদের সাক্ষ্য—এই পাঁচ প্রকার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

ঘটনার সত্যনির্ধারণ করিয়াই ঐতিহাসিকের কার্য শেষ হইল না। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ, তাহার গায়ের চামড়াটি, চক্ষের সম্মুখে সহজে আনা যায়। কিন্তু তাহার হৃদয়টি দেখাইতে না পারিলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজা, রাজ্য পরিবর্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য, কিন্তু পদে পদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিতে হয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ লেখক ক্ষণজন্মা পুরুষ। আমাদের পরিষদ বা সম্মিলন তাহাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং সুধী মণ্ডলীর চেষ্টায় এ মহাকার্যের যতদূর সাহায্য হইতে পারে, কেবল তাহার বিষয়েই আমি বলিব।

(১) প্রত্যেক বিভাগের প্রধান প্রধান বিষয় ও শাখায় যে কয়খানি বই হইতে নূতনতম ও সর্বাধিক মূল্যবান জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে তাহার তালিকা প্রকাশ। সেই বিষয়ে দেশী বিদেশী পণ্ডিত মণ্ডলী এ পর্যন্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার ঠিক বিবরণ এই সব হইতেই আমরা পাইব। পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সিঁড়ির ওপর না দাঁড়াইলে আমরা বিদ্যাবৃক্ষের উচ্চতর শাখায় চড়িতে পারিব না।

(২) পরিষদ ও অন্য সুধীমণ্ডলী অথবা মহানুভব জমিদারগণ এই সব সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, প্রাচীন মুদ্রার সচিত্র তালিকা, লণ্ডন ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিদ্বয়ের গত ৩০ বৎসরের পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী ও এপ্রি-গ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, সার্বেয়ার জেনারেলের অফিস হইতে প্রকাশিত ১ ইঞ্চি=

৪ মাইল স্কেলের ভারতবর্ষের ম্যাপ, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। সে গুলির মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া এক এক বাক্স গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে সমস্ত শাখা পরিষদ ও মফঃস্বলের বিশ্বাসযোগ্য পুস্তকালয় ঘুরিয়া আসিবে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসা-বিভাগে এইরূপে ভ্রাম্যমান পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া মফঃস্বলের ছোট ছোট শহরের ডাক্তারদের জ্ঞানের বিস্তার ও নবীনতার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

(৩) মূল পরিষদের এক বিভাগ খুলিতে হইবে যাহার নিকট আবেদন করিলে জিজ্ঞাসু নিজের চর্চার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রচিত প্রমাণপঞ্জী পাইবেন। পরিষদ বাছিয়া উপযুক্ত শাখার বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, তিনি তাহার উত্তর দিবেন। এই সব বিশেষজ্ঞের নাম ও ঠিকানা পরিষদ পত্রিকায় সর্বদা ছাপা এবং তাহারা জিজ্ঞাসুদের নিকট যে সব সমালোচনা পূর্ণ প্রমান পঞ্জী (critical bibliography) পাঠাইবেন তাহাও প্রকাশিত হইবে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মডার্ণ রিভিউএ শিখ ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ একটি তালিকা প্রকাশিত হয়।

আমাদের সম্মিলন বঙ্গভাষাভাষীদিগের। সুতরাং ঐতিহাসিক চর্চার অত্যাবশ্যক গ্রন্থগুলি বাঙ্গলা আকারে সাধারণের হাতে দিতে না পারিলে আমাদের কর্তব্যে ত্রুটি হইবে। এই দেখুন প্রতি বৎসর শত শত বঙ্গভাষী সংস্কৃত পরীক্ষা দেয়, তাহারা ইংরাজী জানে না, এবং অসংখ্য বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি খুঁজিয়া পড়িবার অবসর এবং সুযোগও তাহাদের নাই। সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে সব নব নব সত্য ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই সব ছাত্রদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহারা প্রত্নতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সম্বন্ধে এখনও মধ্যযুগে বাস করিতেছে। মানবজ্ঞান যে এত দিনে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার কিছুই জানে না। অথচ তাহাদের মধ্যে অনেক মেধাবী ও মৌলিকতাসম্পন্ন ছাত্র আছে। দেশ সম্বন্ধে তাহাদের পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে নিজ ধর্ম জাতি সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হইতে শুধু ত্রিভাষী নয় বলিয়া ইহারা যে চির বঞ্চিত হইয়া থাকিতেছে, ইহা কি পরিতাপের কথা নয়? প্রাচীন লেখমালার উদাহরণ হিন্দীতে গ্রন্থাকারে একত্র ছাপা হইয়াছে;

বাঙ্গলায় হয় নাই। নব প্রকাশিত 'গৌড় লেখমালা' আংশিক গ্রন্থ। ভিন সেণ্ট রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ম্যাকডনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস যে এ পর্যন্ত বাঙ্গালায় অনুবাদ করা হয় নাই ইহা আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে লজ্জার বিষয়। গুজরাতি বাঙ্গলার চেয়ে কত কম লোক বলে অথচ অনুবাদে গুজরাত বাংলাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আর আমরা বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার গর্ব করিয়া অলস হইয়া বসিয়া আছি। লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই। অথচ এই লোকশিক্ষার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে ক্রমে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে সাধরণের জ্ঞানের সীমা বঙ্গের লোকসমষ্টির জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করিবে। তখন বাঙ্গালীর মানসিক প্রাধান্য কোথায় থাকিবে? পুনা ও বরদা ভ্রমণ করিয়া তথাকার স্কুলগুলি দেখিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে আর বিশ বৎসরের মধ্যে মারঠাগণ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে বাঙ্গালী দিগকে পিছু ফেলিয়া যাইবে।

ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান। যে পরিমাণে অতীত জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিব, যে পরিমানে অতীতের উপদেশগুলি বর্তমানে লাগাইতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণমন উচিত পথে ধাবিত হইবে, আমাদের সমবেত শক্তি ফলপ্রসব করিবে। আর যে পরিমাণে আমরা অসত্য বা অর্ধসত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব, সেই পরিমাণেই আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বাধা পড়িবে। জন সমষ্টির শ্রম বিফল হইবে।

ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্ত বিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। অধ্যাপক সীলী সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন রাষ্ট্রনেতা সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথ প্রদর্শক, মহাবন্ধু। ইতিহাসের সাহায্যে অতীতকালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্তমানে প্রয়োগ করিতে হইবে দূরবর্তী যুগে বা দেশে মানব ভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পড়িলেন, রাজ্য সমাজ ধর্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙ্গিল সেই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা

আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাস চর্চার চরম লাভ।

মহাকবিদের সম্বন্ধে সত্যই বলা হইয়াছে যে তাঁহারা অমরধামে গমন করিবার পরও পৃথিবীতে নিজ নিজ আত্মা রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা হইতে আমরা শিখি,—

ব্যক্তিগত গৌরব কি? লজ্জার বিষয় কি?
লোকে কিসে বল লাভ করে, কিসে পুণ্য হয়? (কীটস)

সেইরূপ আমরা বলিতে পারি যে প্রকৃত ঐতিহাসিক জনসঙ্ঘকে ব্যক্তি সমষ্টিকে শিখান—কিসে জাতীয় উত্থান পতন, রোগ স্বাস্থ্য, নব জীবন লাভ ও মৃত্যু ঘটে। এই মহাশিবতন্ত্র এই জাতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র সাধনা বিনা, সত্যনিষ্ঠা বিনা, ক্রমোন্নতির অদম্য স্পৃহা বিনা লাভ করা সম্ভব নহে।

[প্রবাসী (বৈশাখ, ১৩২২) হইতে পুনর্মুদ্রিত]

আচার্য যদুনাথ সরকার

শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

আচার্য যদুনাথ সরকার ভারতে ইতিহাস গবেষণার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, উনিশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করে বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মনে প্রাণে ভারতীয় ছিলেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে মৌলিক গবেষণায় তিনি রত ছিলেন। তিনি কাঁচি ও আঠার সাহায্যে গবেষণায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁর গবেষণা পদ্ধতি ছিল প্রতিটি সম্ভাব্য সূত্রের অনুসন্ধান করা এবং নিজে তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তাঁর এই ইতিহাস শিক্ষার প্রেরণা ছিলেন পিতা শ্রীরাজকুমার সরকার ও সেই সময়ের বাঙলার ইতিহাস চর্চার আয়োজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যদুনাথ অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি প্রথমে রিপন ও পরে বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হন। অধ্যাপনার সঙ্গে তাঁর গবেষণার কাজও চলতে থাকে। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তি পাওয়া গ্রন্থটি ১৯০১ সালে 'ইণ্ডিয়া অব আওরঙ্গজেব' নামে প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য তার প্রথম প্রণয়। ইতিহাস হল দ্বিতীয় পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি পক্ষপাত থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই বাকি জীবন ইতিহাস নিয়েই কাটিয়েছেন। সেই ইতিহাস কি ধরণের? শুধু মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ইতিহাস নয়, যদিও এতেই ছিল তাঁর স্বাধীকার। তিনি বাবর থেকে শেষ মুঘলদের ইতিহাস লিখতে বসে সেই সময়ের সমাজ ও আর্থিক অবস্থার কথা বাদ দেন নি। মুঘলদের রাজ্যশাসনপদ্ধতি যেমন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—তেমনি সেকালের অনেক লুপ্ত ব্যক্তিগত কাহিনী ও সমাজ চিত্র তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে।

এই সব ইতিহাস রচনায় যদি আমরা একটি ধারাবাহিক স্রোতকে লক্ষ্য করি তা হলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে যদুনাথ ছিলেন সেই

ধারার একটি বেগবান অংশ, যে অংশ ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তাকে করে তুলেছে আরও বেগবান ও প্রাণচঞ্চল। সেই ধারা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার ও প্রথমশ্রেণীর গবেষণার ক্ষেত্রকে সরস ও উর্বরা করে তুলেছে। যদুনাথ সেই উর্বরক্ষেত্রে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে চাষ করে ঘরে তুলেছেন সোনার ফসল। সেই ধারাটি একটু পর্যালোচনা করা যাক।

উনিশ শতকের সুরুতেই বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যলেখক রামরাম বসু তখনকার নড়বড়ে ভাষায় লেখেন "প্রতাপাদিত্য চরিত" এবং প্রায় একই সময়ে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লেখেন "কৃষ্ণচরিত" এবং পরে বিদ্যাসাগরের "বাঙ্গালার ইতিহাস" ও বন্ধু অক্ষয় কুমার দত্তের "প্রাচীন হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা"। এই ছিল আমাদের ইতিহাস সাহিত্যের গোড়ার বনিয়াদ। (ইতিহাস সাধক যদুনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত) এরপর রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেখেন "উড়িষ্যার ইতিহাস"; "পুরাভারতে গোনাংস" প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থ। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করেন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি এরপরে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে রমেশচন্দ্র দত্ত ও বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজনীতির ব্যাখ্যা সুরু করেন, যা সারা দেশকে প্রেরণা দিয়েছে জাগ্রত করেছে নূতন ইতিহাসবোধকে। রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখে ইতিহাসকে সেকাল থেকে একালে টেনে আনেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে দেশে অজস্রধারায় কাব্য, নাটক, উপন্যাস যেমন এসেছিল তেমনি এসেছিল ইতিহাসও। বাংলার ইতিহাস তখনও প্রায় অনাবিষ্কৃত, তাই শিখ, মারাঠা, জাঠ ও রাজপুত বীরত্ব কাহিনী দিয়েই দেশাত্মবোধক সাহিত্য লেখা হতো। এই সময় একই সঙ্গে বাংলার ইতিহাস সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়াছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, নিখিলনাথ রায় দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি। যদুনাথ সরকার এই বরেণ্য গোষ্ঠীরই একজন। বিশ শতকের প্রথম দশকেই তিনি ইতিহাসচর্চা সুরু করেন আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই ইতিহাসই ছিল তাঁর সাধনার ঈপ্সিত বস্তু।

এবার তাঁর সাহিত্যকৃতির একটু পরিচয় নেওয়া যাক। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য আউরঙ্গজেবকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। এরপর শুরু হলো মারাঠা ও মোগলদের পারিবারিক ইতিহাস রচনা। দীর্ঘ পাঁচ ভল্যুমে আউরঙ্গজেব, চার ভল্যুমে মোগল সাম্রাজ্যের পতন, শিবাজী ও মোগল শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি। মুঘলদের যুগ আরম্ভ হয়েছিল মধ্যযুগের শেষে যা বর্তমান ছিল আধুনিক যুগে ইংরেজদের আগমনের সময় পর্যন্ত। এই যুগ তাঁকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। এতে তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে একের পর এক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন যা কেবল তদানীন্তন বৃটিশ ঐতিহাসিকদের ভুল প্রতিপন্ন করেছে তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্থির হয়েছে যে আজ পর্যন্ত এইগুলিই প্রামাণ্য বই। তাই আজ কোন গবেষককে যদি মারাঠা ও মুঘলদের উপর কোন গবেষণা করতে হয় যদুনাথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই একনিষ্ঠ সাধক তার পঞ্চাশ বছরের সাধনালব্ধ ধন দিয়ে গেছেন জাতিকে যা শুধু তাদের গর্বের বস্তু নয় সম্পদও।

আগেই বলেছি যদুনাথ গবেষণা করতেন কোন মুখে শোনা কাহিনী, কিংবদন্তী, বা বিদেশীর লেখা এ দেশীয় ইতিহাস থেকে নয় তাই তিনি মারাঠা ইতিহাস লেখার জন্য শিখেছিলেন মারাঠী, পর্তুগীজ ভিংগল ভাষা (রাজপুত) এবং মুঘলদের ইতিহাস রচনার জন্য শিখেছিলেন ফারসী, আরবী, প্রভৃতি বিদেশীভাষা যা জানা না থাকলে মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এবং পক্ষপাতহীন ইতিহাস রচনাও অসম্ভব, অবাস্তব। তাঁর গবেষণার পেছনে ছিল সাধনা, সেই সাধনা থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারেনি। বৃদ্ধ বয়স, রোগ, শোক (পুত্রদের মৃত্যু) স্থানের দূরত্ব, ভাষার বাধা কোনটাই নয় এক্ষেত্রে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিরূপ কঠিন একাগ্রতা ও বাস্তব নিষ্ঠা থাকলে মানুষ তার মৌলিক রচনার কাজ করতে পারেন যদুনাথ তাঁর উদাহরণ।

যদুনাথ তথ্য সংগ্রহের জন্য কিরূপ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। মালবের ব্রাহ্মণেরা ভীষণ গোঁড়া। তাঁরা পুরানো দলিল দস্তাবেজকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজ অপরকে দেখতে দেওয়ার চেয়ে অনাচার আর কি হতে পারে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ এইগুলি কোন

এক মারাঠা নেতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সিন্দুকের মধ্যে চাপা পড়ে আছে বেশ কয়েক বছর। একের পর এক গবেষক যান আর ফিরে আসেন কারণ মারাঠারা প্রাণ দেবে তবু বংশের পুরানো দলিল দস্তাবেজ অপরকে দেখাবেনা যদুনাথ সব শুনেও হাল ছাড়লেন না। একদিন সকালে দেখা গেল এক মারাঠী ব্রাহ্মণ ফোঁটা তিলক কেটে এই বাড়ির দরজায় হাজির। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই মারাঠী ব্রাহ্মণকে ডেকে নিয়ে গেলেন বাড়ীতে। সুরু হলো মারাঠী ভাষায় আলাপ আলোচনা, এই আলাপ আলোচনা হৃদ্যতায় রূপান্তরিত হলো—খুলে গেল সিন্দুকের চাবি। বেরিয়ে এলো দলিল দস্তাবেজ। সমস্ত দলিলের প্রতিলিপি নিয়ে ফিরে এলেন প্রশান্ত হৃদয়ে মারাঠী ব্রাহ্মণ নয় বঙ্গসন্তান যদুনাথ।

এ ত গেল একদিক। আর একবার খবর পেলেন রামগড়ের নবাব ভীষণ গোঁড়া। মারাঠী ব্রাহ্মণের চেয়ে কোন অংশেই কম নন। যদুনাথ বিলেতে সহপাঠী বন্ধুকে চিঠি লিখলেন এ ব্যাপারে। বন্ধু ভারতের গবর্নর জেনারেলকে লিখলেন, তিনি লিখলেন কমিশনারকে। কমিশনার নবাবকে। নবাব সমস্ত দলিল দস্তাবেজ সুদৃশ্য বাঁধাইয়ে আবদ্ধ করে পাঠালেন কমিশনারকে। হাত ফিরি হয়ে সেই সব তথ্য বিলেত ঘুরে এলো যদুনাথের হাতে। তথ্যসংগ্রহের জন্য পেয়েছেন বহু মানসিক যাতনা। তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে যেকোন কঠিন কাজ করতে তিনি পরাঙ্মুখ হতেন না, কারণ গবেষকের প্রয়োজন আসল উপাদান যার দ্বারাই কেবল সম্ভব মৌলিক রচনা। এই ইতিহাস সাধনাই আমাদের চোখের সামনে খুলে দিয়েছে মারাঠা ও মুঘল ইতিহাসের গবেষণার দ্বার। শুধু তাই নয় যে সমস্ত তথ্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি সেই সম্বন্ধে আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্য যখন চিন্তিত সেই সময় মনিকাঞ্চণ যোগ ঘটল। যদুনাথের সঙ্গে পরিচয় হল মারাঠা ঐতিহাসিক সারদেশাই-এর। সারদেশাই তাঁর মারাঠা রাজ্যের ইতিহাস লেখার জন্য ফারসী তথ্য জানবার জন্য উৎসুক। আর যদুনাথ চাইছিলেন মারাঠা ভাষায় নতুন তথ্যানুসন্ধান। এই সময় যদুনাথ ও সারদেশাইয়ের মিলন ইতিহাসের নতুন দিগন্ত খুলে দিল। দুই নদী মোহনায় এসে সাগরে মিলিত হলো। যার ফল সারদেশাইয়ের মৌলিক তথ্যনির্ভর 'হিষ্ট্রি অব দি মারাঠা' তিন খণ্ডে এবং যদুনাথের একের পর এক মুঘল ও মারাঠা ইতিহাস।

এবার দেখা যাক যদুনাথের মৌলিক গবেষণার ধারাটিকে। যেখানেই খবর পেতেন সেখানেই যেতেন তিনি মূলতথ্য সংগ্রহের জন্য। যদিও তিনি বিলাত যাননি কিন্তু তিনি সমস্ত প্রামাণ্য তথ্যই আনিয়েছেন নিজের লাইব্রেরীতে। বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস, বোডলিয়ান লাইব্রেরী, প্যারিস লিসবন ও বার্লিন থেকেও তিনি প্রচুর তথ্য আনিয়েছেন। ভারতবর্ষে এই তথ্য সংগ্রহের জন্য গেছেন বোম্বাই, দিল্লী, রামপুর, লাহোর, হায়দ্রাবাদ, পাটনা, পুণা প্রভৃতি জায়গায়।

জার্মান বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনার জনক Ranke যেমন তথ্য সংগ্রহের জন্য সমগ্র ইউরোপ চুঁড়েছিলেন সেইরূপ যদুনাথও ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পূর্ণ স্থানগুলি খুঁটিয়ে দেখেছেন তথ্যের প্রাথমিক সূত্র খুঁজেছেন। তাই ভৌগলিক অবস্থান, জায়গার বর্ণনা তাঁর পুস্তকে এত জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এইখানেই ইতিহাসবিদের সর্বাধিক কৃতিত্ব. (জে এন সরকার—যদুনাথ ও ঐতিহাসিক রচনাবলী)।

যদুনাথের সাহিত্যকৃতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—মোগলদের সম্বন্ধে রচনা, মারাঠাদের সম্বন্ধে রচনা ও অন্যান্য রচনা। খুব অল্প থেকে সুরু করে তিনি বহুদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন কেবলমাত্র নিজের তপস্যা দ্বারা। সম্ভবত তিনি মুঘল যুগকে বেছে নিয়েছিলেন তখন পর্যন্তও প্রচুর তথ্য ব্যবহৃত হয়নি বলে। কারণ এগুলি লেখা ছিল আরবী ও ফারসীতে। তিনি মুঘলযুগের এই সমস্ত মৌলিক তথ্যের কুমারীত্ব ঘুচিয়ে ব্যবহার করলেন নিজের গবেষণায় যার ফলশ্রুতি 'ইণ্ডিয়া অব আউরঙ্গজেব'। এই পুস্তক রচনা তাঁকে খ্যাতির তুঙ্গে নিয়ে গেল। ঐতিহাসিক বেভেরিজ তাঁর এই পুস্তক সম্বন্ধে বলেছেন "যদুনাথকে ভারতের প্রাইমাস আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর ভারত ইতিহাস রচনার জন্য পারস্যভাষায় মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁকে সম্ভবত বাংলার 'গীবন' বলা উচিত"। (আনন্দবাজার পত্রিকা—২০ মে, ১৯৫৮)।

পাঁচ খণ্ডে আউরঙ্গজেবের ইতিহাস (১৯১২-২৪) প্রকাশে বিদ্বজ্জন ও গবেষক মহলে সাড়া পড়ে গেল। সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা, নিরপেক্ষতা বিচার করা ও তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক লেখা হিসাবে এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ লেখা বলে পরিচিত হলো। ভি, এ স্মিথ যদুনাথের ইতিহাস রচনাকে

'honest history'র প্রচেষ্টা বলেছেন। যথার্থ ইতিহাস লেখার আবার অনেক বিপদ। তৃতীয় খণ্ড মুসলমান এবং হিন্দুদের মনঃক্ষুন্ন করেছিল।

এরপর আরভিন এর লেখা 'শেষ মুঘলগণ' (১৭০৭-৩৯) দুইখণ্ডে সমাপ্ত করেন। তিনি আরভিনের লেখাকে আরও পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করেন তাঁর নিজের মারাঠা জ্ঞানের দ্বারা। এই পুস্তক শুধু যে মুঘলদের রাজনৈতিক ইতিহাস তাই নয় এ যেন মারাঠা, শিখ, রাজপুত, বুন্দেলদেরও ইতিহাস। "ভারতে নাদির শাহ" পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার বক্তৃতা মালার অন্তর্গত।

এর পরের বই ৪ খণ্ডে চৌষট্টি বৎসরের ইতিহাস 'মুঘল সাম্রাজ্যের পতন' (১৭৩৯—১৮০৩) যা মধ্যযুগ থেকে বর্তমানযুগে উত্তরণের গোধূলি। ইহা দুই সাম্রাজ্যের পতন ও তৃতীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস। অন্যান্য যে কোন রচনার তুলনায় এই রচনা অনেক বেশী মূল্যবান তার কারণ কেবলমাত্র যে রচনায় সময় লেগেছিল (১৯৩২-৫০) তাই নয়, এরমূলা এই রচনায় তিনি মুঘল, মারাঠা, জাঠ, রোহিলা, শিখ, আফগান ইংরেজ এবং ফরাসীদেরও জীবনচিত্র চিত্রিত করেছেন অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে। ১৫০ বছরের ইতিহাস লিখতে তিনি সময় নিয়েছেন মাত্র ৫০ বছর।

কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাই নয় মুঘল শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সজাগ ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর 'মুঘলশাসন ব্যবস্থা' (১৯২১) এই রচনায় তিনি দরবারের দৈনন্দিন লিপি ব্যবহার করেছেন। এই পুস্তকে তিনি তাঁর বলিষ্ঠ স্বভাবের যথেষ্ট পরিচয় রেখেছেন। এই ব্যাপারে এই পুস্তক পথিকৃৎ এবং গবেষণার জন্য অবশ্য পাঠ্য।

তিনি মুঘলদের পর প্রায় একই সময়ে মারাঠা ইতিহাস নিয়েও গবেষণা করেন। মারাঠা এবং মুঘল ইতিহাস যে এপিঠ ও পিঠ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি নিজেই বলেছেন, "মহারাষ্ট্র আমার দ্বিতীয় গৃহ। ৪০ বার সেখানে গেছি। প্রত্যেকটি দুর্গ ও রাজধানী পরিদর্শন করেছি। সেগুলি বাস অথবা রেলপথ থেকে অনেক দূর। প্রত্যেক জায়গায় বন্ধুত্ব করেছি। মারাঠা ইতিহাসের গবেষণা আমার দ্বিতীয় পাঠ। যদি দ্বিতীয় হয় আমার মুঘল ইতিহাস প্রথম অনুরাগ" (যদুনাথ সরকার—'হাউস অব শিবাজী')। মারাঠা

গবেষণার সময় ১৯০৯ সালে বরোদার গাইকোয়াড়ের পৃষ্ঠপোষকতায় যে মারাঠা লাইব্রেরী কনফারেন্স হয়েছিল তাতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও আর জি ভাণ্ডারকরের সঙ্গে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। মারাঠা ইতিহাস জগতে তাঁর এই যথেচ্ছ ভ্রমণের প্রথম ফলশ্রুতি দেখা যায় তাঁর প্রথম রচনা 'শিবাজী ও তার কাল' (১৯১৯)। শিবাজী সম্বন্ধে তাঁর গবেষনা আটটি বিভিন্ন ভাষায় প্রাপ্ত তথ্যের সংমিশ্রণের ফল। এই আটটি ভাষা হলো সংস্কৃত, মারাঠী, পারসীক, রাজস্থানী, ইংরাজী, পর্তুগীজ ডাচ ও ফরাসী। প্রত্যেকটি ভাষার তথ্য সংগ্রহ করে তাকে সম্পূর্ণ হজম করে নিরপেক্ষ ভাবে রচনা শুধু কঠিনই নয়—সম্ভবত যদুনাথ ছাড়া আর কারো পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তাঁর অনন্য সাধারণ মেধাও মননের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। তিনি শিবাজী চরিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁকে হিন্দুধর্মের আশার আলো বলেছেন কিন্তু তিনি জাতীয় ইতিহাসকে অতিরঞ্জিত করেন নি। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে শিবাজীর পূর্বে মারাঠা জাতি বলে কিছুই ছিল না। যদুনাথের 'হাউস অব শিবাজী' (১৯৪০) কয়েকটি রচনার সমষ্টি। এই বইখানিতে তিনি তথ্য সংগ্রহের ও তাকে ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি দেখিয়েছেন।

১৯৩১ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার বক্তৃতা মালায় তিনি মুঘল রাজত্বের পতনের সময় বিহার ও উড়িষ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই দুই দেশের ইতিহাস আসলে মারাঠা ইতিহাস। সুতরাং মারাঠা ইতিহাসের উত্থান পতন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর রচনার মাধ্যমে।

তিনি কেবলমাত্র পুস্তক রচনাতেই পারদর্শিতা দেখান নাই সামান্য প্রবন্ধ রচনাতেও ছিলেন সমান পটু। যদুনাথের 'এনেকডোটস অব আউরঙ্গজেব', (১৯১৩) এবং 'ষ্টাডিজ ইন মুঘল ইণ্ডিয়া' এই শ্রেণীর রচনা। এজাতীয় রচনায় আওরঙ্গজেবের রাজত্বের যে সুন্দর ও সাবলীল বর্ণনা আছে তা খুবই চিত্তাকর্ষক।

তিনি এই সময় কতকগুলি পুস্তকও অনুবাদ করেন। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য— (১) 'মাসির-ই আলমগীরি' শকি মুস্তাহিদ খাঁয়ের মূল রচনার ইংরাজী অনুবাদ। (২) 'বেঙ্গল নবাবস' (স্যার উইলিয়াম

জেমস এর দ্বিশতবার্ষিকী সংখ্যা), ৩) 'দিল্লী ক্রনিকল', (৪ 'এ নিউ হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল'—তিনি এর মুখ্য সম্পাদক ছিলেন। (৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলার ইতিহাস সংকলন করেন যার দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনার ভার ছিল আচার্য যদুনাথের (৬) এছাড়া তিনি মুখ্য সম্পাদক ছিলেন কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ার। এই পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডের ৪টি অধ্যায় তিনি রচনা করেন।

তাঁর রচনায় ধর্ম বাদ পড়েনি। তাঁর লেখা প্রথম ধর্ম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ হল 'চৈতন্য—তাঁর তীর্থস্থান ও শিক্ষা'—(১৯১৩] এবং পরে 'চৈতন্যের জীবনী ও বাণী' (১৯২১)। তাঁর এই বই পড়ে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ লেখেন "a work of surpassing value, full of human interest from beginning to end" এর পর তিনি জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের দশনামী নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উপর পুস্তক রচনা করেন।

অর্থনীতিতেও যদুনাথ সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর 'ইকনমিকস্ অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' (১৯০৯) স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় লেখা। যদিও তিনি খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশের বিরোধিতা করেন নি. তবুও তিনি ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক শাসন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। স্যার থিওডর মরিশন লণ্ডনের ইকনমিকস জার্ণালে এই পুস্তকের সমালোচনা করে বলেন "লেখকের সৎসাহস ও স্বাধীনতা আছে.....তথ্যের গভীর অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানে ভারত-বাসীকে অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দেন।"(জে. এন. সরকার)

তাঁর গবেষণার শেষ রচনা (যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়) "মিলিটারী হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া" ১৯৬০)। এই পুস্তকে তিনি নিজেকে সামরিক বিজ্ঞানের ছাত্র মনে করে লিখেছেন এবং ছাত্রদের কি করা কর্তব্য এবং কি করা ঠিক নয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। যদুনাথ এই পুস্তকে পুরাকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যুদ্ধ বিদ্যার উন্নতির ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কালের নিষ্ঠুর অঙ্গুলি নির্দেশ স্তব্ধ করে দিয়েছে তার এই রচনা।

যদুনাথ সরকার ইংরাজী সাহিত্যের স্নাতক। আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক তাঁর সমস্ত রচনাই ইংরাজীতে, কিন্তু তা নয়, বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যদুনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও গবেষণা। তাঁর সাহিত্য প্রবন্ধগুলি

বহুল প্রচলিত ও আলোচিত নয়। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'দুই রকম কবি হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' (প্রবাসী ভাদ্র, ১৩১৪), 'বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য' (প্রবাসী মাঘ, ১৩১৭), 'রজনীকান্ত সেন' (জন্মভূমি অগ্রহায়ণ, ১৩১৮), 'বঙ্কিম প্রতিভা' (শনিবারের চিঠি আষাঢ়, ১৩৪৫), 'যুগধর্ম ও সাহিত্য' (অলকা, আশ্বিন, ১৩৪৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী কবিতার অস্পষ্টতা নিয়ে সেই সময় বিদগ্ধ সমাজে তীব্র আলোচনার সময় যদুনাথ কবি পক্ষকে সমর্থন করে (প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৩) "সোনারতরীর ব্যাখ্যা" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বহুগল্প ও প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ করে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ "অচলায়তন" নাটকখানি যদুনাথের নামে উৎসর্গ করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল সস্তা দামে বিশ্বের বিবিধ জ্ঞান সহজ বাংলায় প্রকাশ করা। তিনি যদুনাথের কাছে এ প্রস্তাব করলে এই প্রস্তাব সমর্থন করে যদুনাথ প্রবাসী পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন (শ্রাবণ, ১৩২৪)। শুধু তাই নয় বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের ভূমিকাও যদুনাথ লিখে দেন

আচার্য যদুনাথ ১৯২৬ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই বছরই সি আই ই ও ১৯২৯ সালে নাইট উপাধি লাভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি গ্রেট বৃটেনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর মাননীয় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দীর্ঘদিন সেবা করেছেন। তিনি ১৩৪২, ১৩৪৩ ও ১৩৪৭-৫১, ১৩৫৫ সালে পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৪৪ সালে পাটনা তাঁকে ডি লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৪৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর ৭৮ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালে তিনি বলেন "কিন্তু আজ যে বিশ্বময় বিজ্ঞানের রাজত্ব। আজ যে সব দেশেই মানবজীবনের সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রণালী ও মন্ত্রতন্ত্র একাধিপত্য করছে, এ রাজত্ব শুধু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা বা যন্ত্রপাতির

কারখানায় নয়; সাহিত্যের সব বিভাগেই প্রকাশ্যেই হোক বা তলে তলে হোক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হয়েছে।

"প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল কি করে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রণালী আনা যায়? এই কাজের জন্য চাই, ন্যায়ের, তর্কের জন্য আবশ্যক তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার মস্তিষ্ক নয় যা শুধু শুষ্ক খড় কাটতে পারে, ভাবে উন্মত্ত বা ভক্তিরসে অশ্রুসিক্ত শুষ্ক মস্তিষ্ক যা মাটীতে গড়াগড়ি দেয়—তা নয়। এখন চাই ধীর, স্থির সংলগ্ন চিন্তাশক্তি, অসীম শ্রমশীলতা, পরীক্ষা না করে কোন কথা গ্রহণ করব না এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সমস্ত অর্থাৎ এক কথায় যাকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বলে। আমাদের সাহিত্য পরিষদ বর্তমানে এই কাজ আরম্ভ করেছে এবং তার এই প্রচেষ্টায় উপদেশ ও সাহায্য দিতে পেরে আমি চরিতার্থ হয়েছি।

উনিশ শতকের বাঙলায় যে নব জাগরণ দেখা দিয়েছিল প্রিন্সেপ, কোলব্রুক, জোনস্ প্রমুখ অগ্রণীদের চেষ্টায় ইতিহাস চর্চার যে বিশিষ্ট ধারা এদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল—এবং যে সূত্রধরে অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র জ্ঞান সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই নবজাগরণের শেষপর্ব বোধহয় ১৯০০ থেকে ১৯০৪ সন পর্যন্ত কার্য করেছিল। সেই শেষ পর্বের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন আচার্য যদুনাথ। সত্য ও জীবন্ত এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণই ছিল তাঁর ধ্যান ও ধারণা (বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—আচার্য যদুনাথ স্মরণে)। উনিশ ও বিশ শতকের এই বলিষ্ঠ মহান দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিককে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

বিস্মৃত স্বদেশপ্রেমিক ও সাংবাদিক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নিমাই সাধন বসু

স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় উৎসাহ ও উদ্যোগের কোন অভাব ঘটে নি। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আঞ্চলিক ভিত্তিতেও জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী রচনার প্রয়াস চলেছে। সামগ্রিক আন্দোলন ভিত্তিক ইতিহাস ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যক্তিগত পরিচিতিও (Who's Who) কিছু প্রকাশিত হয়েছে ও নতুন নতুন এই জাতীয় সঙ্কলনের কাজ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠ গবেষণা সত্ত্বেও এমন অনেক ব্যক্তির নাম আমরা বিস্মৃত ও বিশ্রুত হয়ে আছি যাঁরা জাতীয় আন্দোলনে ও দেশ গঠনের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের অবদানের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি যদি না হয় তাহলে নৈতিক অপরাধী হয়ে থাকা ছাড়াও ইতিহাস রচনা ও সাধনায় অমার্জনীয় ত্রুটি থেকে যাবে। এই রকম একজন বিস্মৃত পুরুষ হলেন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর ধারে এক সাধারণ বাঙালী পরিবারে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ কালীপ্রসন্নের জন্ম। পিতা হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ সময় 5th Bengal Cavalryর রেসালার সঙ্গে জলপাইগুড়িতে বাস করছিলেন। মাতা দক্ষিণাকালী দেবী ছিলেন সাহসী ও বুদ্ধিমতী নারী। জলপাইগুড়ি তখন ছিল অরণ্যময় বিপদসঙ্কুল স্থান। মাচানের উপর তাঁবু খাটিয়ে বা চালা তৈরী করে বাস করতে হত। দক্ষিণাকালী দেবী নির্ভয়ে স্বামীর সঙ্গে এই ভয়াবহ দুর্গম অঞ্চলে বাস করতেন। কালীপ্রসন্নের মাতৃকুল শাক্ত মতাবলম্বী ও পিতৃকুল ছিলেন বৈষ্ণব। অমিত শক্তি ও সাহসের অধিকারী পিতা হরিমোহন ছিলেন চন্দননগরের রাজা রামজীবনের বংশধর। তিনি ফারসী, উর্দু, ইংরাজি ও ফরাসি ভাষা জানতেন। কালীপ্রসন্নের পিতৃব্য

লালমোহন চট্টোপাধ্যায় পাঞ্জাবের অমৃতসরে কাজ করতেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শিশুপুত্র কালীপ্রসন্ন ও অন্য সন্তানদের নিয়ে দক্ষিণাকালী দেবী অমৃতসরে চলে যান। কয়েক বছর পরে ভবঘুরে পল্টনের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে হরিমোহন লাহোরে অন্য কাজ নেন এবং তাঁর পরিবারের সকলকে লাহোরে নিয়ে আসেন। লাহোরে হরিমোহনের ভগ্নীপতি গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বসবাস করতেন। তিনি সপরিবার হরিমোহনকে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান।

পল্টনের সঙ্গে দীর্ঘকাল থাকা এবং নানান্ স্থানে ঘোরার ফলে কালী-প্রসন্নের পিতা ও মাতা উভয়েই অত্যন্ত নির্ভীক, কঠোর জীবনে অভ্যস্ত এবং সঙ্কোচশূন্য উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কালীপ্রসন্ন পিতা মাতার চারিত্রিক গুণের অধিকারী হন। অন্য দিকে প্রায় জন্মকাল থেকেই পাঞ্জাবের মাটি, জলবায়ু ও পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ায় কালীপ্রসন্ন পাঞ্জাব প্রদেশকে আপন মাতৃভূমির মতই গ্রহণ করেছিলেন। পাঞ্জাবের মানুষকে তিনি আপন জন বলে মনে করতেন ও তাদের সুখ দুঃখের সমভাগী ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তিনি পাঞ্জাবীদের মত বেশভূষা ও পাগড়ি পরেন এবং দাড়ি ও গোঁফ রাখেন। এ ছাড়া মাতৃভাষার মত পাঞ্জাবী বলতে পারার জন্য তাঁকে পুরো-পুরি পাঞ্জাবী বলেই ভ্রম হত।

শৈশবে কালীপ্রসন্ন মৌলবীর কাছে উর্দু ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং গৃহ শিক্ষকের নিকট বাংলা ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। লাহোরের মচ্ছিহাটার রঙমহল হাইস্কুলে কিছুকাল পড়াশোনার পর কালীপ্রসন্ন ফোরম্যান মিশন স্কুলে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি তাঁর মেধা ও ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিতার জন্য মার্কিন পাদ্রি ফোরম্যান সাহেবের বিশেষ প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনের পর কালীপ্রসন্ন লাহোর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তিন বৎসর পর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিক মাতৃবিয়োগের ফলে তাঁর পক্ষে পড়াশোনা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। পিতা হরিমোহন ঐ সময় জম্মুতে রাজা রাম সিংহের Military Secretary রূপে কর্মরত থাকায় নাবালক ভাই ও বোনেদের দেখাশোনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব তরুণ কালীপ্রসন্নকে গ্রহণ করতে হয়। এই কারণে তাঁর নিজের বিদ্যাচর্চার পাঠ সাঙ্গ হলেও তিনি স্বেচ্ছায় সকল পারিবারিক দায়িত্ব

পালন করতে থাকেন। কিন্তু নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের বিষয় ঘটলেও কালীপ্রসন্নের সারস্বত সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। লাহোরের পাবলিক লাইব্রেরি ও অন্যান্য স্থান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি ব্যাপক ও গভীর ভাবে পড়াশোনা করতে থাকেন। নানা বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর শানিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির জন্য তিনি সকলের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে একবার যা পড়তেন শুনতেন বা দেখতেন তা কখনও বিস্মৃত হতেন না। তিনি ছিলেন মজলিসী, কৌতুকপ্রিয় ও হাস্যরসিক। সঙ্গীত ও কাব্যে ছিল তাঁর গভীর আসক্তি। তিনি নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ, সুগায়ক এবং চিত্রকর ছিলেন। তাঁর ডায়েরির পাতায় পাতায় অঙ্কিত ছিল নানাস্থান ও বিষয়ের সুন্দর সুন্দর ছবি। প্রকৃতিকে তিনি ভালবাসতেন। গাছপালা ও পশুপক্ষীর প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমতা-বোধ। সাপ সম্বন্ধেও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং এই বিষয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন।

লাহোরের কালীবাড়ীর স্বামী কেশবানন্দ কালীপ্রসন্নের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করেন। তরুণ কালীপ্রসন্ন এই কাপালিক সন্ন্যাসীর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি এই সময় যোগ সাধনা, জপতপ ইত্যাদি করতে থাকেন এবং রুদ্রাক্ষের মালা পরেন। স্নেহময়ী মাতার আকস্মিক মৃত্যুতে বিচলিত কালীপ্রসন্ন অল্পকালের জন্য সাধুবেশে গৃহত্যাগ করে ভারতবর্ষের নানান স্থান ভ্রমণ করেন ও সমাজসেবা ও মানবকল্যাণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। কিছুকাল পর এক সাধুর বেশে তিনি অমৃতসরে আর্যসমাজ ভবনে পর পর দুদিন পাঞ্জাবী ভাষায় বক্তৃতা দেন। ইংরাজী জানা এই তরুণ সাধুর ভাষণ শ্রোতাদের চমৎকৃত করে ও এই সংবাদটি স্থানীয় পত্র পত্রিকায় পাঠ করে পিতা হরিমোহন অমৃতসরে এসে পুত্র কালীপ্রসন্নকে লাহোরের বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর কালীপ্রসন্ন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে অল্প কিছুদিন লাহোরের জগনাথ খান্নার পুত্রদের গৃহশিক্ষক রূপে কাজ করার পর তিনি লাহোরের দৈনিক পত্র Civil Military Gazette এ অনুবাদকের

কাজ নেন। এই সময় থেকেই তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয় এবং সেই সূত্রেই তিনি নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে লাহোর শিক্ষাসভা, ব্রাহ্ম সমাজ, হিন্দু সভা, হিতসাধন ব্রত সভা, "সংগত", লাহোর ইয়ং মেনস্ রিলিজিয়স য়্যাসোসিয়েশন (Lahore Youngmen's Religious Association), আর্য সমাজ প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে কালীপ্রসন্নের ধর্ম সম্বন্ধে উদার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ও তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন-কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা করতেন। ঐ সময় তিনি বিখ্যাত "ট্রিবিউন" পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যতম 'ট্রাস্টি" রেভারেণ্ড গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন ও গোলকনাথের অসাধারণ বাগ্মিতা এবং শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারবিষয়ক চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করে। ইতিমধ্যেই সুবক্তারূপে কালীপ্রসন্ন পরিচিত হয়েছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বাগ্মিতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই খ্যাতির মূলে কয়েকটি কারণ ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে জন্মসূত্রে বাঙালী হলেও কালীপ্রসন্ন পাঞ্জাবকে তাঁর মাতৃভূমিসম ভালবেসে ছিলেন। বেশভূষা, কথাবার্তা ও আচার আচরণে তিনি এ প্রদেশের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাঞ্জাবী ভাষায় তাঁর অত্যাশ্চর্য ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে "ট্রিবিউন" পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন :

"In may 1891, I left Sind to take up the editorship of the Tribune at Lahore...I had for my first assistant, Kali Prasanna Chatterjee, whose family have settled in the Punjab. Kali Prasanna was a member of the Arya Samaj and a Public Speaker whose services were in frequent demand. He spoke Punjabi not only with fluency but with remarkable eloquence, while his flashes of wit and stock of Punjabi proverbs kept his audience in hilarious good humour."[১]

কালীপ্রসন্নের সঙ্গে আর্যসমাজের যোগাযোগ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবীনচন্দ্র

রায় ও সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের উৎসাহ ও উদ্যোগে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী লাহোরে আর্যসমাজ স্থাপন করেন। লাহোরের সমাজে কালীপ্রসন্ন প্রথম ভাষণ দেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। পরে তাঁর বন্ধু মুন্সীরামের (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে খ্যাত) অনুরোধে তিনি জলন্ধরের আর্যসমাজে প্রতি শনিবার ভাষণ দিতেন। পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের আর্যসমাজের শাখাগুলির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। এই সূত্রে আর্য সমাজের বিশিষ্ট নেতা হন্‌সরাজের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ছাত্র হন্‌সরাজ লাহোরে D. A. V. College ও School এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কার্যে কালীপ্রসন্ন হন্‌সরাজের সহকর্মী ছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের কালীপ্রসন্ন D. A. V. কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের লালা সুন্দরদাস অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ইংরাজি সাহিত্য ছাড়া তিনি ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধেও শিক্ষাদান করতেন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ছাপ না থাকলেও কালীপ্রসন্ন তাঁর পাণ্ডিত্য, শিক্ষণ পদ্ধতি ও চারিত্র মাধুর্যে তাঁর ছাত্রদের চিত্ত জয় করেছিলেন।

তাঁর কৈশোরেই কালীপ্রসন্ন জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যখন লাহোরে বক্তৃতা দেন তখন শ্রোতাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন উপস্থিত ছিলেন। শিবনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের ভাষণ তাঁকে মুগ্ধ করে। যৌবনে সন্ন্যাসীরূপে ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্যটনের সময় কালীপ্রসন্ন আলাপ আলোচনা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সকলকে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে ব্রতী হন। পরবর্তী জীবনে বহুমুখী জনহিতকর প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর যোগযোগের মূলে ছিল এই গভীর স্বদেশ হিতৈষণা। আর্য সমাজ ও অন্যান্য স্থানে তাঁর সব ভাষণের মূল সুর ছিল একটি—সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও আত্মচেতনার বিকাশ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলাভের তিন বৎসর পরের কথা। ১৮৮৮র গোড়ার দিকে স্থির হল যে পাঞ্জাব প্রদেশের প্রতিটি জিলায় কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করতে হবে। এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিলেন কালীপ্রসন্ন

চট্টোপাধ্যায়। এই বিষয়ে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পাঞ্জাবে কংগ্রেসের জন্ম ও কালীপ্রসন্নের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি তাঁর Inside Congress ও 'কল্যাণ মার্গকা পথিক', গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে পাঞ্জাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্ম কাহিনী প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "এই বৎসর (১৮৮৮) পাঞ্জাবে প্রথম স্থির হয় যে প্রত্যেক জেলায় কংগ্রেস কমিটি স্থাপনা করা হবে। আমার মিত্র কালীবাবু জলন্ধর এবং হোসিয়ারপুরের কংগ্রেস কমিটি স্থাপনার ভার গ্রহণ করেন এবং আমার নিকট উপস্থিত হলেন। আমার বিশেষ প্রয়োজনের সময় তিনি আমার সহায়তায় এসেছিলেন অর্থাৎ জলন্ধর আর্যসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে যখন সকলে আসবার জন্য অস্বীকার করে করে দেন তখন বাহির থেকে ইনিই একাকী বাধ্যতা ছিলেন। এই জন্য এখন নিজের পলিটিকল মিশনে আমার কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণ করা তিনি নিজের অধিকার বলে মনে করলেন। ৪ জ্যৈষ্ঠ সংবত ১৯৪৫ (১৮ মে ১৮৮৮) দিনের বেলা বম্বাই মেলে কালীবাবু জলন্ধর পৌঁছলেন। আমার ডায়রীতে লেখা আছে, 'কালী পলিটিকল উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে —সে এখানে কংগ্রেস কমিটি স্থাপনা করতে চায়। নিজের সঙ্গে মিলি করার জন্য কিছু 'পামফ্লেট'ও এনেছে। কালী বিচিত্র ব্যক্তি—এর কার্যের যথার্থ রণক্ষেত্র এই রাজনৈতিক আন্দোলন। ধর্ম বিষয়ে কাজ ওর অনুকূল নয়। বালক রামজীও এসে গেলেন আর আমরা সকলে ন্যাশনাল কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করার বিষয়ে বিচার করতে লাগলাম। রাত্রি একটার সময় একজন লোক এল এবং কালীকে হোসিয়ারপুর নিয়ে গেল।' ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে) হোসিয়ারপুরে কংগ্রেস কমিটি স্থাপনা করা হল। কালীবাবু ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে বৃহস্পতিবার) জলন্ধর ফিরে এলেন এবং আর্যসমাজ মন্দিরে উপদেশ দিলেন। সেইদিন থেকে আমি এবং বালক রামজী কালীবাবুকে তাঁর মিশনে কৃতকার্য করার বিষয় চিন্তা করতে লাগলাম। ৭ জ্যৈষ্ঠ (২১ মে, সোমবার) কালী-বাবু পুনরায় আর্যসমাজ মন্দিরে ব্যাখ্যান দিলেন। তখন তাঁর সহায়তার জন্য সকলে উঠে পড়ে লাগলেন এবং একজন প্রতিষ্ঠাবান লোকের নূতন বাড়ীতে ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিবসে) একটি বৃহৎ সভা হল। অন্য স্থানে ত রইসরা (বড়লোকেরা) কংগ্রেসের নাম শুনে কানে

আঙ্গুল দিত কিন্তু লালা বালক রায়ের উৎসাহে জলন্ধরের অনরেরি ম্যাজিস্ট্রেট, মুনিসিপল কমিশনর, জমিদার, সেঠ সাহুকার সকলে কংগ্রেস কমিটির ভিত্তি স্থাপনার কার্যে সম্মিলিত হলেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রস্তাব খাঁ বাহাদুর ফজল করীম খাঁ সাহেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট, মুনিসিপালিটি, করলেন এবং লালা হরভজন রায়জী, অনরেরি ম্যাজিস্ট্রেট ও সনাতন ধর্ম সভার প্রধান এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। এই প্রকারে উকিল প্রভৃতিকে পৃথক রেখে বালক রামজী রইসদের দ্বারাই সব কাজ করালেন। আমি দ্বিতীয় দিনই এই অধিবেশনের রিপোর্ট লিখে ট্রিবুনের জন্য পাঠিয়ে দিলাম এবং এই রিপোর্টটি মুখ্য লেখনী স্থানে ছাপা হয় এবং সমস্ত পাঞ্জাবে জলন্ধরে এই প্রকার সাফল্যমণ্ডিত অধিবেশনের সংবাদে হৈ চৈ পড়ে গেল।"*

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বিবরণী থেকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় যে পঞ্জাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মূলে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পাঞ্জাবে কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে সুরু করে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কালীপ্রসন্ন জাতীয় কংগ্রেসের নানা কার্যসূচীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাংবাদিক। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কোন না কোন পত্র পত্রিকার সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারী। এই কংগ্রেসে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন "ইণ্ডিয়ন মিরর"এর নরেন্দ্রনাথ সেন, "হিন্দু"র সুব্রহ্মনিয়া আয়ার, "মারহাট্টা" ও "কেশরী"র আপ্তে এবং আগরকার, "স্পেকটেটর"এর মালাবারি প্রভৃতি। অন্য অনেক সাংবাদিকও এই অধিবেশনে এসেছিলেন। এ ছাড়া বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সকলেই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন এই যুগধর্মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। পূর্বেই উল্লেখ করা

* স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর Inside Congress গ্রন্থে এই কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন (P, 19)।

হয়েছে যে তিনি Lahore Civil Military Gazette-এর কার্যালয়ে অনুবাদকের পদে যোগ দিয়ে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সুরু করেন। এরপর সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর (১৮৮৫—১৯০৫) তিনি "ট্রিবিউন" পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। এক সময় তিনি এই বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় কাগজটির সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব বহন করেছিলেন। এই কাগজে প্রকাশিত তাঁর নির্ভীক, চিন্তাশীল ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা, মন্তব্য, টিকা, প্রবন্ধাদি সর্বত্র সমাদৃত হয়। এই যুগে তাঁর রচিত বিবরণের মধ্যে Warbarton case, লেখরাজ মৃত্যু ও কোয়ের শিশুহত্যার মর্মান্তিক কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ট্রিবিউনের প্রতিনিধিরূপে তিনি দিল্লী দরবারে যোগদান করেন। সাংবাদিক রূপে কালীপ্রসন্নের অসামান্য সাফল্যের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি নিজে আর্য সমাজী হলেও "ট্রিবিউন" কাগজটি ছিল ব্রাহ্মসমাজ পন্থী। এই মৌলিক মতপার্থক্যের জন্য কর্মজীবনে কালীপ্রসন্নকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি এই কারণে তাঁর যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও পদ মর্যাদা সব সময় লাভ করেন নি। তা সত্ত্বেও তিনি যে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান পেয়েছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, নির্ভীকতা, লেখনী ও সর্বোপরি গভীর স্বদেশপ্রেম ও হিতৈষণা।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কালীপ্রসন্ন "ট্রিবিউন" পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছেদ করে নিজস্ব একটি কাগজ প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। ১ আগষ্ট পুত্র জ্যোতিপ্রসন্নের নামে তিনি প্রথম Light পত্রিকার প্রকাশনা সুরু করেন। কাগজটি প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। কালীপ্রসন্নের সম্পাদনা ও হংসরাজ, লালা অমরনাথ, লালা লাজপত রায়, প্রতুল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুহৃদবর্গের সহযোগিতায় এই কাগজটি অল্প দিনের মধ্যে নির্ভীক সংবাদ পরিবেশনা, গঠনমূলক সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য পাঠক মহলে সমাদৃত হয়। কাশ্মীরের রাজা প্রতাপ সিংহ ও তাঁর ভ্রাতা অমর সিংহ Light প্রকাশনে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। নিজস্ব কোন ছাপাখানা না থাকায় কালীপ্রসন্ন বিশেষ অসুবিধা বোধ করছিলেন। কর্পূরতলার মহারাজা গুরুকর্তার সাহেব Light এর নিজস্ব ছাপাখানা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে

যায় ও কালীপ্রসন্ন এক বড় পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হন। Light এর প্রকাশনা কাজে কালীপ্রসন্ন কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার সহায়তা লাভ করেছিলেন।

নিজের কাগজ সম্পাদনা ও প্রকাশের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকলেও কালীপ্রসন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে পিছিয়ে পড়েন নি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাংড়ার প্রবল ভূমিকম্পে ঐ স্থানের বিখ্যাত মন্দিরটি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহের অভিযানে তিনি অগ্রণী হন ও মন্দিরটি পুনর্নির্মাণে সহায়তা করেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে স্বদেশী ভাবধারা ও বিপ্লবী তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ বাংলার বাইরেও আলোড়ন সৃষ্টি করে ও চরমপন্থী মতবাদ বিস্তৃতি লাভ করে। বিদেশী শাসনের নিপীড়ন যন্ত্র এই আন্দোলন দমনে সক্রিয় হয়ে ওঠে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ধরপাকড় সুরু হয়। সরকারের সন্দেহ দৃষ্টি কালীপ্রসন্ন ও তাঁর কাগজের উপর পড়ে। বিশ্বস্তসূত্রে তিনি জানতে পারেন যে শীঘ্রই তাঁর উপর পাঞ্জাব ত্যাগের নির্দেশ জারী করা হবে এবং তাঁকে অন্যান্য বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। রাজনৈতিক কারণ ছাড়া আর্থিক কারণেও Light প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ছিল। এই প্রতিকূল পরিবেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুদের একান্ত অনুরোধে তিনি তাঁর কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে কলকাতায় যেতে সম্মত হন।

শিশির কুমার ঘোষ কালীপ্রসন্নের গুণগ্রাহী ছিলেন ও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। শিশির কুমারের সাদর আহ্বানে কালীপ্রসন্ন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন। ইতি পূর্বেই তিনি এই কাগজের রাওলপিণ্ডির Correspondent ও Reporter রূপে কাজ করেছিলেন। নতুন কর্মভার নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কালীপ্রসন্ন তাঁর কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার দ্বারা শিশিরকুমার ঘোষের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। ২৭শে নভেম্বর কাজে যোগ দানের মাত্র তিনদিন পর কালীপ্রসন্ন তাঁর ভগ্নী সাবিত্রী দেবীকে আলিগড়ে লেখেন, "আমার প্রবন্ধ ও টিপ্পনী অমৃতবাজার পত্রিকায় রীতিমত বাহির হইতেছে।" ঐ দিনই ভগ্নীপতি উদয়চন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পৃথক পত্রে লেখেন, "I think I shall pull on with my new manibs very well. The head of the family Shisir Kumar Ghosh, the renowned founder of the Patrika, has openly expressed his appreciation of my writing. He is very good to me. Yesterday he wrote 3 or 4 pages as the begin: ing of an article and set me to finish it. It is very difficult to make the poor English of a Punjab-bred man like me to harmonise with the composition of a veteran like Shisir Babu. But I boldly added eighteen pages more and sent up the finished article upto his room waiting for its "reception" with a palpitating heart Within ten minutes he came down to me himself and proroumed my work as "চমৎকার" ! I was delighted. I am resolved to work, work and work to deserve God's blessing."৩

এই সময়ে যাঁরা অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশে শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের প্রধান সহযোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরমানন্দ দত্ত তাঁর Memoirs of Motilal Ghosh গ্রন্থে লিখেছেন।

"Babu Kali Prasanna Chatterji a Bengali Gentleman hailing from the Punjab, had not unfortunately a long connection with the Patrika. But his position in the office was very high. He was writer of leaders and paragraphs and his (as well as Hem Babu's) name appeared in many officical returns as the editor of the Amrita Bazar Patrika."৪ অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও কালীপ্রসন্ন প্রায়ই বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতে যেতেন ও দেশের যুব সমাজকে বিশেষ করে ছাত্রদের, স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান জানাতেন।

আজীবন পাঞ্জাবের শুষ্ক জলবায়ুতে মানুষ কালীপ্রসন্ন বাংলা দেশের আর্দ্র

আবহাওয়াতে অভ্যস্ত হতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও শেষ পর্যন্ত শারীরিক কারণে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পত্রিকার সঙ্গে কর্মসূত্রের যোগাযোগ ছিন্ন হলেও শিশির কুমারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি। কালীপ্রসন্ন শিশির কুমারকে অসীম শ্রদ্ধা করতেন ও প্রতিদানে পেয়েছিলেন শিশিরকুমারের আন্তরিক স্নেহ। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী শিশির কুমারের মৃত্যুর পর কলকাতা টাউন হলে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার পৌরোহিত্যে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে লাহোরের "পাঞ্জাবী" পত্রিকা এবং সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশের প্রতিনিধি রূপে কালীপ্রসন্ন যোগদান করতে আসেন। এই সভায় শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও শিশিরকুমারের অসামান্য চরিত্র এবং অবদানের উল্লেখ করে তিনি এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। তাঁর যৌবনকালে পাঞ্জাবের যুব সমাজের উপর শিশিরকুমারের সুগভীর প্রভাবের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন :

"In 1885 a brilliant graduate of the Lahore Government College made a pilgrimage to Calcutta to bow at the feet of Shisir Kumar. He is today one of the brightest ornaments of Punjab Hindu society. I still vividly remember how we young Punjabis (I am a Bengali by blood but Panjabi by life-long residence and association), how we students of various colleges in Lahore used to cluster around that fortunate friend and deluge him with eager questions as to how Shisir Kumar looked like, how he dressed, how he talked and wrote, how he spent his leisure moments, how he prayed and sang hymns, so on and so forth. Young Punjabi was in the throes of a mighty religious and social upheaval in those days and the advanced and catholic, yet indigenous and natural religious sentiment of Shisir Kumar, made a profound inpression on our minds."৬

শিশিরকুমারের চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও মাধুর্যের পরিচয় দিয়ে কালীপ্রসন্ন বলেন, "I will only say, he was great through and through, from the outer most plane of his existence to the inner-most depths of his being. Goodness and greatness were inherent in him as natural qualities. His powers and faculties were attuned to such a pitch of perfect harmony that no false or jarring note could be struck in his thoughts or acts even unconsciously."৬

লাহোরে প্রত্যাবর্তনের পর কালীপ্রসন্ন তৎকালীন বহুলপ্রচারিত জাতীয়তাবাদী ইংরাজি পত্রিকা Pubjabi'র সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন। তাঁর সহোদর ভ্রাতা রমাপ্রসন্ন এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন প্রায় এক বৎসর কালীপ্রসন্ন Pubjabi'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কালীপ্রসন্নের মত একনিষ্ঠ ও প্রতিভাবান সাংবাদিকের অভাব অমৃত-বাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে অনুভব করছিলেন। এই কারণে শিশিরকুমারের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে মতিলাল ঘোষ কালীপ্রসন্নকে পুনরায় অমৃতবাজারে যোগ দেবার জন্য ঐকান্তিক অনুরোধ জানান। এই সাদর আহ্বান প্রত্যাখান করতে না পেরে কালীপ্রসন্ন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পুনরায় কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ভগ্নী সরযুবালা দেবীর কন্যার বিবাহে যোগদানের জন্য বারাণসীতে নামেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কয়েক-দিন ঐ স্থানে থাকার পর কলকাতায় যাবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন ঘটে যায়।

সরযুবালা দেবীর স্বামী ফণিভূষণ অধিকারী ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁর গৃহে অবস্থানকালে কালীপ্রসন্নের সঙ্গে ফরিদকোটের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও লাহোরের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী রায় বাহাদুর বরদাকান্ত লাহিড়ীর সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের মধ্যে পূর্ব পরিচয় ছিল। বরদাকান্ত এই সময় কাশীতে বসবাস করছিলেন ও তিনি ছিলেন ভারতধর্ম মহামণ্ডলের বিশিষ্ট সদস্য ও সম্পাদক। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতধর্ম মহামণ্ডলের স্থাপনা করেছিলেন জ্ঞানানন্দ স্বামী। সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। এই প্রতিষ্ঠানটির

প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মঠ, মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার কার্য সাধিত হয়েছিল। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে কালীপ্রসন্ন মহামণ্ডলের পত্রিকার সম্পাদনা ও মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত সারদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণে সম্মত হন। গঠনমূলক কার্যসূচীর মাধ্যমে হিন্দুধর্মের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার বাসনা, শেষ জীবনে কাশীবাসের আকাঙ্খা এবং স্নেহময়ী ভগ্নীর সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা সম্ভবত এই তিন কারণেই কালীপ্রসন্ন ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের কাজে যোগ দেন। এই সংস্থার ইংরাজী ও হিন্দী পত্রিকার প্রকাশনা এবং অন্যান্য পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। দেশের নানান স্থানে জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় মঠ। মন্দির ও দেবালয়ের সংস্কার, নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা, ধর্মশালা, টোল, চতুষ্পাঠী ও বিদ্যালয় স্থাপনা, ধর্মীয় সভা সমিতি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রভৃতি নানাবিধ কাজ তাঁর উৎসাহ ও পরিচালনায় সম্পাদিত হয়েছিল। জ্ঞানানন্দ স্বামী কালীপ্রসন্নের কর্মদক্ষতা, নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিকতার উপর একান্ত নির্ভর করতেন। তাঁর সেবাব্রত ও আদর্শবাদের জন্য কালীপ্রসন্ন সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন এবং জ্ঞানানন্দ স্বামী তাঁকে সস্নেহে "রাজা সাহেব" বলে সম্ভাষণ করতেন।

ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের কাজ ছাড়া কালীপ্রসন্ন আরও বহুবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাঞ্জাবে অবস্থান কালে তিনি 'বঙ্গভঙ্গ' বিরোধী আন্দোলনে নেমেছিলেন ও স্বদেশী চিন্তা এবং আদর্শ প্রচারে সক্রিয় হয়েছিলেন। এর জন্য তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন ও প্রথমবার তাঁর পাঞ্জাবত্যাগের মূলে ছিল শাস্তিমূলক সরকারী আদেশের সম্ভাবনা। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' আদেশ রহিত হলে কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত আনন্দিত হন। এই উপলক্ষে তিনি তাঁর ভগ্নী সরযূদেবীর নামে একটি "আনন্দ সঙ্গীত" রচনা করে নিজেই সুর দেন।৭ 'বঙ্গভঙ্গ' আদেশ রহিত হওয়া উপলক্ষে কাশীর টাউন হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন একটি প্রভাত ফেরি দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে যাত্রা সুরু করে তাঁর নেতৃত্বে শহর প্রদক্ষিণ করে। টাউন হলের জন সমাবেশে তাঁর ভাষণে কালীপ্রসন্ন বাংলার ঐক্যরক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন।

আর্যসমাজী রূপে পরিচিত হলেও কালীপ্রসন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও ভাবধারার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী ভ্রমণকালে তিনি কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম দেখে মুগ্ধ হন। মিশনের সেবাকার্য ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি Visitors' Book'এ লেখেন, "The Institution in the Catholic beneficence of its spirit, is worthy of the saint whose name it bears. My pride in my native land has been strengthened, and my heart has been broadened by my visit to this Home." কয়েক বৎসর পর কালীপ্রসন্ন যখন বারাণসীকে তাঁর কর্মস্থল রূপে বেছে নেন তখন এই মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম এবং রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম—উভয় প্রতিষ্ঠানের জনকল্যাণ মূলক কার্যে ও উৎসবাদিতে তিনি যোগদান করতেন এবং প্রায়শ বাংলা ও হিন্দীতে বক্তৃতার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রচারে সহযোগিতা করতেন। ঐ সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং কেদার মহারাজ কাশীতে অবস্থান করতেন ও তাঁরা কালীপ্রসন্নের বাগ্মিতা, সংগঠন প্রতিভা ও সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাকে মিশনের কাজে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। কালীপ্রসন্নও সানন্দে সর্বতোভাবে মিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। স্থির হয় যে মিশন থেকে কালীপ্রসন্নের সম্পাদনায় একটি মাসিক হিন্দী পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও মিশনের কাজে তাঁর গভীর আগ্রহের কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ভগ্নী সাবিত্রী দেবীকে লেখেন, "আমি এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহিত খুব মিশিয়া গিয়াছি। প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ও শ্রীবিবেকানন্দ স্বামী ও ভগ্নী নিবেদিতার বিষয় সব লেকচার দি। এখানকার পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লোক অনেকেই আসেন ও এই লেকচারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই মিশন হইতে আমরা একখানি হিন্দী মাসিকপত্র শীঘ্রই বাহির করিব। আমি তাহার এডিটর মনোনীত হইয়াছি। সেই কাগজে ধারাবাহিক হিন্দী অনুবাদ ছাপাইব। তাহাতে এ প্রদেশের বড়ই উপকার হইবে। হিন্দীতে পরমহংসদেবের বিষয় এখনও কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। তোমার দ্বারায় মার আশীর্বাদে যদি এই

অভাব মোচন হয়, তাহা অপেক্ষা তোমার ও আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে। ধর্ম প্রচার কার্যে লিপ্ত থাকিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের মনে উদয় হইতে পারে। তাই আমি সর্বদা এই কাজে লাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করি। তোমাকেও লাগিয়া থাকিতে বলিতেছি।

পরমহংসদেবের চরণে আসিয়া পড়িয়াছি। পরম শান্তিলাভ করিয়াছি। "কথামৃত" ও গোঁসাইজীর রামায়ণ হইতে হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া একটু একটু প্রতি সপ্তাহে পাঠাইবে। এ ভার তোমার উপর। "ন" কথিত অমৃতসাগর তোমার কাছে আছে। আমরা ভাই বহিনে বৃদ্ধ বয়সে ভগবানের আদেশে এ মহৎ কাজ পাইয়াছি। ৮

বারাণসীতে যে কোন জনহিতকর কাজে এবং সভা সমিতিতে কালীপ্রসন্নের ডাক পড়তো। তিনি কাশীর টাউন হলে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে, নাগরিক প্রচারিণী সভা প্রভৃতি নানান স্থানে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি গোখলের মৃত্যুতে কাশীতে যে নাগরিক শোকসভা হয় তাতে অন্যতম প্রধান বক্তা রূপে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

কাশীতে তাঁর কর্মজীবনের মধ্যে অল্প কিছুকালের জন্য তিনি তাঁর লাহোরের বিশিষ্ট বন্ধু ব্যারিষ্টার বুলকিরামের আহ্বানে দেরাদুনে তাঁর cosmopolitan কাগজের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। কালীপ্রসন্নের সম্পাদনার গুণে পত্রিকাটির প্রচার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় "ট্রিবিউন"এর সম্পাদনা ভার পুনরায় গ্রহণ করার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। কিন্তু তিনি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে কালিনাথ রায় ঐ পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বারাণসীতে কালীপ্রসন্নের স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর মৃত্যু হয়। পত্নী বিয়োগের কিছুকাল পরে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভের জন্য পাঠান। কালীপ্রসন্নের ভগ্নী সরযূদেবীর কন্যা রাণু* ও এই সময় শান্তিনিকেতনে পড়তেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের পরিচয় ঘটে। কবিগুরুর সঙ্গে যোগাযোগ কালীপ্রসন্নের কর্মবহুল বৈচিত্র্যময় জীবনের সায়াহ্নে এক স্মরণীয় ঘটনা।

* শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কালীপ্রসন্ন শান্তিনিকেতন যান ও সপ্তাহাধিক কাল সেখানে থাকেন। কালীপ্রসন্নের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ মুগ্ধ হন ও তাঁর অনুরোধে কালীপ্রসন্ন ৩০ জুন শান্তিনিকেতনে দুটি বক্তৃতা দেন। দ্বিপ্রহরে তিনি বাংলায় ও সন্ধ্যায় হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল "কো ব্যাং চো চ্যাং"। (কোমর বাঁধ চোখ চাও)। কৌতুকপ্রিয় কালীপ্রসন্ন শ্রোতাদের মধ্যে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টির জন্যই রবীন্দ্রনাথের সম্মতি নিয়ে এই রকম অদ্ভুত নামকরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শান্তিনিকেতনের অন্যান্য অনেক অধ্যাপকবৃন্দ সহ উভয় বক্তৃতাতেই উপস্থিত ছিলেন। কালীপ্রসন্নের ভাষণ সকলকে চমৎকৃত করে। তৎকালীন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় কালীপ্রসন্নের বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কালীপ্রসন্নের আদর্শবাদ, আন্তরিকতা, বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে বিশ্বভারতী গড়ার কাজে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "এতবড় বিশাল প্রাণ নিয়ে কোথায় মরুভূমিতে আছেন। এখানে আসুন।" বলাবাহুল্য কবির ডাকে সাড়া দিতে কালীপ্রসন্ন ব্যাকুল হন যদিও তখনি তাঁর পক্ষে বারাণসী থেকে চলে আসা সম্ভব ছিল না। বারাণসী প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না। মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে পুত্র বিশ্বনাথকে লেখেন, "আশা করে বসে আছি সারবামাত্র বোলপুরে গুরুদেবের শ্রীচরণে স্থান নেবো আর তোমার কাছে থাকবো।"৯

দুর্ভাগ্যক্রমে কালীপ্রসন্নের এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে নি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর আকস্মিকভাবে কালীপ্রসন্নের দেহাবসান হয়। তখন তাঁর বয়স ৫৬ বৎসর মাত্র। মৃত্যু সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বহু গুণমুগ্ধ সহকর্মী বন্ধুবান্ধব ও সাধারণ মানুষ তাঁর গৃহে উপস্থিত হন। এক বিশাল শোকযাত্রা সহকারে তাঁর মরদেহ শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মনিকর্ণিকার ঘাটে।

কালীপ্রসন্নের মৃত্যু সংবাদে রবীন্দ্রনাথ গভীর মর্মাহত হয়েছিলেন। শোকাতুরা সরযূবালা দেবীকে তাঁর অগ্রজের তিরোধানে সমবেদনা জানিয়ে

রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রের একাংশে কবি লেখেন, "মানুষের আত্মা মৃত্যুর অতীত। সেই আত্মার প্রকৃত পরিচয়ই আমরা পেতুমনা, যদি শারীরিক জীবন ছাড়া আমাদের আর কিছু না থাকত। এই জন্যে মানুষকে দুইভাবে জানলে তবে তাকে পূর্ণ জানা হয় —একবার পেয়ে তার পরে আবার ত্যাগ করে।" জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতির পরিচয়বাহক এই পত্রটি "শোকাতুরার প্রতি" শিরোনামায় শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।১০

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে তাঁর শেষজীবনের কর্মভূমি উত্তর প্রদেশে ও তাঁর আশৈশব বাসভূমি পাঞ্জাবে গভীর বেদনা সঞ্চার করে। "Death of a Notable Bengali" শীর্ষক একটি নিবন্ধে তাঁর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে 'ট্রিবিউন' পত্রিকা লেখে :

"He was particularly in evidence by reason of his long connection with the Tribune for about 20 years, as also by his activities in all the progressive movements of his time—religious, social and political. As a facile writer, ready speaker and genial wit he had no superior, and not many equals among men of this country for versatility and all round usefulness."১১

ভারত ধর্ম মহামণ্ডল পত্রিকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে কালীপ্রসন্নের বহুমুখী প্রতিভা প্রসঙ্গে লেখে যে তিনি বাংলা ইংরাজী, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং ধর্ম মহামণ্ডলের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। তিনি ছিলেন সহজ, সরল, সহানুভূতিশীল এবং কোমল হৃদয় পুরুষ। তাঁর সংস্পর্শে যিনিই এসেছেন তিনি তাঁর চরিত্র মাধুর্যের পরিচয় পেয়েছেন।"১২

পরিশেষে কালীপ্রসন্নের অসামান্য প্রতিভার আর এক দিকের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। শেষ জীবনে তিনি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে "সিখ সম্রাট ও সতীর শাপ" নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর

বহুদিন পর এই উপন্যাসটি "পরিচয়" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য রসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল।[১৩]

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য এখনও অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। "লাইট", "ট্রিবিউন" প্রভৃতি পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলির সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের প্রচেষ্টায় তাঁর ব্যক্তিগত ও সমসাময়িক জীবনের উপর নূতন আলোকপাত সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যেটুকু তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে তার থেকে সহজেই জানা যায় যে কালীপ্রসন্ন এক অনন্যসাধারণ পুরুষ ছিলেন যিনি বিগত শতাব্দীর শেষ দুই এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে জাতিগঠনের কাজে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছিলেন।

টীকা

১। Nagendranath Gupta, Reflections and Reminiscence P. 145

২। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সন্ন্যাসী, কল্যাণ মার্গিকা পথিক, (লালা মুন্সীরাম)
(প্রকাশক—জ্ঞান মণ্ডল কার্যালয়, কাশী) পৃ ১৪৮
Swami Sraddhananda, Inside Congress, P. 19

৩। উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র (৩০ নভেম্বর, ১৯০১)

৪। Paramananda Dutta, Memoirs of Motilal Ghosh pp. 290 91

৫। Amrita Bazar Patrika, March 25, 1911

৬। ঐ

৭। "বঙ্গের অন্তচ্ছেদ রহিত উপলক্ষে আনন্দ-সঙ্গীত"
(রাগিনী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল), বারাণসী ২রা পৌষ ১৩১৮।

৮। সাবিত্রী দেবীকে লিখিত পত্র

৯। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র (১৭ জানুয়ারী, ১৯১২)

১০। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ পৌষ (রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি লিখেছিলেন ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫)

১১। The Tribune, Tuesday, November 18, 1919

১২। ভারতবর্ষ মহামণ্ডল পত্রিকা, ১৯১৯

১৩। "পরিচয়" পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ পর্যন্ত উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

*এই প্রবন্ধ রচনার জন্য কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় বহু প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

বাংলা দেশে জনশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস

গোপাল মুখোপাধ্যায়

আধুনিক দৃষ্টিতে জনশিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা ছিল না। জনশিক্ষার প্রতি সমাজের দৃষ্টিও সেভাবে আকৃষ্ট হয়নি। দেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্তের ছেলেরাই কিছু কিছু শিক্ষার সুযোগ পেতো, বেশীর ভাগ গরীব অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা কোনরকম সুযোগ পেতো না।

স্যার জন শোরের শাসনকালেই (১৭৯৩-৯৮) ভারতবর্ষে জনশিক্ষার প্রশ্নটি সরকারী ভাবে উত্থিত হয়। তাঁর Notes on Indian Affairs নামক দলিলে তিনি এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে যাতে দেশের সাধারণ মানুষ শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য তাৎকালিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন ও প্রয়োজনবোধে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সুচিন্তিত সরকারী প্রচেষ্টা কিংবা দেশীয় বিদ্যোৎসাহী বা মিশনারীদের পদক্ষেপের পূর্বেই ১৮০৩ সালে আমরা দেখি মিঃ এলারটন নামে মালদহের এক নীলকর সাহেব সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে তাঁর এলাকায় কতক-গুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে স্থানীয় ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়গুলির উপযোগী কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। পরবর্তীকালে ১৮১৪ সালে রেঃ রবার্ট মে নামে একজন খ্রীষ্টান পাদ্রী চুঁচুড়া অঞ্চলে ৯৬টি এবং মিঃ পিয়ার্সন ও মিঃ হার্লে খুলনা, শ্যামনগর ইত্যাদি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মূলত একই উদ্দেশ্যে। প্রায় ঐ একই সময়ে শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রী কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, চার্চ মিশনারী সোসাইটির ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট বর্ধমান অঞ্চলে, এবং লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির টালিগঞ্জ, খিদিরপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় জনশিক্ষার্থে প্রতিষ্ঠা করেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে হিন্দু মুসলমানের ছেলেরা (তবে তুলনা-মূলকভাবে মুসলমানের ছেলেরা অনেক কম সংখ্যায়) সেগুলিতে যোগদান

করে। এই সময় মিস্ কুক্ (পরবর্তীকালে মিসেস্ উইলসন্) মেয়েদের জন্য কয়েকটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২২ সালে 'খ্রীষ্টীয়ান নলেজ সোসাইটি'র উদ্যোগে কাশীপুর, টালিগঞ্জ ও হাওড়ায় বিখ্যাত সার্কেল প্রথায় (circle system) কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।১ 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র অন্যতম সদস্য শ্রীউদয় চরণ আঢ্য বাংলার মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় একটি আদর্শ পাঠশালা বা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং ঐ উদ্দেশ্যেই তার একবছর পরে হিন্দু কলেজের কর্মকর্তাগণের—রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির—উদ্যোগে হিন্দু কলেজের অধীনে ১৮৪০ সনের ১৮ই জানুয়ারী একটি বাংলা পাঠশালার কাজ আরম্ভ হয়। ঐ বছরেই জুন মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্বোক্ত পাঠশালার আদর্শে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠা করেন। আবার তত্ত্ববোধিনীর আদর্শে পাণিহাটি, মুখসাগর ইত্যাদি স্থানে বাংলা পাঠশালা স্থাপিত হয়। মাতৃভাষার প্রতি সরকারের ও জনসাধারণের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ সনে সুবে বাংলায় সরকারী ব্যয়ে ১০১টি আদর্শ দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সব বিদ্যালয়ে কমবেশী ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ানো হোত। 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' দীর্ঘকাল ধরে এই ধরণের স্কুলের জন্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশে সাহায্য করেছে।২

কিন্তু এই সময় 'ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা'র পরিপোষক সরকারী শিক্ষা নীতি ও জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে নতুন চিন্তাধারা এক পৃথক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে যার প্রভাব পরবর্তীকালে বাংলাদেশে জনশিক্ষার গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে ও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইংরাজ প্রবর্তিত ভূমি ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এক 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। তাঁরা নিজেদের স্বার্থে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যমের প্রশ্নে ইংরাজীর প্রতি সমর্থন জানান। ভারতবাসীদের শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল করার জন্য এক শ্রেণীর ইংরাজও এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন।৩ দেশীয় বিত্তশালী শ্রেণী জমিদারেরা উদারভাবেই ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের জন্য গ্রামে ও শহরে ব্যাপকভাবে 'এ্যাংলো-ভার্ণাকুলার স্কুল' স্থাপন করতে লাগলেন ও সরকারী অনুদানের দাক্ষিণ্যও সেগুলির উপর

বর্ষিত হতে লাগলো ; টাকী, জনাই, বর্ধমান, আন্দুল, এমন কি সুদূর ঢাকাতেও ইংরাজী স্কুলের সাফল্য এই বিশেষ সামাজিক দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী।[৫] ধুরন্ধর ইংরাজ শিক্ষাবিদেরা অবশ্য দেশীয় লোকদের সামনে 'Downward Filtration' থিয়োরীর সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রথমে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রসার লাভ করবে তারপর তা ক্রমশ চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিম্নবিত্ত আপামর জনসাধারণকে প্লাবিত করবে। কিন্তু বছরের পর বছর পরেও শ্রেণী ভেদের গ্রানাইট পাথরের স্তর ভেদ করে এক ফোঁটা জ্ঞানও গ্রাম বাংলার অগণিত সাধারণ মানুষের ওপর বর্ষিত হয়নি।[৫] নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় সব থেকে বেশী লাভবান হন উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, মুন্সেফ, কেরানী, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদিরা। এঁরাই মূলত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার গ্রাহক হলেন এবং কিছু কিছু বিত্তশালী জমিদার এঁদের আর্থিক সাহায্য করতে লাগলেন। ফলে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশেও ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটে। এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামাজিক দিক থেকে বহুলাংশে কুসংস্কার মুক্ত ও নতুন চিন্তাধারার প্রচারক হলেও দেশের অগণিত নিম্নবিত্ত নিরক্ষর গরীব চাষীকে শিক্ষিত করে তোলার কাজে বিশেষ অগ্রসর হন নি। এদিক থেকে তাঁদের চিন্তা ছিল প্রধানত সীমাবদ্ধ। ইংলণ্ডেও ১৮৩১ সনের রিফর্ম বিলের আগে ব্যাপক জনশিক্ষার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোন রকম চিন্তা করেনি।[৬] কতকগুলো বিশেষ ধারণাই এই দেশে জনশিক্ষার এই অবস্থার জন্য দায়ী বলে মনে করা যেতে পারে। প্রথমত সাধারণ চাষীদের মধ্যে নতুন শিক্ষার আন্দোলন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি এবং এর প্রয়োজনীয়তাও তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। কোন রকম পুঁথিগত শিক্ষা ব্যতিরেকেই তাদের পূর্বপুরুষ চাষ-আবাদ করে জীবন কাটিয়েছে। দ্বিতীয়ত আর্থিক সংগতির অভাব ; মাঠের কাজে ছেলেই প্রধান সাহায্যকারী, সুতরাং ছেলেকে পাঠশালায় পাঠিয়ে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করার মত অবস্থা তাদের ছিল না ; তাছাড়া তারা মনে করতো তাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখলে 'ভদ্রলোক' হয়ে পূর্বপুরুষের পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করবে এবং শহরে কেরানী হবার জন্য পরমুখাপেক্ষী হবে ; তাছাড়া 'ভদ্রলোকী শিক্ষা'

তাদের দেশীয় জল-মাটীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে শারীরিক দিক থেকেও পঙ্গু করে ফেলবে। তৃতীয়ত গ্রামের অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার চেষ্টা করবে ও প্রথাগত পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল ধরবে।

অপরদিকে, আবার এক শ্রেণীর ভদ্রলোক নিজেদের ভদ্রত্ব বজায় রাখার জন্য চিরদিনই এক শ্রেণীর 'ছোট লোকের' উপস্থিতি প্রয়োজনীয় মনে করেন। তাঁরা মনে করতেন গরীব লোকেরা লেখাপড়া শিখলে সস্তায় মজুর চাকর পাওয়া যাবে না। তাছাড়া জাতিভেদ প্রথার প্রভাবও তথাকথিত এক শ্রেণীর উচ্চ বর্ণের লোকেদের শিক্ষা সম্পর্কে উদাসিক করে তুলেছিল এবং নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারকে তাঁরা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। ইংরাজ সরকারও প্রকৃত পক্ষে বাস্তবানুগ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বারংবার দ্বিধা করেছেন, অর্থাভাবের অজুহাত তাঁরা দেখিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ও দেশের আপামর মানুষের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য যে যে ব্যবস্থা সেখানে গ্রহণ করা হয়েছিল, বাংলা দেশ তথা ভারতের ক্ষেত্রে তাঁরা সযত্নে তা এড়িয়ে গেছেন, ১৮৫৪ সনের উড ডেসপ্যাচ, ১৮৭৯ সনের স্টানলী ডেসপ্যাচ ও ১৮৮২ সনের হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে জনশিক্ষার (mass education) কথা বার বার উচ্চারণ করলেও তা যথাযথ কার্যকরী করা হয়নি কারণ শাসক শ্রেণী জানতেন যে ব্যাপক গণ শিক্ষার বিস্তার তাঁদের সাম্রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ হবে না।[৭]

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনশিক্ষার কাজে বেসরকারী দিক থেকে বিশেষ উদ্যম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ইত্যাদি মিশনারীরা। খ্রীষ্টান মিশনারীরা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্মের প্রচারও কামনা করতেন। সেই কারণে প্রধানত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর পাহাড়িয়া আদিবাসী ও গ্রামাঞ্চলের জাতিভেদ প্রথায় নিপীড়িত তথাকথিত নীচু শ্রেণীর অনগ্রসর অধিবাসীদের মধ্যে মিশনারীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন। সাঁওতাল পরগণা, দার্জিলিং, গারো পাহাড় ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণ চব্বিশপরগণা, নদীয়া, যশোহর, হুগলী বীরভূম, বগুড়া, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলায় তাঁদের কাজের তৎপরতা দেখা যায়।

কিন্তু এই সময় একান্তভাবেই শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য পৃথক দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষার চিন্তাও দেখা যায়, যেটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৬৩ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল উত্তরপাড়া হিতকারী সভার উদ্যোগে উত্তরপাড়ার সংলগ্ন মাকলা গ্রামে কৃষক বালকদের জন্য এক বিশেষ বিদ্যালয়ের পত্তন করা হয়। বিদ্যালয়টি প্রধানত পেশাগত (vocational),—কৃষক বালকেরা যাতে উন্নতমানের কৃষি শিক্ষা লাভ করে তারই জন্য এই ব্যবস্থা। প্রথমে ১২ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হলেও ঐ বছরই পরে ৪০ জন ছাত্র হয়েছিল। ঐ বিদ্যালয়ে তিনটি শ্রেণী ছিল এবং পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য তা পরিচালনা করতেন। ছাত্রেরা সকলেই বয়সে অল্প বলে তাদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হোতনা; ১২টি পাঠে তাদের শরীর বিদ্যা, উদ্ভিদ্ বিদ্যা এবং জন্মির সার ও উর্বরতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হোত।[৮] এই ধরণের প্রচেষ্টা বাংলা দেশে শুধু প্রথমই নয় উদ্যোক্তাদের প্রগতিশীল চিন্তাধারারও পরিচায়ক এবং সমসাময়িক চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রভাব কিছু কিছু বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের শ্রমিকদের ওপর পড়তে থাকে। কলিকাতা, হাওড়া, নাগপুর, বোম্বাই ইত্যাদি অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে থাকে। আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাথমিক যুগে শ্রমিকদের মধ্যে সমাজ উন্নয়ন মূলক (Social welfare) কাজই প্রাধান্য পায়। পরে বেতন ও কাজের অন্যান্য সুযোগসুবিধার দাবী উঠতে থাকে। বাংলা দেশে শ্রমিকদের মধ্যে জনশিক্ষা ও সমাজশিক্ষা বিস্তারের কাজের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত হচ্ছে কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সমাজ-শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজের সংগঠন। শ্রীশিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন উৎসাহী কর্মী ১৮৭০-৭১ সনে এই কাজে ব্রতী হন। ইংলণ্ডের শ্রমিকরা কি কি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং তাদের মধ্যে জনশিক্ষার প্রসার কি ভাবে হয় তা জানার জন্য তিনি ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গে ডাকযোগে লণ্ডনে যোগাযোগ করেন। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে এবং শ্রী পি. এন. মজুমদারের নেতৃত্বে বোম্বাই এর সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যেও

এই সময়ে সমাজশিক্ষা ও জনশিক্ষার কাজ শুরু হয়। তিনি শ্রমিকদের জন্য কয়েকটি 'নাইট স্কুল' ও পরিচালনা করেন।[৯]

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই শ্রমিকদের মধ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার নজীর চোখে পড়ে। সিংভূম জেলার কোলহান অঞ্চলের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য কোন বেতন দিতে হোতনা এবং মানকি (গ্রামের মোড়ল) নজর রাখতো যাতে গ্রামের সব ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর গিরিডিস্থ কোলিয়ারী অঞ্চলেও কোম্পানী শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। জে. এ কানিংহামের রিপোর্টে (১৯০৯-১০) দেখা যায় যে কোম্পানী কোলিয়ারী এবং রেলের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য যে শুধু অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাই করেছিলেন তা নয়, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত ছাত্রদের জন্য শ্রেণী অনুযায়ী মাথাপিছু ৭ আনা থেকে ৮ আনা হারে সাপ্তাহিক পুরস্কারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। গিরিডি অঞ্চলে ৬ মাইল পরিধির মধ্যে ৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪০৮ জন। উচ্চপ্রাথমিক ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত শিক্ষক ও গুরু নিয়োগ করা হোত এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি পরিদর্শনের জন্য একজন বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিদর্শক-পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া কোম্পানীর স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ব্যক্তিগত ভাবে তদারক করতেন।

দার্জিলিং ও তরাই-এর চা বাগান অঞ্চলেও এই সময় বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। আগে চা বাগানের বেশীর ভাগ মালিক শ্রমিকদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাদের মতের পরিবর্তন হয়। এই সময় (১৯০৭-১২) উক্ত চা বাগান অঞ্চলে শ্রমিকদেরও তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০টি থেকে ৫৩টি হয় এবং ছাত্রসংখ্যাও ৬৩২ থেকে ১৫০৩ হয়। ১৯১২ সনের চা মালিক সঙ্ঘের সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে মিঃ বান্ড স্বীকার করেন যে, চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সরকারী প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয়েছে। নেপাল থেকে সদ্য আগত অশিক্ষিত শ্রমিকদের (raw material) তুলনায় শিক্ষিত শ্রমিকরা অনেক বেশী উন্নত ও কার্যকরী (better and effective)।[১০]

শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে জনশিক্ষা বিস্তারের এই ধরণের প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন হলেও বাংলাদেশের জনশিক্ষার ইতিহাসে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর মধ্য দিয়ে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। বর্তমান শতাব্দীতে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবের আগে দেশের জনশিক্ষার ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি স্মরণীয়।

টীকা

১। Vernacular Education in Bengal—Stark, H. A. (P. 7)

২। জাগৃতি ও জাতীয়তা—যোগেশচন্দ্র বাগল (পৃ: ৩৬-৪২)

৩। On the Education of the people of India
— Charles E. Trevelyan (P. 23)

৪। Nineteenth Century Bengal (aspects of Social History)
—Pradip Sinha (Pp. 36-37)

৫। Rev. Lal Behari Day's Lecture on "Primary Education in Bengal", delivered at the Bethune Society on 10.12.1868.

৬। Indian Unrest—Valentine Chirol (P. 76)

৭। Report on the expansion and improvement of Primary Education in Bengal—Evan E. Biss, I. E. S

৮। Report of the Uttarpara Hitokari Sabha (1863-64)

৯। Indian Trade Union Movement—Gopal Ghosh (Pp. 46-47)

১০। Progress of Education in Bengal (4th Quinquenial Review)
—M. Prothero I.E.S.

ইতিহাস

নব পর্যায় চতুর্থ বর্ষ : বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৬

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর পুনর্বিচার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৪
আলোচনা তারা সেনগুপ্তা	২২১
উনিশ শতকের শেষে হালিসহর সাময়িক পত্রে মফঃস্বলের সমাজ চিত্র মঞ্জু গুপ্ত	৫৪
'ঐতিহাসিক চিত্র' বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬৬
জার্মান জাতীয়তাবাদের ধারা রণজিৎ সেন	১২১
দীনার জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৩৪
দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই খাস জগদীশ নারায়ণ সরকার	১৩
ধর্মসভার "বিধবাবিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা" অসীম মুখোপাধ্যায়	১৩৯
নীলচাষের প্রথম পর্বের নীলচুক্তি রাধামাধব সাহা	১৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পত্রপত্রিকায় ইতিহাস অমিত মুখোপাধ্যায়	২৪৯
পূর্বপাকিস্থানে বাংলাভাষায় ইতিহাস চর্চা অমলেন্দু দে	১৮৯
প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে ও সমাজে কামকলার স্থান স্বরজিৎ দত্ত	২১১
বাংলা দেশের গ্রাম পুলিশ ব্যবস্থা বিনয়ভূষণ রায়	২১৭
ভারত নেপাল সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অহর সেন	১৯৯
ভৌগলিক গৌড় দেশ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৭১
সামাজিক তথ্যের টুকিটাকি — যতীন্দ্রমোহন দত্ত	১৮৩
সিরাজদৌল্লা-সাহিত্যে-ইতিহাসে সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	৩৪
সিবাস্টিয়াম মানরিকের চোখে বাংলাদেশ সাধা দত্ত	১৯, ২৩৭
স্বদেশী যুগের শ্রমিক আন্দোলন কয়েকটি অপ্রকাশিত দলিল সুমিত সরকার	১০৭
স্মৃতিকথা রমেশচন্দ্র মজুমদার	১, ৮৯, ১৭৩

ইতিহাস

নব পর্যায় পঞ্চম বর্ষ ঃ বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৭

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আচার্য যদুনাথের প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়	২১৬
আচার্য যদুনাথ সরকার কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়	২৪১
ইতিহাস চর্চার প্রণালী যদুনাথ সরকার	২২৯
ইতিহাস কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশন (১৯৭০) সাধারণ সভাপতির ভাষণ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ	৫৮
ঐতিহাসিক জীবন সুবোধ কুমার মজুমদার	১৫৯
ঐতিহাসিক আমীর খসরু গৌতম ভদ্র	২১, ১০২
পত্রপত্রিকায় ইতিহাস অমিত মুখোপাধ্যায়	৭৯
পুস্তক পরিচয় ইন্দ্রাণী রায়	৭৪
প্রাগৈতিহাসিক প্যালেস্টাইন পরিক্রমণ বাদল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০

বাংলাদেশে জনশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস ২৫৯
গোপাল মুখোপাধ্যায়
বিপিন চন্দ্র পাল ও মহম্মদ আলি ১৩১
অনলেন্দু দে
বিস্মৃত স্বদেশপ্রেমিক ও সাংবাদিক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৫২
নিমাই সাধন বসু
সামাজিক তথ্যের টুকিটাকি (২) ৫৬
যতীন্দ্র মোহন দত্ত
সিরাজদৌল্লার মহিষী ১১৯
সোরেন্দ্র চন্দ্র নন্দী
স্যার যদুনাথের পূর্বপুরুষগণ ও আদিনিবাস ২০৫
বিভা সরকার
স্মৃতিকথা ১, ৯১, ১৮৭
রমেশচন্দ্র মজুমদার

With Compliments of

EAST INDIA RUBBER WORKS (P) LTD.

162, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA-7

DAS GUPTA & CO.

PRIVATE LIMITED

BOOKSELLERS SINCE 1886

54 3, College Street, Calcutta-12

PHONE :- 343875 & 346547

STUDENTS BOOK SUPPLY

15. COLLEGE SQUARE.

CALCUTTA-12

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত সংশোধিত সিলেবাস No. Sy II PN/21/61 dated 9.5.68 অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি আপনার মনোনয়ন প্রার্থী।

1. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ১ম ভাগ—ডঃ এন, রায় for VI
2. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ৪র্থ ভাগ—ডঃ এন, রায় for IX.X
3. ভারত কথা—অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় (for H. S. or S. F.)
4. প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ for IX, X or XI, (H.S)
5. প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ for IX, X (S.F)
6. বাণিজ্যিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ অধ্যাপক ভবেশ ভট্টাচার্য্য (H.S. Com)
7. অর্থনৈতিক ভূগোলের ভূমিকা—অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী (H.S.Com)
8. বাণিজ্যিক ভূগোলের ভূমিকা—অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী (S.F. Com.)

Calcutta Historical Society Publications

Little's House of Jagatseth
Edited with introduction by
Dr. N. K. Sinha — Rs. 15·00

Bengal Past & Present
(A Journal of Modern Indian & Asian History.)
Special Number Annual Subscription — Rs. 20·00
Sir Jadunath Centenary volume (December 1970) — Rs. 15.00

33/1, AMHERST STREET,
CALCUTTA —9

With best compliments from

UNIVERSAL EMPORIUM
KHAGOL-PATNA

(LEADING DEPARTMENTAL STORE)